ক বিভাগ ❐ সামাজিক কর্ম গবেষণা (Social Work Research

একক ঃ ১ সামাজিক গবেষণা (Introduction to social Research)

১.১ সামাজিক সমীক্ষার সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, বিষয়সমূহ এবং ঐতিহাসিক পটভূমি।

১.২ সামাজিক গবেষণার অর্থ, গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, পরিধি।
ভারতে সামাজিক কর্ম গবেষণার অবস্থা। সামাজিক কর্ম গবেষণার সীমাবদ্ধতা। সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার মধ্যে পার্থক্য। সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে পার্থক্য।

১.৩ সামাজিক কর্ম গবেষণার প্রক্রিয়া
অর্থ বা ধারণা
গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ
গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ

১.৪ প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণ
অর্থ বা ধারণা
উপযোগিতা
প্রকল্প যাচাই বা পরীক্ষা
উপযুক্ত পরীক্ষার মান নির্ণয়
একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলী

১.৫ গবেষণার রূপরেখা
অর্থ
উপাদান সমূহ

১.৬ নমুনাকরণ বা নমুনাচয়ন
অর্থ ও গুরুত্ব
নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী
নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব
নমুনাকরণ পদ্ধতির গুরুত্ব
নমুনাকরণের পদ্ধতিসমূহ
নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারে সাবধানতা

নমুনাকরণের নির্ভরযোগ্যতা
নমুনাগত ও নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি

১.৭ উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ
তথ্য সংগ্রহের ধরন
সুবিধা ও অসুবিধা
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ
তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

১.৮ গবেষণার প্রতিবেদন লিখন

সামাজিক সমীক্ষা ও সামাজিক গবেষণা
(Social Survey and Social Research)

১.১ সামাজিক সমীক্ষা (Social Survey)

(ক) সংজ্ঞা (Definition) : সামাজিক সমীক্ষার একটি সর্বজনগ্রাহ্য ও সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া খুবই দুরূহ। কারণ সামাজিক সমীক্ষার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। তাই যেকোনও একটি সংজ্ঞা সাধারণভাবে এর উদ্দেশ্যকে পরিস্ফুট করতে অসমর্থ হয়। বস্তুত: সামাজিক সমীক্ষার যে বিভিন্ন প্রয়োগ দেখা যায় তা দু'চার কথায় সংজ্ঞায়িত করা বাস্তবিকই অসম্ভব। কারণ আজ থেকে প্রায় আশি বছর আগে ধ্রুপদী দারিদ্র্য সমীক্ষা থেকে বর্তমান যুগের নগর-পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমীক্ষা বা বাজার গবেষণা বা জনমত সমীক্ষা বা সরকারী বিভাগ দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য সমীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আবার উদ্দেশ্যের নিরিখেও এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ একটি সমীক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে কোন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের রূপায়ণ বা কোন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করা বা কোন সামাজিক তত্ত্বের উপর নতুন করে আলোকপাত করা। আবার এটিকে যখন বিষয় হিসাবে দেখা হয় তখন এটি অন্তর্ভুক্ত থাকে। জনবণ্টনের চরিত্র, সামাজিক পরিবেশ, বিভিন্ন কার্যকলাপ বা কিছু মানবগোষ্ঠীর মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী।

1935 সালে **ওয়েলস্** (Wells) সামাজিক সমীক্ষার যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তা হল—"প্রধানত: শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদঘাটনজনিত ও সমাজের প্রকৃতি ও সমস্যা সংক্রান্ত সমীক্ষা" কিন্তু এই সংজ্ঞাটিকে কোনোভাবেই সম্পূর্ণ বলা যায় না। বর্তমানে সামাজিক সমীক্ষা আরো ব্যাপক

অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ সামাজিক সমীক্ষা একদিকে যেমন বিভিন্ন সরকারী সমীক্ষা, বাজার গবেষণা ও জনমত গবেষণার সাথে যুক্ত তেমনি সমাজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার বিভিন্ন দিকের সাথেও যুক্ত। সুতরাং সামাজিক সমীক্ষার সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় 'প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে বা কোন ঘটনা ঘটার পিছনে যে কার্য-কারণ সম্পর্ক (cause-effect relationship) রয়েছে তা অনুধাবন করা বা কোন সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ও সমাধান সংক্রান্ত যে গভীর সমীক্ষা বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চালানো হয়, তাকেই সামাজিক সমীক্ষা বলে।

(খ) সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of social survey) : কতকগুলি সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল সমাজ সম্পর্কিত কতকগুলি তথ্য তুলে ধরা ও স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদের সেগুলি সরবরাহ করা। অর্থাৎ এধরনের প্রতিটি সমীক্ষার একটি স্পষ্ট ও **বিবরণমূলক উদ্দেশ্য** থাকে। অনূরূপভাবে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর কাছে সামাজিক সমীক্ষার যেমন বিবরণমূলক উদ্দেশ্য থাকে তেমনি সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থাও সামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা পাওয়ার উপায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক বিষয় এই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বিভিন্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারগুলি তাদের আয় কিভাবে ব্যয় করে, শিক্ষার সাথে সামাজিক মর্যাদার সম্পর্ক কি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী কি—এরূপ অসংখ্য বিষয়।

তবে একথা মনে করা ঠিক নয় যে সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্য সবসময়ই বিবরণাত্মক। অনেক সামাজিক সমীক্ষারই উদ্দেশ্য বিবরণমূলকের পরিবর্তে **ব্যাখ্যামূলক।** এরূপ সমীক্ষা সম্পূর্ণভাবে তত্ত্বমূলক। সমাজ বিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব সম্পর্কিত প্রকল্প (hypothesis) পরীক্ষা করা বা বিভিন্ন বিষয়ের উপর তত্ত্বের প্রভাব পরিমাপ করা। যাই হোক্ না কেন, এধরনের সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সহগের (variables) মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাই এরূপ সমীক্ষায় অত্যন্ত জটিল ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন হয়।

উপরের আলোচনা থেকে সামাজিক সমীক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়:

(1) সমাজ ও সমাজগঠনকারী বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরা;

(2) কোনো সামাজিক সমস্যার কারণ খুঁজে বের করা;

(3) কোনো সামাজিক ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করা;

(4) সমাজের প্রতি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করা;

(5) সমাজবিজ্ঞানের কোনো তত্ত্বের প্রভাব সমাজের উপর কতখানি ক্রিয়াশীল তা পরিমাপ করা;

(6) অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা ও সর্বোপরি কোনো তত্ত্ব গঠন করা।

(গ) সমীক্ষার বিষয়সমূহ (Subject matter of surveys) :

যদিও সমীক্ষার বিষয়সমূহের একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব তবুও সমীক্ষার চারটি প্রধান বিষয় হল:

(1) একটি জনগোষ্ঠীর জনবণ্টনমূলক চরিত্র অর্থাৎ পরিবারের গঠন, বৈবাহিক মর্যাদা, বয়স, সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা, শিশু ও বৃদ্ধের অনুপাত ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা;

(2) ঐ জনগোষ্ঠীর সামাজিক পরিবেশ অর্থাৎ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র জানা। এর অন্তর্ভুক্ত হল তাদের পেশা ও জীবিকা, তাদের আয়, বসবাসের জায়গার অবস্থা, সামাজিক সুবিধাসমূহ ইত্যাদি।

(3) ঐ জনগোষ্ঠীর কাজকর্ম অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম যেমন তারা কিভাবে অবসরকালীন সময় কাটায়, তাদের বিনোদন, বেড়ানোর অভ্যাস, ব্যয় করার ধরন, টেলিভিশন দেখা বা রেডিও শোনা, সংবাদপত্র পড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা; এবং

(4) ঐ জনগোষ্ঠীর মতামত ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী জানা। বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষা, বিভিন্ন জনমত সমীক্ষা, বাজার গবেষণা ইত্যাদি।

(ঘ) সামাজিক সমীক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background of social survey) :

সামাজিক সমীক্ষার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। সামাজিক সমীক্ষার প্রারম্ভিক ইতিহাসে যাঁদের নাম জড়িয়ে রয়েছে তাঁরা হলেন **এডেন** (Eden), **মেহিউ** (Mayhew) এবং **বুথ** (Booth)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুথকেই বিজ্ঞানভিত্তিক সামাজিক সমীক্ষার জনক বলা হয়। বুথ 1886 সালে **'শ্রমিক এবং লণ্ডনের অধিবাসীদের জীবন'** নিয়ে একটি সমীক্ষা শুরু করেছিলেন এবং 1902 সালে সমীক্ষার কাজ শেষ করেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বুথ (Booth) এবং রোনট্রি (Rowntree) কতকগুলি দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। সেকারণে এঁদের আধুনিক সামাজিক সমীক্ষার পথিকৃৎ বলে গণ্য করা হয়। পরবর্তী কুড়ি বছরে আরো কিছু ব্যক্তি এধরনের সমীক্ষা চালিয়েছিলেন যাঁদের মধ্যে **বাওলে** (Bowley) উল্লেখযোগ্য। বিশেষ দশকের শেষ দিকে ও তিরিশের দশকের প্রথম দিকে বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরে পূর্বসূরীদের অনুসৃত পদ্ধতিতে অনেকগুলি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে শহর পরিকল্পনা ও সরকারী কাজকর্মের সাথে সমীক্ষার কাজও যুক্ত হয়। ক্রমে ক্রমে সামাজিক সমীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সামাজিক ও সরকারী ক্ষেত্র ছাড়াও কারবারী ক্ষেত্রেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমীক্ষার পদ্ধতির উপর পাঠক্রম তৈরী হয় এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু হয়। বিংশ শতাব্দীতে বৃটেনের সাথে সাথে অন্যান্য দেশেও এধরনের সামাজিক সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম অবশ্যই করতে হয়। 1967 সালে **গ্লোক** (Glock)-এর সম্পাদনায় 'Survey Research in the Social Sciences' প্রকাশ পায়। এই বইটিতে সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান, শিক্ষা, সোশ্যাল ওয়ার্ক, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সমীক্ষার ভূমিকা আলোচনা করা হয়।

সনাতন দারিদ্র্য সমীক্ষা (The Classical Poverty Survey) :

আধুনিক সামাজিক সমীক্ষার পথিকৃৎ **চার্লস বুথ** তাঁর পর্বতপ্রমাণ সমীক্ষার কাজ শুরু করেছিলেন 1886 সালে এবং 1902 সালে তাঁর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে শেষ করেন। তাঁর সমীক্ষার

ফলাফল 17টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। **বুথ** ছিলেন একজন ধনী জাহাজ ব্যবসায়ী, শ্রমিক শ্রেণীর দারিদ্র্য এবং জীবন যাত্রার অবস্থা তাঁকে খুবই বিচলিত করেছিল। সমীক্ষা চালানোর ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান সমস্যা ছিল লন্ডনে বসবাসকারী বিশাল সংখ্যার শ্রমিকদের সম্বন্ধে তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা হবে। তিনিই প্রথম তথ্য সংগ্রহের জন্য 'গণ সাক্ষাৎকার' নিয়েছিলেন। লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে বুথ পরিবারগুলিকে আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। এদের মধ্যে চারটি শ্রেণী ছিল **দারিদ্র্য রেখার** উপরে এবং অপর চারটি দারিদ্র্য রেখার নীচে, তবে এই শ্রেণীবিভাগ খুব যুক্তিগ্রাহ্য ছিল না, কারণ তিনি **'দরিদ্র'** (Poor) ও **'খুব দরিদ্র'** (very poor) সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিখুঁত নয়। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্যের ভয়াবহতা ও পরিধি সম্পর্কে এই সমীক্ষা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং রাজনৈতিক ফলও যে পাওয়া গিয়েছিল তা **বিয়াট্রিস ওয়েব** (Beatrice Webb) পরবর্তীকালে দেখিয়েছেন। বস্তুত: বুথের সমীক্ষাই বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষার পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল।

বুথের সমীক্ষা শুরুর এক দশক পরে **রোনট্রি** (Rowntree) তাঁর প্রথম সামাজিক সমীক্ষা শুরু করেন 1902 সালে। তাঁর সমীক্ষার বিষয় ছিল 'Poverty : a study of Town Life'। পদ্ধতিগত দিক থেকে তিনটি বিষয়ে তিনি বুথের থেকে আলাদা ছিলেন। এগুলি হল—

প্রথমত: তিনি প্রতিটি শ্রমিক পরিবারের বাসস্থান, পেশা ও আয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন;

দ্বিতীয়ত: তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি পরিবার থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন; এবং

তৃতীয়ত: তাঁর সমীক্ষার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, তিনি দারিদ্র্য সম্পর্কে অনেক নিখুঁত ধারণা দিয়েছিলেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের দারিদ্র্য ও দ্বিতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর মতে পরিবারের মোট আয় যদি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে **প্রাথমিক দারিদ্র্য** বলে। অন্যদিকে, পরিবারের আয় যদি পরিবারের সদস্যদের শারীরিক দক্ষতা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট বলে গণ্য হয় কিন্তু যেহেতু পরিবারকে কিছু প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করতে হয় তাই পরিবারের দারিদ্র্যমোচন ঘটে না। এরূপ অবস্থাকে তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের দারিদ্র্য হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি, খাদ্য ও বস্ত্রের প্রয়োজনের মূল্যও নির্ধারণ করেছিলেন।

প্রায় এক দশক পরে 1912 সালে **বাওলে** (Bowley) একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা শুরু করেছিলেন। তিনি পাঁচটি শহরের শ্রমিকদের জীবনযাপনের অবস্থা সমীক্ষা করে 1915 সালে 'Livelihood and Poverty' নামাঙ্কিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন। সামাজিক সমীক্ষার উন্নয়নে **হাওলের** গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল sampling-এর ব্যবহার। পরবর্তীকালে সকল দারিদ্র্য-সমীক্ষাতেই এর ব্যবহার হয়েছিল।

তিরিশের দশকে সমীক্ষা সংক্রান্ত কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। **ফোর্ড** (Ford) 1932 সালে সাউদাম্পটনে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। এর প্রতিবেদন 1934 সালে **'work and wealth in**

modern port' নামে প্রকাশিত হয়। এই সমীক্ষায় বাউলের পদ্ধতিই অনুসৃত হয়েছিল। তবে ফোর্ড দারিদ্র্যের একটি নতুন ধারণার অবতারণা করেছিলেন। এই নতুন ধারণাটি হল **'সম্ভাব্য দারিদ্র্য'** (Potential poverty)।

অন্যান্য শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য সংক্রান্ত সমীক্ষার মধ্যে তিনটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে দুটি সমীক্ষা **রোনট্রি** (Rowntree) করেছিলেন। 1935 সালে তিনি **ইয়র্ক** শহরে দ্বিতীয় সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন এবং 1941 সালে 'Poverty and Progress' নামে সমীক্ষার প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমীক্ষায় তিনি আগের 'দারিদ্র্যের প্রমাণ মান' পরিত্যাগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে 'মানবিক প্রয়োজন মান' ব্যবহার করেছিলেন। 1950 সালে তিনি ও **লেভার্স** (G.R. Lavers) যৌথভাবে আরো একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এর ফলাফল বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয় 1951 সালে। বইয়ের নাম ছিল 'Poverty and the Welfare State'। ইয়র্ক শহরের উপর তৃতীয় সমীক্ষাটি চালিয়েছিলেন **অ্যাবেল-স্মিথ** (Abel-Smith) এবং **টাউনসেন্ড** (Townsend) 1965 সালে। এই সমীক্ষার ফলাফল তাঁরা প্রকাশ করেন "The poor and the poorest" গ্রন্থের মাধ্যমে।

উপরে উল্লিখিত দারিদ্র্যসংক্রান্ত সমীক্ষা ছাড়াও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষা সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রেও চালানো হয়েছিল যাদের মধ্যে বাজার গবেষণামূলক ও জনমত সমীক্ষা প্রধান, পণ্য বিপণনের ক্ষেত্রে এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে বর্তমানে বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যে জনগণনা তথা আদমসুমারিই সর্ববৃহৎ। প্রতিটি দেশে সরকারী উদ্যোগে প্রতি দশ বছর অন্তর এই সমীক্ষা চালানো হয়।

অনুশীলনী :

০১। সামাজিক সমীক্ষা কি? তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

০২। সমীক্ষার বিষয়গুলি কি কি?

০৩। সমীক্ষার ঐতিহাসিক পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

১.২ সামাজিক গবেষণা (Social Research)

(ক) সামাজিক গবেষণা (Social Research) : সাধারণ অর্থে গবেষণা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে নতুন কোন জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক গবেষণা বলতে সমাজ-সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের উপর গবেষণাকে বোঝায়। গবেষণা সবসময়ই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। এর হাতিয়ার হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, তথ্য বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ। প্রকৃত বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণায় সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বেশী গুরুত্ব পায়, সমাজ বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি বেশী গুরুত্ব পায়। 'প্রকৃতপক্ষে গবেষণা হল বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারের কোন বিষয়কে যাচাই বা পরিমার্জন করার উদ্দেশ্যে ওই বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর একটি প্রক্রিয়া।'

1947 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েষ্টার্ন রিজার্ভ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কর্মশালার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে 'সামাজিক গবেষণা মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের প্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়'। সামাজিক গবেষণার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

1. সামাজিক গবেষণা চালানো হয় সমাজ বিজ্ঞান ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

2. এরূপ গবেষণা সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়েও চালানো হয়।

3. মানুষের আচরণ সম্বন্ধে পবিষ্কার ধারণা পেতে এবং জ্ঞানের উত্তরণ ঘটানোর লক্ষ্যে অথবা কোনো পুরানো তত্ত্ব বাতিল বা পরিমার্জন করার উদ্দেশ্যে বা নতুন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এধরনের গবেষণা চালানো হয়।

4. সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেও ব্যবহৃত হয়।

5. সামাজিক গবেষণায় গবেষক তাঁর গবেষণা শুরু করেন শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজ বিজ্ঞানের ফাঁকগুলি ভরাট করার উদ্দেশ্য। এবং এরূপ গবেষণার মূল্য লক্ষ্য হল সামাজিক ঘটনা ও সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

(খ) সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব (Importance of Research in Social Work) :

সামাজিক কর্ম হল একটি প্রয়োগমূলক পেশা। সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রটি মূলত: উপস্থাপন, উন্নয়ন, মানবিক অসুস্থতার চিকিৎসা এবং সর্বোপরি আশানুরূপ সামাজিক অবস্থার ধনাত্মক প্রসারের সাথে যুক্ত। একারণেই সমাজকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সামজিক সমস্যা ও বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ এগুলি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে ব্যক্তি বিশেষ বা দলকে সাহায্য করার জন্য সঠিক পরিকল্পনা ও কৌশল স্থির করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা এখানেই উপলব্ধ হয়। গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা উদ্ভবের পিছনে যে কারণগুলি থাকে সেগুলিকে চিহ্নিত করা যায় এবং সমাধানের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায়। এর দ্বারাই সমাজকর্মীরা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারে এবং কখন ও কিভাবে তাদের কাজ শুরু করবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি গ্রামে কলেরা মহামারীর আকার নিয়েছে। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সমাজকর্মীকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে যে কলেরা ছড়ানোর পিছনে কি কি কারণ বর্তমান। কোন্ কোন্ জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব বেশি। এছাড়াও রোগের ইতিহাস, পানীয় জলের উৎস, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কেও জানতে হবে। সমস্যার প্রকৃতি ও পরিধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়ার পর সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে। কিন্তু যদি সমস্যাটির কেবলমাত্র আপৎকালীন সমাধান করতে চাওয়া হয় তাহলে শুধুমাত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেই চলবে। কিন্তু এরূপক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আবার রোগটি ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে। কিন্তু যদি এর স্থায়ী সমাধান চাওয়া হয় তাহলে চিকিৎসার সাথে সাথে রোগের কারণগুলিও দূর করতে হবে। অর্থাৎ গবেষণামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করে রোগটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা গড়ে তুলতে পারলে রোগের স্থায়ী সমাধান করা সম্ভব হয়। গবেষণার প্রয়োজন এখানেই। গবেষণার মাধ্যমে সমাজকর্মী রোগ, রোগের কারণ এবং রুগীদের

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পায় এবং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে সমর্থ হয়।

মানব-সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজজীবনও জটিল আকার ধারণ করছে। অতীতের সামাজিক নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটছে এবং সেগুলি আর সেভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এই জটিল সামাজিক পরিবেশকে বুঝতে হলে এর অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলিকে সমীক্ষা করা প্রয়োজন। সমাজের এই জটিলতা অনুধাবন করার জন্য তাই গবেষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ সমাজকে বা সামাজিক পরিবেশকে বা সামাজিক ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে না জানতে পারলে সমাজকর্মীরা সঠিকভাবে তাদের কাজ করতে পারবে না। সমাজের স্বাভাবিক কার্যকলাপ যখন বিঘ্নিত হয়, সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের তখনই প্রয়োজন হয়। গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক কার্যকলাপ বিঘ্নিত হওয়ার পিছনে কি কারণ রয়েছে তা' খুঁজে বের করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক কর্ম হল যেসব বিষয়গুলি মানুষকে পীড়িত করে সেসব বিষয়ের সমাধান সূত্র বের করা। জটিল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সমস্যাগুলি বোঝার চেষ্টা করাও সামাজিক কর্মের উদ্দেশ্যের সাথে খাপ খায় এরূপ বিকল্প সমাধান খুঁজে বের করা। সংক্ষেপে বলা যায় যে এর কাজ হল সমস্যার **প্রতিরোধ,** সোশ্যাল ওয়ার্কের **প্রসার** ও **সমাধান** করা। গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান তাত্ত্বিকভাবে ও বাস্তবে যাতে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কিত অনুসন্ধান সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, গবেষণা এসব সমস্যার সমাধান সূত্র বের করতে সমাজকর্মীদের সাহায্য করে। তবে এটি বাস্তব সত্য যে, সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক রিসার্চ সম্পূর্ণভাবে পৃথক।

(গ) সামাজিক কর্ম গবেষণার বৈশিষ্ট্য (Features of Social work Research) :

সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণা ও সমাজ বিজ্ঞান মূলক গবেষণার মধ্যে কিছু মিল পাওয়া গেলেও সামাজিক কর্ম গবেষণার কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এগুলি হল—

(1) সামাজিক কর্ম গবেষণার উদ্দেশ্য হল সামাজিক কর্ম সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার রীতিবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ। এছাড়াও সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেসব সমস্যার বিকল্প অনুসন্ধান করাও এর উদ্দেশ্য।

(2) সামাজিক কর্ম গবেষণা কেবলমাত্র সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় না। উপরন্তু এই জ্ঞান কিভাবে প্রয়োগ করে সমস্যাপীড়িত মানুষজনকে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায় সেদিকেও দৃষ্টি দেয়।

(3) সামাজিক গবেষণা ব্যক্তি বিশেষ, গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি সমাজের সমাজিত কার্যকলাপ উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে।

(4) সামাজিক কর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার অংশবিশেষ।

(5) সামাজিক কর্ম গবেষণা সবসময়ই বাস্তবমুখী—মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যার বাস্তব সমাধান কিভাবে সম্ভব তা খুঁজে বের করা ও তা প্রয়োগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। সবশেষে বলা যায় যে সামাজিক কর্ম গবেষণার ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠী ও সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য কৌশল নির্ধারণ করা যেমন এক লক্ষ্য তেমনি বিভিন্ন কৌশলের কার্যকারিতা পরিমাপ করাও এর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) সামাজিক কর্ম গবেষণার পরিধি (Scope of Social Work Research) : সামাজিক কর্ম গবেষণার পরিধি বলতে বোঝায় সামাজিক কর্মের বাস্তব প্রয়োগে যে চতু:সীমার মধ্যে ঘটে। এর ব্যাপ্তি শুরু হয় সামাজিক কর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব গঠন, প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান, নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী প্রণয়ন, কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ, কর্মসূচীর উপর নিয়ন্ত্রণ ও সর্বোপরি মূল্যায়ন। সামাজিক কর্মের সকল ক্ষেত্রেই যেমন—স্কুল, হাসপাতাল, পরিবার, বয়স্ক ব্যক্তি, যুবসমাজ ইত্যাদি সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের কারণে বা মানুষের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক প্রয়োজন ও সামাজিক সমস্যাও ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, এই পরিবর্তন যেহেতু ধারাবাহিক সেকারণে গবেষণাও ধারাবাহিকভাবে চালাতে হয়।

একথা অনস্বীকার্য যে স্থান, কাল ও সংস্কৃতি ভেদে সামাজিককর্মের প্রয়োগ ভিন্ন হয়। তাই কোনো সমস্যায় সমাধানসূত্র সর্বত্র প্রয়োগ করা যায় না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দৌলতে মানুষের কর্ম-সংস্কৃতি ও জীবনশৈলীর মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটেছে সেই পরিবর্তন শহরে যতখানি প্রকট গ্রামে ততখানি নয়। তবু, একথাও সত্য যে এই উন্নয়নের ঢেউ গ্রামগুলিকেও আংশিক প্রভাবিত করেছে এবং গ্রামীণ জীবনযাত্রার মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এছাড়াও, নবীন প্রজন্মের ধ্যান-ধারণা, জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, প্রয়োজন, আকাঙ্ক্ষা, নীতিবোধ ইত্যাদি প্রবীন প্রজন্মের থেকে অনেকটাই পৃথক, সুতরাং বর্তমানে সমাজকর্মীদের কাজের ধারা ও দশ বিশ বছর আগের কাজের ধারা কখনই এক হতে পারে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের কাজের ধারার মধ্যেও পরিবর্তন আনতে হয়। কাজেই সামাজিক কর্ম গবেষণার ধারাবাহিক প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

যেসব ক্ষেত্রে সামাজিক কর্ম গবেষণার ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প চূড়ান্তকরণ, সামাজিক নীতি নির্ধারণ, সামাজিক আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা মূলক প্রকল্পকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এর মাধ্যমে সমাজের সদস্যদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও দু:সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার মানসিকতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক কর্ম গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক কর্মের প্রধান লক্ষ্য—সামাজিক ন্যায় ও সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। গবেষণার সুপারিশ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে ফাঁক বা প্রভেদ রয়েছে সেগুলি পূরণ করতে সাহায্য করে।

(ঙ) ভারতে সামাজিক কর্ম গবেষণার অবস্থা (Position of Social Work Research in India) : লক্ষ্যণীয় বিষয় হিসাবে সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সামাজিক কর্মের পাঠক্রম ভারতবর্ষে প্রথম চালু হয় 'Tata Institute of Social Science'-এ। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ-এর উৎপত্তি ঘটে এই প্রতিষ্ঠানেই। তবুও বলা চলে যে ভারতবর্ষে সামাজিক কর্ম গবেষণার অগ্রগতি সেভাবে ঘটেনি। এই ক্ষেত্রের ভারতীয় গবেষকরা, এখনো বিদেশে গবেষণার ফলে গৃহীত পদ্ধতি, কৌশল ও তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় গবেষকদের মধ্যে মৌলিকতার অভাব প্রকট। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিদেশী গবেষকদের উদ্ভূত তত্ত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল ভারতীয় পরিম্ণ্ডলে বাতিল বলে গণ্য হয়। কিন্তু এসব তত্ত্ব, পদ্ধতি ও কৌশলগুলি ভারতীয় পরিমণ্ডলের উপযুক্ত করার জন্য পরিমার্জনের প্রয়োজন,

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে গবেষণার ফল এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। এছাড়াও সামাজিক কর্ম পেশা সম্বন্ধেও সাধারণ মানুষের জ্ঞান খুবই কম। বেসরকারী সংস্থা (NGOs), সরকারী দপ্তর ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি যারা বিভিন্ন স্তরে সামাজিক কর্ম করে তারাও সামাজিক কর্ম সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা চালানোর জন্য গবেষকদের উৎসাহিত করে না। এসব সংস্থা ও সংগঠন যেসব গবেষণা চালায় সেগুলির মধ্যে প্রচুর ভ্রান্তি দেখা যায় কারণ এসব গবেষণার ফল সাধারণ মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। যদিও বর্তমানে দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মীর চাহিদা বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে তবুও গবেষণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অতি সামান্য। যেসব যোগানমূলক গবেষণা (participatory research) বর্তমানে চালানো হয় সেগুলি মূলত: পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। অথচ এধরনের গবেষণা বা সমীক্ষা চালানো উচিত প্রকল্প পরিচালনা চূড়ান্ত করার আগেই। অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রকল্প চূড়ান্ত করা দরকার। অনেক সময়ই যেসব সংস্থা প্রকল্পের অর্থ সরবরাহ করে তাদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে গবেষণা চালানো হয়, সমাজের মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। খুব অল্প সংখ্যক গবেষণার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে মানুষের প্রয়োজন এবং সম্পদের মূল্যায়ন বা কর্মসূচী পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে এই ত্রুটির পিছনে যেসব কারণ বর্তমান সেগুলি হল নিম্নরূপ:

1. প্রশাসক ও পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা।

2. গবেষণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা এবং অর্থ সরবরাহকারী সংস্থাগুলির দৃষ্টিভঙ্গি গবেষণার পরিধিকে সংকুচিত করেছে;

3. সামাজিক কর্ম গবেষণার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থার অভাব;

4. গবেষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা; এবং

5. সর্বোপরি পেশাজীবি সমাজ কর্মীদের গবেষণার প্রতি অনীহা। অথচ সামাজিক কর্ম গবেষণা ভারতের মতো বৃহৎ দেশে, যেখানে এখনো পর্যন্ত বহু দরিদ্র মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এবং তার ফলে যেসব সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটছে সেগুলির স্থায়ী সমাধানকল্পে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে যেসব ক্ষেত্রে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ চালানোর প্রয়োজন অনুভূত হয় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

(1) সামাজিক কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষণা : ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বহু বৈচিত্র্যের অধিকারী। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে সমাজ কর্মের কোন্ পদ্ধতি অধিক কার্যকর হবে তা স্থির করা বাঞ্ছনীয়। ভারতে সমাজ কর্মের ক্ষেত্রে যেসব চিরাচরিত পদ্ধতি যেমন ব্যক্তি কর্ম (case work), গোষ্ঠী কর্ম (group work) এবং সমষ্টি সংগঠন (comy. organisation) তাদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা ও প্রতিটি পদ্ধতি কার্য-কারিতা বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ ভারতের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে কাম্য পরিবর্তন এনে সেগুলিকে অধিক কার্যকর করার প্রয়াস চালাতে হবে। আর গবেষণা ছাড়া এসব পদ্ধতির পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন সম্ভব নয়।

(2) কর্মসূচী উন্নয়ন, সংহতিসাধন ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে : ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এদের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করার জন্য যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা ও মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করা দরকার। কারণ তাদের প্রয়োজন ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রাপ্ত সম্পদগুলি বিবেচনা করে, কর্মসূচী প্রণয়ন ও কর্মসূচীর উন্নয়ন ঘটনো বাঞ্ছনীয়। গবেষণার মাধ্যমেই সুসংহত কর্মসূচীর প্রণয়ন, উন্নয়ন, বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সংহতিসাধন ও মূল্যায়ন করা সম্ভব।

(3) সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে গবেষণা : কতকগুলি সামাজিক সমস্যা যেমন অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, দেহ ব্যবসায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমস্যার গভীরতা ও জটিলতা গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব। এগুলি ছাড়াও তফশিলী জাতির, উপজাতির মানুষদের সমস্যা, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সমস্যার সঠিক অনুধাবনের জন্যও গবেষণার প্রয়োজন। এসব সমস্যা ছাড়াও যেসব রোগীর প্রতি, যেমন এড্‌স আক্রান্ত শ্রেণী, বা কুষ্ঠ রোগী বা যক্ষ্মা রোগীর ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাজের যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারও মূল কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সমাধানের উপায় বের করতে হবে। সুতরাং যেকোনো জটিল সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(4) সামাজিক কর্মের ইতিহাস জানা : অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানকে চেনা যায় না। সোশ্যাল ওয়ার্কের ইতিহাস থেকেই এর কাজের ধারা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। সুতরাং আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সোশ্যাল ওয়ার্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তা' সমাজকর্মীদের জানা দরকার। সেকারণে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল এর ইতিহাস ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা।

(5) সামাজিক কর্ম ও সামাজিক নীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া : সামাজিক কর্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নীতি অনুসৃত হয়। এই নীতিগুলি বর্তমানে কতখানি কার্যকর অর্থাৎ সামাজিক কর্মের সাফল্য ও ব্যর্থতার পিছনে কতটা ভূমিকা পালন করে তা সমাজকর্মীদের জানা দরকার। আর এ সংক্রান্ত তথ্য কেবলমাত্র সামাজিক কর্ম গবেষণার মাধ্যমেই জানা সম্ভব।

এগুলি ছাড়াও সামাজিক কর্ম গবেষণার প্রয়োজন অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে অনুভূত হয় সেগুলি হল প্রশাসনিক স্তরে, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, সমাজকর্মীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

(6) সামাজিক কর্মগবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of Social Work Research) : রিসার্চ বা গবেষণা অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর দেয়। সেকারণেই গবেষণাকে আধুনিক সভ্যতার পথিকৃৎ আখ্যা দেওয়া হয়। তবে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা যতটা নির্ভুল তথ্য দিতে পারে, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য অতটা নির্ভুল হতে পারে না। তাই সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। এই সীমাবদ্ধতাগুলি নিম্নরূপ:

(1) বেশিরভাগ সামাজিক কর্ম গবেষণাই 'তন্ত্র মতবাদের' (systems approach) উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। তন্ত্র মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে মানব শরীর থেকে। মানব শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কতকগুলি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। যে কোন একটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গের কাজে বিঘ্ন হলে তার প্রভাব মানব শরীরের উপর পড়ে। অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গের কাজের মধ্যে এক ধরনের আন্ত: সম্পর্ক ও পারস্পরিক

নির্ভরতা বর্তমান থাকে। অনুরূপভাবে, যদি গবেষণার ক্ষেত্রে এই মতবাদ অনুসরণ করা হয় তাহলে গবেষণালব্ধ তথ্য এমনভাবে সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করবে যাতে, বর্তমান সামাজিক কাঠামোর সাথে খাপ খাবে। কিন্তু সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন এই কাঠামোর মধ্যেই সমস্যা নিহিত থাকে। এরূপক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়।

(2) সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চালানো হয় সেগুলি সমস্যাকে গভীরভাবে না দেখে কেবলমাত্র উপর থেকে দেখে। এর ফলে সমস্যার জটিল সামাজিক সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ না করে দু-একটি কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয় ও অন্য কারণগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়। এর ফলে সমস্যার একটি আপাত সমাধান হয়তো খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু স্থায়ী সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না।

(3) ভারতে ভূ-প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণে যে আঞ্চলিক বৈষম্য পড়ে উঠেছে তার প্রভাব সামাজিক কাজকর্মের ক্ষেত্রেও পড়েছে। এই কাজকর্ম সঠিকভাবে করতে হলে ধারাবাহিকভাবে গবেষণা চালানো দরকার। কিন্তু তা সম্ভব হয় না কারণ এজন্য যে পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করার প্রয়োজন তা যোগান দেওয়া সহজ নয়। ফলে গবেষণার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না।

(4) যদিও একথা স্বীকার করা যায় না যে সামাজিক কর্মের তত্ত্ব এবং প্রয়োগের সর্বজনীনতা রয়েছে তবুও একথা সত্য যে এসব তত্ত্ব ও প্রয়োগ-এর মূল নিহিত রয়েছে স্থানীয় ভিত্তিতে। স্থানীয় পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসব তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োজনীয় পরিমার্জন প্রয়োজন, তথাপি অনেক সময়ই এই দিকটির প্রতি গবেষকরা গুরুত্ব দেন না।

(5) বেশিরভাগ গবেষণার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে গবেষক, অর্থ প্রদানকারী সংগঠন, সরকারী বিভাগ ও সমাজকর্মে যুক্ত বেসরকারী সংগঠনগুলির মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্ত ও পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা কাজ করে। এর ফলে মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য গৃহীত কর্মসূচী যথাযথ হয় না। সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষকদের পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা গবেষণার ফলকেও পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে এবং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(6) ভারতীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্ক কর্মসূচী ও নীতির পিছনে একধরনের রাজনীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই রাজনীতি সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষকের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

(7) মানুষ আশা করে যে গবেষণার মাধ্যমে তাদের প্রায় সকল মানবিক সমস্যার সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ধারণা সর্বার্থে ঠিক নয়। তাই সামাজিক কর্ম গবেষণাও সবসময় সফল হয় না ও মানুষের চাহিদা পূরণ করতে বা কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে না।

(ছ) সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Social Research and Social work Research)

1937 সালে **হেলেন জেটার** (Helen R. Jetter) তাঁর 'Social work Year Book'-এ বলেছিলেন যে সোশ্যাল রিসার্চ ওয়ার্ক রিসার্চের লক্ষ্য হল সমাজকর্মীরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানকল্পে এবং সামাজিক কর্মের দর্শন, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, কৌশল ইত্যাদি সংক্রান্ত

বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান। অন্যদিকে স্যোশাল রিসার্চ মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির দিক নির্দেশ করে। সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব এবং পদ্ধতির সামাজিক কর্মের প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং এভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত: সোশ্যাল ওয়ার্ক এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ সবসময় সমাজকর্মীদের দৃষ্টিকোণ থেকে চালানো হয় অর্থাৎ তার ফলাফল যেন সমাজকর্মীদের কাজের উপযোগী হয়। এদের মধ্যে পার্থক্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে তুলে ধরা যায়:

পার্থক্যের বিষয়	সামাজিক গবেষণা	সামাজিক কর্ম গবেষণা
১। সংজ্ঞা ঃ	সামাজিক গবেষণা হল মৌলিক সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান।	সামাজিক কর্ম গবেষণা হল কর্মক্ষেত্রে সমাজ কর্মীরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধান সূত্র সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধান।
২। ক্ষেত্র ঃ	সামাজিক গবেষণা সমাজ বিজ্ঞান ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের, যেমন— সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়।	এরূপ গবেষণা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও সমাজকর্মীরা কার্যক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানকল্পে পরিচালিত হয়।
৩। লক্ষ্য ঃ	সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক সমস্যা, মানুষের আচরণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা এবং পুরানো কোন তত্ত্ব বাতিল বা সংশোধন বা পরিমার্জন করার লক্ষ্যে এরূপ গবেষণা চালানো হয়। সংক্ষেপে, সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে কি ধরনের গবেষণা চালানো হয়।	বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মূল কারণ অনুধাবন করা, কর্মক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলি দূর করার উপায় বের করা এবং বিভিন্ন নীতি, কর্মসূচীর কার্যকারিতা যাচাই করা এরূপ গবেষণার লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।
৪। পরিধি ঃ	সামাজিক গবেষণার পরিধি অনেক বিস্তৃত। সমাজের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়ই এরূপ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়।	সমাজ কর্ম গবেষণা সামাজিক গবেষণার অংশবিশেষ। সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ-মূলক কাজের পরিধির অন্তর্ভুক্ত বলে একে সামাজিক গবেষণার গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে হয়। সুতরাং তুলনামূলকভাবে এর পরিধি সংকীর্ণ।
৫। ভিত্তি ঃ	সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে যেসব ফাঁক দেখা যায় সেগুলিকে ভিত্তি করেই সামাজিক গবেষণা শুরু হয়। নতুন জ্ঞানের অন্বেষণই হল এর মূল ভিত্তি।	সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ-এর ভিত্তি হল মানুষের প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে সমস্যা।

(জ) সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে পার্থক্য (Distinction between the survey and the Research) : সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে কিছু মিল থাকলেও এদের কোনভাবেই সমার্থক বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমীক্ষা হল কোনো বিষয় সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা বা অনুসন্ধান করা যাতে ঐ বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করা যায়। সাধারণত: কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা রূপায়ণের আগে বাস্তব অবস্থা যাচাই করার জন্য যে অনুসন্ধান চালানো হয় তাকেই বলে সমীক্ষা। অন্যদিকে কোন মৌলিক বিষয়ে যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে অনুসন্ধান চালানো হয় এবং যার উদ্দেশ্য হল নতুন কোন জ্ঞানের উদ্ভাবন বা প্রচলিত তত্ত্বের বিয়োজন বা পরিমার্জন বা সংশোধন তখন তাকে গবেষণা বলে। কোন বিষয়ে সমীক্ষা যখন খুব গভীরভাবে (in depth) চালানো হয় তখন তা গবেষণা বলে গণ্য হতে পারে।

সমীক্ষা মূলত: সমস্যাভিত্তিক। কোনো সমস্যার কারণ, গভীরতা, ব্যাপকতা ইত্যাদি নির্ধারণ করার জন্য সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ওই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ও কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়। অন্যদিকে গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণ যেমন জানা যায়, সাথে সাথে ঐ সমস্যা সমাধানের স্থায়ী সূত্রও আবিষ্কার করা হয়। সমীক্ষায় যেখানে সমস্যা বা ঘটনার বিবরণ গুরুত্ব পায় গবেষণায় ঐ সমস্যা বা ঘটনার নতুন দিক উন্মোচন করা হয়। তাই সমীক্ষার ফলাফল স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু গবেষণার ফল দীর্ঘস্থায়ী। সমীক্ষার ফলাফল স্থান, কাল ও পরিবেশ ভেদে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ নমনীয়, কিন্তু গবেষণার ফলাফল নমনীয় নয়। এর মধ্যে সর্বজনীনতা দেখা যায়।

গবেষণার ক্ষেত্রে, বিশেষত: বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার (experiments), সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু সমীক্ষায় এধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ নেই বললেই চলে। নিরীক্ষা প্রধানত: বিবরণমূলক (descriptive) এবং কখনো কখনো উদ্দেশ্যমূলক। অন্যদিকে গবেষণা প্রধানত: আদর্শজ্ঞাপক (normative)। তবে কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ই সমীক্ষা বোঝাতে গবেষণা শব্দটিও ব্যবহৃত হয়, যেমন— বাজার গবেষণা, জনমত সংক্রান্ত গবেষণা ইত্যাদি। এগুলি প্রকৃতপক্ষে বাজার সমীক্ষা, মতামত সমীক্ষাকে বোঝায়।

অনুশীলনী :

০১। সামাজিক গবেষণার অর্থ কি? তার উদ্দেশ্য ও পরিধি বিশ্লেষণ করুন।

০২। সমীক্ষা ও গবেষণার মধ্যে মূলগত পার্থক্য কি?

০৩। সামাজিক গবেষণা এবং সামাজিক কর্ম গবেষণার পার্থক্যসমূহ উদাহরণযোগে ব্যাখ্যা করুন।

১.৩ সামাজিক কর্মগবেষণাগার প্রক্রিয়া (Process of Social Work Research)

ধারণা : গবেষণা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া কতকগুলি বিশেষ কাজ সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। আর এই কাজগুলি অনেকটা সিঁড়ির ধাপের মত অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এই কাজগুলি

সম্পাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সেগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিপরীতক্রমে সেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও একে অপরের উপর নির্ভরশীল। গবেষণার ক্ষেত্রে এই কাজগুলি বা পদক্ষেপগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয় বলেই এদের গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা হয়। গবেষণার প্রধান ধাপগুলি হল নিম্নরূপ:

1. গবেষণার সমস্যাকে চিহ্নিত করা।

2. (ক) বিভিন্ন ধারণা ও তত্ত্বের পর্যালোচনা; এবং

(খ) অনুরূপ ক্ষেত্রে গবেষণা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

3. প্রকল্প রচনা করা।

4. গবেষণার নক্সা অর্থাৎ পরিকল্পনা স্থির করা।

5. উপাত্ত (data) বা তথ্য সংগ্রহ।

6. সংগৃহীত উপাত্ত বা তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকল্প পরীক্ষা।

7. উপাত্ত বা তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা ও প্রতিবেদন তৈরী।

তবে প্রয়োজন সাপেক্ষে এই ধাপগুলির পরিবর্তন করা যায়। সামাজিক কর্ম গবেষণার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ধাপগুলি অনুসৃত হয়। তবে সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চ যেহেতু সমাজকর্মীরা কাজের ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির সমাধানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে সেকারণে এধরনের গবেষণায় কোন বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। তাই **সমস্যা চিহ্নিতকরণ** যেমন এরূপ গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ বলে গণ্য হয় তেমনি সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরি এর শেষ পর্যায়ের কাজ হিসাবে গণ্য হয়। অবশ্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের কাজই গবেষণার এই দুই পর্যায়ের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে এবং এই পর্যায়ের কাজ জটিল প্রকৃতির ও গবেষণার মূল কাজ হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই পর্যায়ের কাজের মধ্যে গবেষণার পরিকল্পনা বা নক্সা ইত্যাদি যেমন থাকে তেমনি গবেষণার হাতিয়ার তৈরি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উৎস স্থির করা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা, সেগুলি বাছাই করা, প্রকল্প তৈরি, প্রকল্প পরীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি থাকে।

(খ) গবেষণা : সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identification of Research Problem) :

গবেষণার সমস্যা বলতে বোঝায় গবেষণার মাধ্যমে যেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়। সুতরাং গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ বলতে বোঝায় গবেষকরা কোন্ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করার জন্য গবেষণা চালাবে অর্থাৎ গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় কি হবে তা স্থির করা। সমস্যাকে ভালভাবে বোঝার জন্য গবেষকদের সমস্যার তত্ত্বগত দিক ও বাস্তব দিক পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এজন্য সমস্যাসংক্রান্ত যেসব বইপত্র রয়েছে সেগুলি যেমন পড়তে হবে, তেমনি যেসব ব্যক্তি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ তাদের সাথে

এবং সমস্যা নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের সাথেও আলোচনা করতে হবে। এভাবে সমস্যাটিকে চিহ্নিত করা হলে গবেষণার পদ্ধতি-প্রকরণ স্থির করতে হবে। সুতরাং সমস্যা চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রেও একাধিক কাজ করার প্রয়োজন হয়। গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে যেসব সুফল পাওয়া যায়। সেগুলি হল—

1. এর দ্বারা গবেষণার বিষয়বস্তুর চতু:সীমা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়;
2. এর ফলে গবেষণার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট হয় এবং গবেষণা চালানো সহজ হয়;
3. সমস্যাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়; এবং
4. গবেষণার সাথে সম্পর্কযুক্ত ও সম্পর্কহীন তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ বলতে মূলত: বোঝায় গবেষণার বিষয় স্থির করা অর্থাৎ কোন্ বিষয়ের উপর গবেষণা চালানো হবে। বিষয়টি মূলত: নির্ভর করে গবেষকের ইচ্ছা ও কোন্ বিষয়ের উপর তার ব্যুৎপত্তি রয়েছে তার উপর। তাই যেকোনো গবেষকেরই প্রথম কাজ হল তার গবেষণার ক্ষেত্রটি স্থির করা। কারণ গবেষণার বিষয় ও গবেষণার ক্ষেত্রটি সুনির্দিষ্ট করতে না পারলে গবেষণার লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয় না। এজন্য তার করণীয় বিষয়গুলি হল নিম্নরূপ:

1. গবেষণার যে ক্ষেত্রে গবেষকের ব্যুৎপত্তি রয়েছে বা সমাজ কর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের মধ্যে যে সমস্যাটি তাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে সেই সমস্যা বা বিষয়কেই গবেষণার বিষয় হিসাবে স্থির করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন গবেষক 'নেশার দ্রব্য অপব্যবহার' সম্পর্কে গবেষণা করতে চায়। এক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রটি অনেক বড় কারণ নেশাকর দ্রব্যের অপব্যবহারের মধ্যে সিগারেট, মদ, গাঁজা, বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং তাকে ঠিক করে নিতে হবে যে সে কোন্ বিশেষ দ্রব্যের অপব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণা চালাতে চায়। অর্থাৎ সে ধূমপায়ীদের মধ্যে বা মদে আসক্ত বা বিভিন্ন নেশার ঔষধ গ্রহণে আসক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যেকোন একটি বিষয় তার গবেষণার জন্য গ্রহণ করতে পারে।

2. গবেষণার নির্দিষ্ট সমস্যা বা বিষয়টিকে নির্বাচন করা হলে সমস্যা বা বিষয়টিকে আরো সঙ্কুচিত করা বাঞ্ছনীয়। কারণ মূল সমস্যাটিকে গবেষণার বিষয় হিসাবে যেমন গ্রহণ করা যায় তেমনি ঐ বিষয়ের যেকোনো একটি বা দুটি দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়। যেমন, মদে আসক্ত ব্যক্তিদের উপর গবেষণা চালানো স্থির করা হলে বিষয়টিকে আরো সঙ্কুচিত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মদে আসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা বা ঐ ব্যক্তি যেসব সামাজিক সমস্যা তৈরী করে তাদের প্রকৃতি ও সমাজের উপর প্রভাব বা পরিবারের দুর্দশার পিছনে এধরনের নেশার ভূমিকা কতটা ইত্যাদি গবেষণার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

3. এরপর গবেষককে তার গবেষণার উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য স্থির করতে হবে। কারণ উদ্দেশ্য গবেষককে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তার গবেষণা চালানোর জন্য পথ দেখায়। এর ফলে গবেষক তার গবেষণার বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না।

উপরের পদক্ষেপগুলি ছাড়াও গবেষণাকালীন গবেষককে কতকগুলি নীতি মেনে চলতে হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) গবেষক অবশ্যই তার সহযোগী এবং গবেষণার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা রয়েছে এরূপ ব্যক্তিদের সাথে অবশ্যই আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময় করবে। এর ফলে গবেষণার ক্ষেত্রকে আরো সুনির্দিষ্ট ও সংকুচিত করা যেমন সম্ভব হবে তেমনি গবেষণার কার্যগত দিকটি স্থির করাও সহজ হবে।

(ii) গবেষণার বিষয়সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তক খুব ভালোভাবে পড়তে হবে। এর ফলে ঐ বিষয়ের উপর গবেষকের জ্ঞান বৃদ্ধি ঘটবে।

(iii) গবেষণার বিষয়ের উপর গবেষকের আকর্ষণ থাকতে হবে এবং অনুরূপক্ষেত্রে যেসব গবেষণা চালানো হয়েছে সেগুলির উপরও তার ধারণা থাকতে হবে।

(iv) গবেষণার যেসব বিষয়ের ব্যাপ্তি বিশাল অথচ সহজেই গবেষককে আকর্ষণ করে সেসব বিষয় এড়িয়ে চলাই যথোচিত কাজ বলে মনে করা হয়।

(v) সর্বোপরি গবেষণার সমস্যা বা বিষয়টিকে অবশ্যই সময়, শ্রম ও অর্থের নিরিখে সম্পাদনযোগ্য হতে হবে।

(গ) গ্রন্থ পর্যবেক্ষণ (Review of Literature) :

গবেষণার সমস্যা বা বিষয় স্থির করা হলে গবেষকের দ্বিতীয় কাজ হল ঐ বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আহরণ করা। অর্থাৎ সমস্যার প্রকৃতি, কারণ গভীরতা এসব বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকলে গবেষণা সঠিক পথে চালানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন পুস্তক পাঠের মাধ্যমে গবেষণা করা বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে পারে। এর ফলে গবেষণা নকল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকে না তেমনি গবেষণার সঠিক দিক নির্দেশও পাওয়া যায়। এছাড়াও গবেষণাকালীন কি ধরনের সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিতে পারে তা সে ব্যাপারেও কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন পুস্তক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নেও সাহায্য করা সম্ভব হয়। পুস্তক পর্যবেক্ষণ বলতে কেবলমাত্র প্রকাশিত পুস্তকেই বোঝায় না অপ্রকাশিত পুস্তক বিভিন্ন জার্নাল বা সাময়িক পত্রিকা সরকারি প্রতিবেদন, আলোচনা সভার পর্যায়করণ ইত্যাদিকেও বোঝায়, সেগুলি থেকে গবেষণার উপযোগী বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এগুলি কেবলমাত্র পড়লেই হবে না সেগুলির একটি তালিকাও তৈরি করতে হবে। কারণ গবেষণায় সাহায্যকারী পুস্তক ও যে-উৎস থেকে গবেষণা সম্পর্কিত কোন বিষয়বস্তু নেওয়া হয়েছে সেগুলি পুস্তকসূচীতে উল্লেখ করা দরকার।

অনুশীলনী :

০১। গবেষণার প্রধান ধাপগুলি কি?

০২। গবেষণার সমস্যা নির্ণয় কেন প্রয়োজন এবং কিভাবে তা করা হয়।

১.৪ প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণ (Formation of Hypothesis)

(ক) ধারণা : প্রকল্প বলতে বোঝায় এক বা একাধিক সংকল্প বা প্রস্তাব যা কোন বিষয় বা বস্তু ঘটার পিছনে ব্যাখ্যা হিসাবে দেওয়া হয়। এটি একটি সাধারণ ও সাময়িক অনুমান হতে পারে যা সমীক্ষার দিক নির্দেশ করে অথবা প্রতিষ্ঠিত সত্যের নিরিখে কোন সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। যখন প্রতিষ্ঠিত সত্যের নিরিখে কোন প্রকল্প স্থির করা হয় তখন সাধারণত: প্রকল্পের বৈধতা যাচাই করা হয়। বেশিরভাগ সময়েই একটি গবেষণামূলক প্রকল্প হল ভবিষ্যৎ অনুমান সূচক বক্তব্য যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা যায়। অর্থাৎ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্বাধীন চলকগুলি ও নির্ভরশীল চলকগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে দেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যেসব স্কুল-কলেজে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক পরামর্শ দেওয়া হয় সেসব ছাত্ররা কর্মজগতে বিশেষ সাফল্য পায় এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশী হয়। এখানে স্বাধীন চলকটি হল বৃত্তিমূলক 'পরামর্শ' এবং নির্ভরশীল চলকটি হল কর্মজগতে তাদের 'উৎপাদনশীলতা'।

ওয়েবস্টার অভিধান প্রকল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাহল 'এটি একটি প্রস্তাব, অবস্থা অথবা নীতি, যা সম্ভবত: বিশ্বাস ছাড়াই অনুমান করে নেওয়া হয়, যার উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তিস্থাপন করা এবং প্রকল্পের বক্তব্যের সাথে সত্যের যোগসূত্র পরীক্ষা করা যা' গবেষণার মাধ্যমে জানা যায় বা স্থির করা যায়।'

একটি প্রকল্প খুবই উপযোগী বলে গণ্য হয় যদি সেটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে যদিও প্রকল্প অত্যন্ত উপযোগী বলে গণ্য হয় কিন্তু সব গবেষণার ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আবিষ্কারমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন কোন সমস্যামূলক গবেষণা চালানো হয় তখন এক বা একাধিক প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরূপ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বা একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়, যেগুলি সমস্যার কারণগুলিকে চিহ্নিত করে বা অনুসন্ধানের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক চলকের মধ্যে 'সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রকল্প সাধারণভাবে দু'ধরনের—নিষ্ফল বা বাতিল প্রকল্প (null hypothesis) এবং পরিবর্ত প্রকল্প (alternate hypothesis)। নিষ্ফল বা বাতিল প্রকল্পকে H_0 ও পরিবর্ত প্রকল্পকে H_1 দ্বারা প্রকাশ করা হয়। নিষ্ফল প্রকল্প তৈরি করা হয় পরিবর্ত প্রকল্পকে পরীক্ষা করার জন্য। পরিবর্ত প্রকল্প যা বলে নিষ্ফল প্রকল্প তার বিপরীত বক্তব্য রাখে। তাই নিষ্ফল প্রকল্পটি যদি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অসমর্থিত বা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

(খ) উপযোগিতা : গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকল্পের **উপযোগিতা** কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এর উপযোগিতা নিম্নোক্ত কারণে উপযোগী বলে গণ্য হয়:

1. প্রকল্প গবেষণাকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করে।
2. প্রকল্প গবেষক সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে অর্থাৎ কিভাবে গবেষণার কাজ করা হবে,

কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কিভাবে প্রাপ্ত তথ্যগুলি উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে সেব্যাপারে সাহায্য করে।

3. প্রকল্প গবেষককে যেমন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে তেমনি গবেষণার কাজের মধ্যে পরিচ্ছন্নতাও প্রদান করে।

4. এগুলি ছাড়াও প্রকল্প গবেষককে তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে সে ব্যাপারেও সাহায্য করে।

(গ) প্রকল্প পরীক্ষা (Test of Hypothesis) :

প্রকল্প পরীক্ষা গবেষণার মৌলিক কাজগুলির অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প প্রণয়ন করার পর প্রকল্পের বৈধতা পরীক্ষা করতে হয়। এই পরীক্ষা কতকগুলি ধাপে সম্পন্ন হয়। এই ধাপগুলি হল—

(1) প্রকল্প প্রণয়ন বা বিধিবদ্ধকরণ (Formulation of a hypothesis) : প্রকল্প প্রণয়ন বা বিধিবদ্ধকরণ হল গবেষণার ভিত্তি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গবেষণার ক্ষেত্রে দু' ধরনের প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়—নিষ্ফল বা **বাতিলযোগ্য প্রকল্প** (null hypotheis) এবং **পরিবর্ত প্রকল্প** (alternate hypothesis)। উভয় ধরনের প্রকল্প সাধারণত: কিরূপ হয় তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হল।

ধরা যাক একটি ঔষধ কোম্পানী বাজারে একটি নতুন ঔষধ উপস্থাপন করতে চাইছে। কিছু রুগীর উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ঔষধটি বাজারে উপস্থাপন করা হবে কি হবে না। প্রকল্প পরীক্ষার জন্য প্রথমেই পরীক্ষার বিস্তৃতি (parameter) অনুমান করতে হবে এবং এই অনুমানই হল প্রকল্প।

প্রথমেই একটি বাতিলযোগ্য বা নিষ্ফল প্রকল্প নিয়ে শুরু করতে হবে এবং ধরা যাক্ প্রকল্পটি হল: H_0 ; P = 100. এই প্রকল্পে P হল যতজন রুগীর উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া দেখা হবে অর্থাৎ পরীক্ষার বিস্তার (Population parameter)।

এবার এটি পরিবর্ত প্রকল্পের 'সাপেক্ষে পরীক্ষা করতে হবে এবং পরিবর্ত প্রকল্পটি হল H_1 : P $\neq$ 100।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিষ্ফল বা বাতিলযোগ্য প্রকল্পটি পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য না বাতিলযোগ্য তা স্থির করতে হবে। যদি নিষ্ফল প্রকল্পটি বাতিল হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয় এবং বিপরীতক্রমে যদি নিষ্ফল প্রকল্পটি গৃহীত হয় তাহলে পরিবর্ত প্রকল্পটি বাতিল বলে গণ্য হয়।

(2) একটি উপযোগী তাৎপর্যের স্তর স্থির করা (Setting up a suitable significance level) :

নিষ্ফল বা বাতিলযোগ্য প্রকল্পটি গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে দু' ধরনের ত্রুটি বা ভ্রান্তি দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এগুলি হল—

(i) প্রথম ধরনের ত্রুটি (Type 1 error) : যখন নিষ্ফল প্রকল্পটিকে বাতিল করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সঠিক; এবং

(ii) দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি (Type II error) : যখন নিষ্ফল প্রকল্পটিকে গ্রহণ করা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পটি সঠিক নয়।

তাৎপর্যের স্তর বলতে বোঝায় প্রকল্প পরীক্ষার প্রথম প্রকার ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা। সাধারণত: এর মান 5% ধরে নেওয়া হয় (অর্থাৎ a = ·05)। এর অর্থ হল প্রকল্প পরীক্ষার পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেখানেও ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অবশ্য কখনো কখনো a-র মান 1% (a = ·01) নেওয়া হয়। তবে তা নির্ভর করে অনুসন্ধানকারীর পছন্দের উপর এবং গবেষণার বিষয়ের সংবেদনশীলতার উপর।

(ঘ) উপযুক্ত পরীক্ষার মান স্থির করা (Determining appropriate test criterion) :

গবেষণার জন্য যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বৈধতা নিরূপণ করার জন্য একটি উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি বা পরীক্ষার মান স্থির করতে হয়। সাধারণত: সংগৃহীত তথ্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই পরীক্ষা পদ্ধতি স্থির করা হয়। কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হল—

(i) নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন—যেক্ষেত্রে স্যাম্পেল বা নমুনার সংখ্যা 30 বেশী হয় সেক্ষেত্রে এই পরীক্ষা পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী।

(ii) t-ডিস্ট্রিবিউশন—নমুনা বা স্যাম্পেলের সংখ্যা কম হলে সেখানে t-tests করা হয়।

(iii) এছাড়াও F-Test ও Chi-square test ব্যবহৃত হয়।

(4) সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision making) :

উপযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যগুলির গড় (mean) বের করা হয় এবং নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলের ফলের সাথে তুলনা করা হয়। যদি পরীক্ষালব্ধ ফল নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলে উল্লিখিত ফলের চেয়ে বেশী হয় তাহলে নিষ্ফল প্রকল্পটি (null hypothesis) বাতিল বলে গণ্য হয় ও পরিবর্ত প্রকল্পটি গৃহীত হয়। বিপরীতক্রমে নিষ্ফল প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

(চ) একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলী (Characteristics of a good hypothesis) :

গবেষণার ক্ষেত্রে গৃহীত একটি প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছনীয়:

1. প্রকল্পটিকে সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট এবং সহজ ভাষায় সরল বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

2. প্রকল্পটি এমন হবে যাতে সেটিকে পরীক্ষা করা যায়।

3. সম্পর্কভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যেন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত চলকগুলির (variables) মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে।

4. প্রকল্পের পরিধি (scope) খুব ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এর পরিধি যত সীমিত হয় প্রকল্পটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ততটাই সুবিধা হয়।

5. প্রকল্পটি যথাসম্ভব সহজভাষায় প্রকাশ করা উচিত যাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই প্রকল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়টি সহজেই অনুধাবন করতে পারে।

6. প্রকল্পটি যেন জ্ঞাত বা গৃহীত ঘটনার নামে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

7. একটি ভাল প্রকল্প সবসময়ই যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে পরীক্ষার (testing) উপযোগী হয়।

অনুশীলনী :

০১। প্রকল্প বিধিবদ্ধকরণের অর্থ কি এবং এর উপযোগিতা ব্যাখ্যা করুন।

০২। একটি ভাল প্রকল্পের গুণাবলীগুলির উল্লেখ করুন।

১.৫ গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা (Research Design)

(ক) অর্থ : গবেষণার নক্শা হল 'গবেষণা সংক্রান্ত সার্বিক পরিকল্পনা ও কৌশল যার মাধ্যমে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় বা গবেষণার প্রকল্পটি পরীক্ষা করা যায়।' এটি হল গবেষণার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত শর্তগুলির বিন্যাস— যাতে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা কিভাবে ও কখন কোন্ কাজটি করতে হবে তা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে গবেষণার দিক নির্দেশের কাজটি সম্পন্ন হয়। গবেষণার নক্শা বা রূপরেখা গবেষণাকে উদ্দেশ্যমুখী করে ও সঠিকপথে চলতে সাহায্য করে। এর দ্বারা অহেতুক অনুসন্ধান চালানো সম্ভাবনা যেমন কমে তেমনি গবেষণায় সাফল্য পাওয়ার বিষয়টি অনেকাংশে সুনিশ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি হল গবেষণার ধারণামূলক কাঠামো যার মধ্যে গবেষণা পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে সম্ভাব্য গবেষণার এটি হল ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা ভবিষ্যৎ রূপরেখা। এই নক্শা বা রূপরেখা গবেষণার ধরন ও উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একথা বলা যায় যে গবেষণার ধরন বা উদ্দেশ্য বিভিন্ন হলে গবেষণার নক্শাও বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতিটি গবেষণার ক্ষেত্রেই একটি উপযুক্ত ও কার্যকরী গবেষণার নক্শা তৈরি করতে হয়। গবেষণার এমন কোন নির্দিষ্ট নক্শা নেই যা' সব ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রেই অনুসৃত হতে পারে। তবে একথা ঠিক যে নক্শার কাঠামোটি কম-বেশী একইরূপ হয়।

(খ) গবেষণার নক্শার উপাদানসমূহ (Components of a Research Design)

গবেষণার নক্শা বলতে বোঝায় গবেষণা চালানোর জন্য গবেষক গবেষণার প্রাথমিক স্তরে যে রূপরেখা তৈরী করে। এটি হল গবেষণা কিভাবে পরিচালিত হবে সে সংক্রান্ত আগম পরিকল্পনা। এটি সবসময়ই উদ্দেশ্যমুখী এবং সংগঠিতভাবে গবেষণার কাজগুলি সম্পন্ন করার রূপরেখা। গবেষণার নক্শা তৈরীর আগে গবেষককে কতকগুলি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং তারপর গবেষণার নকশা চূড়ান্ত করতে হয়। এই সিদ্ধান্তের বিষয়গুলি হল—

(i) গবেষণার বিষয় সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু কি? প্রকৃতপক্ষে, ভূমিকায় এই বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ থাকে।

(ii) গবেষণার কারণ সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ গবেষণা কেন চালানো হবে?

(iii) গবেষণার স্থান সম্বন্ধীয়—অর্থাৎ গবেষণা কোথায় চালানো হবে?

(iv) তথ্য ও উপাত্ত সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণায় কি ধরনের তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে?

(v) তথ্য ও উপাত্তের উৎস সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে?

(vi) গবেষণার সময় সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণা চালানোর জন্য কতটা সময় পাওয়া যাবে বা গবেষণার সময়সীমা কি?

(vii) গবেষণার স্যাম্পেল বা নমুনা সংক্রান্ত—অর্থাৎ গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্ত যে উৎস থেকে সংগ্রহ করা হবে তার পরিধি কিরূপ?

(viii) তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়ক—অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী বলে বিবেচিত হবে এবং গ্রহণ করা হবে?

(ix) তথ্য বিশ্লেষণ বিষয়ক—সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের জন্য কোন্ পদ্ধতি সর্বাধিক উপযোগী হবে এবং গ্রহণ করা হবে?

(x) প্রতিবেদন সংক্রান্ত—সবশেষে গবেষণার প্রতিবেদনটির লিখনশৈলী অর্থাৎ কিভাবে গবেষণার প্রতিবেদন লেখা হবে সে সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে হবে।

উপরের প্রশ্নগুলির উপর গবেষণার নক্শার চূড়ান্তকরণ নির্ভর করে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষক তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলে গবেষণার রূপরেখা বা নক্শা তৈরী করা সম্ভব হয়। এরূপ নক্শার বিভিন্ন অংশ বা অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি সাধারণত: নিম্নরূপ হয়:

(1) সমস্যা : গবেষণার নক্শায় গবেষণার প্রধান সমস্যা বা বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত ও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(2) গবেষণার প্রকৃতি : গবেষণার প্রকৃতি কিরূপ অর্থাৎ গবেষণাটি পরীক্ষমূলক, না বিবরণমূলক, না তত্ত্বমূলক না অন্য ধরনের তা গবেষণার নক্শায় বিবৃত করতে হবে।

(3) উদ্দেশ্য : গবেষণার উদ্দেশ্য কি তা পরিষ্কারভাবে নক্শায় উল্লেখ থাকবে। যেক্ষেত্রে গবেষণার একাধিক উদ্দেশ্য থাকে সেক্ষেত্রে প্রধান উদ্দেশ্য ও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি অবশ্যই স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। তবে সাধারণ নিয়মানুযায়ী উদ্দেশ্যের সংখ্যা **ছয়ের** বেশী হওয়া বাঞ্ছণীয় নয়।

(4) মূল ধারণা : গবেষণার বিষয় বা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষক যেসব ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে অনুসন্ধান কাজে অগ্রসর হতে চান সেগুলির কার্যগত ব্যাখ্যা নক্শার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(5) গবেষণার পরিধি : গবেষণার রূপরেখা বা নক্শার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল গবেষণার পরিধি সংক্রান্ত বিষয়টি। গবেষণার তাৎপর্য ও সঙ্গতি সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য নক্শায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ গবেষণা কেন চালানো হচ্ছে? বর্তমান জ্ঞানভাণ্ডারকে এই গবেষণা কতখানি সমৃদ্ধ করবে? গবেষণা কোন্ উদ্দেশ্য পূরণ করতে সমর্থ হবে ইত্যাদি। এর সাথে তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত পরিধিরও উল্লেখ থাকে, যেমন তথ্য সংগ্রহের উৎসের আকার ও আয়তন, নমুনার আকার ও আয়তন ইত্যাদি।

(6) তথ্য সংগ্রহ : গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল তথ্য ও উপাত্ত (data) সংগ্রহ ও সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণের দ্বারা সিদ্ধান্তগ্রহণ। গবেষণার নক্শায় এ সংক্রান্ত বিশদ্ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। গবেষণার নক্শার এ সংক্রান্ত উপাদানগুলি হল—

(a) তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের উৎস সংক্রান্ত বিবরণ;

(b) তথ্য সংগ্রহে যেসব পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা হয় সেগুলির বিবরণ; এবং

(c) যে অবস্থায় তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার বিবরণ,—যেমন বাড়ি বাড়ি গিয়ে না একজায়গায় বসে তথ্য সংগ্রহ করা হবে, সকালে না সন্ধ্যায় তথ্য সংগ্রহের কাজ চালানো হবে, প্রাথমিক তথ্য ও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি।

(7) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বিশ্লেষণ : সবশেষে সংগৃহীত তথ্য কিভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হবে তার উল্লেখ গবেষণা নক্শায় থাকে। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যের ঝাড়াই-বাছাই, সুসংবদ্ধকরণ, সম্পাদনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা কিভাবে করা হবে নক্শায় তার উল্লেখ থাকে।

অনুশীলনী :

০১। গবেষণার রূপরেখার অর্থ ও তার উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

১.৬ নমুনাকরণ বা নমুনাচয়ন বা স্যাম্পলিং (Sampling)

(ক) ধারণা ও গুরুত্ব : গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনাকরণ বা স্যাম্পলিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। তথ্য সংগ্রহের সমস্ত উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক উৎস নির্বাচন করে সেই উৎসগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। উৎসের সংখ্যা যখন খুব বেশী হয় বা উৎসের পরিধি যখন ব্যাপক হয় তখন দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়। সম্ভাব্য সমস্ত উৎসগুলিকে কথায় 'জনগোষ্ঠী' বা population বলা হয়। এই জনগোষ্ঠী বা population থেকে সবসময় তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। কারণ এর ফলে যে পরিমাণ শ্রম, সময় ও অর্থের প্রয়োজন হয় তা গবেষকের পক্ষে যোগান দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে বিশাল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলির বিন্যাস, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাও জটিল হয়ে পড়ে। তাই সাধারণত: জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি মূলক একটি ছোট জনগোষ্ঠী নির্বাচন করা হয় এবং এদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই বলে নমুনাকরণ বা sampling.

উদাহরণ স্বরূপ, কোলকাতার রাজবাগান বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারগুলির আর্থসামাজিক অবস্থা নিরূপণের উদ্দেশ্যে একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা চালানো হবে। ধরা যাক্, ঐ বস্তিতে 10,000টি পরিবার বসবাস করে। তাহলে এখানে তথ্য সংগ্রহের জনগোষ্ঠী বা population হল 1,000। কিন্তু এই 1,000টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, ব্যায়সাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই গবেষক তার কাজের বোঝা যাতে কম হয় সেজন্য ওই 1,000টি পরিবার থেকে প্রতি 10টি পরিবার পিছু 1টি পরিবার নির্বাচন করে অর্থাৎ বস্তির মোট 100টি পরিবার বেছে নেয় এবং ঐ 100টি পরিবার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে। 1000টি পরিবার থেকে এই 100টি পরিবার বেছে নেওয়ার পদ্ধতিটিকেই sampling বা নমুনাকরণ বলা হয়। অবশ্য এই 100টি পরিবার গবেষকের খুশি বা ইচ্ছামত বেছে নেওয়া যায় না। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এই বাছাইয়ের কাজ করতে হয় যাতে নির্বাচিত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী অর্থাৎ নমুনা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ population-কে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। অন্যথায় গবেষণার ফল ফলপ্রসূ হয় না।

নমুনাকরণ বা sampling গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটি বহুল ব্যবহৃত জনপ্রিয় পদ্ধতি। এর ফলে গবেষণার কাজ অনেক হাল্কা হয় ও কম সময়ে ও দ্রুততার সাথে গবেষণা চালানো সম্ভব হয়। এর যেমন কতকগুলি বিশেষ সুবিধা রয়েছে তেমনি এর অসুবিধাও রয়েছে। কারণ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বা sample যদি বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ Population-এর প্রকৃত ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বমূলক না হয় তাহলে গবেষণার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একারণে sample নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় এবং কতকগুলি বিশেষ পরিসংখ্যান মূলক পদ্ধতি (special statistical techniques) ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিগুলিকে sampling techniques বলা হয়।

সুতরাং নমুনাকরণ বা sampling-এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায় যে 'তথ্যের সমগ্র উৎসের একটি অংশ এমনভাবে নির্বাচন করা যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র উৎস সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য করা সম্ভব হয়।' সেজন্য এই পদ্ধতিতে সমগ্র জনগোষ্ঠী বা উৎসের (population) একটি অংশের উপর সমীক্ষা চালিয়ে জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে (population) গবেষণার ভাষায় Universal বলা হয়। তবে Population শব্দটিই বেশী জনপ্রিয় ও বেশী ব্যবহৃত হয়। উপাদানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে Population নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ একজন প্রকাশক যতগুলি বই প্রকাশ করে তার সংখ্যা নির্দিষ্ট (finite) কিন্তু ওই প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের পাঠকের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, **অনির্দিষ্ট** (infinite) Population-কে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়—বাস্তব (real) ও কাল্পনিক (hypothetical or imaginary)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা বাস্তব কিন্তু তাদের অনুপ্রেরণার বিষয়গুলি কাল্পনিক কারণ এ ব্যাপারে 'সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। Sampling-এর আলোচনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে একজন গবেষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

(i) নমুনাকরণের নক্শা (Sampling design) : এটি হল একটি নমুনাকরণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাতে population থেকে সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা (sample) তৈরি করা সম্ভব হয়।

অর্থাৎ এই নমুনা নির্বাচনে কোন পরিসংখ্যামূলক পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে যাতে নমুনা থেকে সমগ্র population সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তাও নক্শার অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) নমুনা বিভাজন (Sampling distribution) : যেক্ষেত্রে একাধিক নমুনা নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি নমুনার কতকগুলি পরিসংখ্যামূলক পরিমাপ যেমন গড় (mean), সম্যক পার্থক্য (standard deviation), সীমা (range) প্রতিসম্পর্ক (corelation) ইত্যাদি বের করা হয়। এই প্রতিটি নমুনার মান একটি তালিকাকারে প্রকাশ করে নমুনা বিভাজন তৈরি করা হয়। নমুনা বিভাজন থেকে নমুনার আস্থা বা নির্ভরযোগ্যতার স্তর সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ নমুনাটির উপর কতখানি আস্থা রাখা যায়।

ধরা যাক্ একজন গবেষক স্থির করে যে **আস্থার স্তর** 95% (95% confidence level), সেক্ষেত্রে বোঝায় যে প্রতি 100টি নমুনার মধ্যে 95টি নমুনা Populationকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে। আস্থার স্তরের বিপরীত ব্যাখ্যা দেয় **তাৎপর্যের স্তর** (significance level) অর্থাৎ কতগুলি নমুনা স্বাভাবিকভাবেই populationকে প্রতিনিধিত্ব করে না। আস্থার স্তর ও তাৎপর্যের স্তর তাই পরস্পরের পরিপূরক। দুই স্তরের যোগফল 100 হয়। তাই আস্থা বা নির্ভরতার স্তর 95% হলে স্বাভাবিকভাবেই তাৎপর্যের স্তর হয় 5%। সুতরাং 5% তাৎপর্যের স্তর (5% significance level) প্রকাশ করে যে প্রতি 100টি নমুনার মধ্যে 5টি নমুনা population-এর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

(iii) নমুনার ত্রুটি বা ভুল (Sampling errors) : যেহেতু বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা population থেকে একটি অংশ নমুনা বা sample হিসাবে তৈরি করা হয় তাই সব নমুনা সবসময় এবং সম্পূর্ণভাবে Population-এর বিভিন্ন চরিত্র সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে এ আশা করা যায় না। নমুনা বা sample-এর মধ্যে কিছু ত্রুটির সম্ভাবনা সবসময়ই থেকে যায় এমনও দেখা গেছে যে একই **population** থেকে দুটি বা তিনটি নমুনা তৈরী করা হয়েছে তথাপি তাদের ফলাফলের ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্যকেই **নমুনার ত্রুটি** বা **sampling error** বলা হয়। অন্যদিকে তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বা তথ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতিগত ত্রুটি বা মানবিক ত্রুটিগুলিকে **Non sampling error** বলে।

(খ) নমুনা চয়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী (Rules relating to selection of sample) :

নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মটি হল যে মোট জনগোষ্ঠী (Population) থেকে যদি অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক বিষয় উদ্দেশ্যহীনভাবে (at random) নির্বাচন করা হয় তাহলে নমুনার চরিত্র মোট জনগোষ্ঠীর (Population) চরিত্রকে প্রায় সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন গাছের 1000টি পাতা উদ্দেশ্যহীনভাবে তুলে নেওয়া হয় এবং তাদের গড় দৈর্ঘ্য বের করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে গাছের সমস্ত পাতা তুলে সেগুলির গড় দৈর্ঘ্য বের করলে যে ফল পাওয়া যাবে তা নমুনার ফলের খুবই কাছাকাছি। পরিসংখ্যানগত নিয়মাবলীর উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্ব পায়। এগুলি হল—

(1) নমুনার (sample) সংখ্যা বা আয়তন যত বড় হবে, তার মধ্যে জনগোষ্ঠীর (Population) প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতাও তত বেশী হবে। নমুনার উপর নির্ভরতা বা আস্থা নির্ণয়ের সূত্রটি হল:

নমুনার উপর নির্ভরতা $\propto \sqrt{\text{[illegible]}}$

উপরের উদাহরণ থেকে বলা যায়, যদি গাছটি থেকে 1000টি পাতার বদলে 500টি পাতা নমুনা হিসাবে তোলা হয় তাহলে নমুনার উপর নির্ভরতা কমবে।

প্রথম ক্ষেত্রে, নমুনার উপর, নমুনার উপর নির্ভরতা $= K\sqrt{1000}$ (k ধ্রুবক)

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নমুনার উপর নির্ভরতা $= K\sqrt{500}$

সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে, নির্ভরতার মান সেখানে 31·62K, সেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই মান 22·36K.

(ii) নমুনা অবশ্যই উদ্দেশ্যহীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে (at ramdom) বাছাই করতে হবে।

উপরিউক্ত নিয়ম অনুসারে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটি অংশ ওই জনগোষ্ঠীর চরিত্রকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয় যখন একটি জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা চালানো স্থির হয়। কিন্তু শ্রম, সময় ও অর্থের অভাবে সমস্ত জনগোষ্ঠী থেকে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা তৈরী করে তথ্য সংগ্রহ করা সর্বাধিক প্রচলিত উপায়। এই নীতি দাবি করে যে লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা নির্বাচন করলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সবধরনের উপাদানই খারাপ, ভাল ও সাধারণ নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে।

তবে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাবধানতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। নির্বাচন অবশ্যই পক্ষপাতশূন্য (unbiased) হতে হবে। অন্যথায়, নমুনা নির্বাচনে কোন গলদ থাকলে তা সমগ্র জনগোষ্ঠীর চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। সেজন্য লক্ষ্য রাখতে হবে যে নমুনা যেন সমগ্র জনগোষ্ঠীর অনুরূপ হয়। আর এরূপ হতে হলে জনগোষ্ঠীর প্রতিটি বিষয়ের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান হতে হবে। 'নমুনায় বেশী সংখ্যক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হলে, জাড্যতার সূত্র অনুসারে, নমুনার নির্ভুলতার সম্ভাবনা বেশী হয় এবং নমুনা ছোট হলে নির্ভুলতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(গ) নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব (Theory of Sampling) :

নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব বলতে বোঝায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী (Population) ও ঐ জনগোষ্ঠী থেকে যে নমুনার নির্বাচন করা হয় ও তদের যে আন্ত:সম্পর্ক থাকে সে ব্যাপারে আলোকপাত করা। লক্ষ্যহীনভাবে নমুনা নির্বাচনের (random sampling) ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব প্রযুক্ত হয়। বস্তুত: নমুনা নির্বাচনের তত্ত্ব থেকে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং সাথে সাথে এই ধারণা যাতে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারেও সহায়তা করে। নমুনা নির্বাচন তত্ত্ব যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) পরিসংখ্যানগত পরিমাপ (statistical estimation) : নমুনা নির্বাচন তত্ত্ব নমুনা থেকে পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে জনসমষ্ঠির (population) অজ্ঞাত কোনো চরিত্র নিরুপণ করতে সাহায্য করে। এই পরিমাপ দু' ধরনের হতে পারে—একক বা **বিন্দু গণনা** (point estimate) বা **বিস্তৃত গণনা** (internal estimate)। প্রথম ক্ষেত্রে একটি মাত্র সংখ্যা দ্বারা গণনার ফল প্রকাশ করা হয় ও দ্বিতীয়

ক্ষেত্রে গণনার ফল একটি বিস্তৃতির মাধ্যমে, অর্থাৎ যার একটি নিম্নসীমা ও ঊর্দ্ধসীমা থাকে, প্রকাশ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 10টি যন্ত্রাংশের একটি নমুনায় দেখা গেল যে 1টি যন্ত্রাংশ অকেজো (defective)। সুতরাং বলা যায় যে 100 টি যন্ত্রাংশে অকেজো যন্ত্রাংশের পরিমাণ 10। অনুরূপভাবে যখন এরূপ একাধিক নমুনা পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় তখন তার ভিত্তিতে বলা যায় যে 100টি যন্ত্রাংশের মধ্যে অকেজো যন্ত্রাংশ থাকার সম্ভাবনা 8 থেকে 12।

(ii) প্রকল্প পরীক্ষা (Tesing of hypothesis) : নমুনা নির্বাচন তত্ত্বের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল প্রকল্পটি পরীক্ষা করে সেটি গ্রহণ বা বর্জন করা। প্রকল্প পরীক্ষায় ফলের যে পার্থক্য দেখা যায় তা দৈবক্রমে (due to chance) ঘটেছে নাকি এই পার্থক্য প্রকৃতই তাৎপর্যপূর্ণ তা জানতে এই তত্ত্ব সাহায্য করে।

(iii) পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত (Statistical infernce) : এই তত্ত্ব নমুনার চরিত্র থেকে জনসমষ্টির চরিত্র প্রকাশ করতেও সাহায্য করে। এছাড়াও পরিসংখ্যানমুলক তত্ত্ব নমুনার ফলাফল থেকে জনসমষ্টি সম্বন্ধে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে।

(ঘ) গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of sampling techniques) :

পরিমাণমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যাপক ব্যাবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব কোনভাবেই হ্রাস করা যায় না। শিক্ষা, অর্থনীতি, বানিজ্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার ঘটে। এমনকী আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মেও আমরা নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করি। কারণ শাকসব্জি বা নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করার সময় নমুনা দেখেই আমরা ক্রয়সিদ্ধান্ত নিই, প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা করি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডাক্তাররা রুগির এক-দু'ফোঁটা রক্ত পরীক্ষা করেই রক্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার কেবলমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রেই হয় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজকর্মের ক্ষেত্রেও আমরা এর ব্যবহার করে থাকি। নমুনা পদ্ধতির যেসব বৈশিষ্ট্যর জন্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি হয় সেগুলি হল নিম্নপুপ:

(i) ব্যায়সঙ্কোচ (Economy) : জনসমষ্টির প্রতিটি বিষয় পর্যলোচনা করা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ, শ্রম সাপেক্ষ, ও সময় সাপেক্ষ। নমুনা নির্বচন পদ্ধতির সাহায্যে ব্যয় সঙ্কোচ করা যেমন সম্ভব হয়, তেমনি শ্রমের অপচয় রোধ করা যায় ও সময় সংক্ষেপেও করা সম্ভব হয়।

(ii) নির্ভরতা (Reliability) : যদি জনসমষ্টির চরিত্র অসদৃশ বা ভিন্নজাতীয় (heterogenous) না হয় এবং সাবধানতার সাথে নমুনা নির্বাচন করা হয়, তাহলে নমুনার ফলাফল জনসমষ্টির কোন বিশেষ চরিত্রকে সঠিকভাবেই প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয় অর্থাৎ নমুনার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায়।

(iii) পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা (Detailed study) : যেহেতু নমুনায় কম সংখ্যক উপাদান থাকে তাই ঐ উপাদানগুলি সবিস্তারে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও প্রাগাঢ়ভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নমুনাকে বিচার করা হয় বলে ফলাফলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কমে যায়।

(iv) বৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Scientitific base) : নমুনা পদ্ধতির একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। সমগ্র জনসমষ্টি থেকে নমুনা অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে করা হয় যাতে নমুনাটি ঝোঁকশূন্য (unbiase) হয়।

(v) অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই অত্যন্ত উপযোগী (Suitability in most situations) : গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব সমীক্ষা চালানো হয় সেগুলির অধিকাংশই নমুনা সমীক্ষা। বৃহৎ জনসমষ্টির উপর সার্বিক সমীক্ষা খুব কম ক্ষেত্রেই চালানো হয়। কারণ জনসমষ্টির চরিত্র যদি সদৃশ হয় তাহলে নমুনার কোন বিশেষ চরিত্র ও জনসমষ্টির চরিত্রের মধ্যে বিচ্যুতি দেখা যায় না। তাই অধিকাংশ পরিস্থিতিতেই নমুনা পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো হয়।

গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যপক ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও, একথা সত্য যে নমুনা পদ্ধতি সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। নিচের ক্ষেত্রগুলিতে নমুনা পদ্ধতি খুব একটা কার্যকরী বলে গণ্য হয় না। যেসবক্ষেত্রে এর ব্যবহার আবশ্যিক বলে গণ্য হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) বিশাল উপাত্ত (Data is vast) : যখন গবেষণার জনসমষ্টি বিশাল এবং প্রচুর পরিমাণে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির ব্যবহার খূবই আবশ্যিক।. এর ফলে অর্থ, শ্রম ও সময়ের যেমন সাশ্রয় ঘটে তেমনি গবেষণার জটিলতাও অনেকাংশে হ্রাস পায়।

(ii) যেক্ষেত্রে একশ ভাগ নির্ভুলতার প্রয়োজন হয় না (Where cent percent accuracy is not required) : গবেষণার যেসব ক্ষেত্রে ফলাফল মোটামুটি নির্ভুল হলেও চলে, একশ ভাগ নির্ভুল হওয়ার দরকার হয় না, সেসব ক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই।

(iii) যেক্ষেত্রে জনগণনা সম্ভব নয় (Where census is not feasible) : সাধারণভাবে গবেষণার সমস্ত উপাদান বা জনসমষ্টির (populations) উপর সমীক্ষা চালিয়ে প্রায় একশভাগ নির্ভুল ফলাফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু যেক্ষেত্রে জনগণনা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে নমুনা পদ্ধতিই একমাত্র উপযুক্ত উপায় বলে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরুপ, যদি ভারতের খনিজ সম্পদের পরিমাণ জানতে চাওয়া হয় তাহলে ভারতের সমস্ত খনিগুলি খনন করে খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সুতরাং নমুনা পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

(iv) সদৃশ্যতা (Homogeneity) : জনসমষ্টির সামগ্রিক চরিত্র যদি সদৃশ হয় তাহলে নমুনা পদ্ধতি ব্যবহার করা অনেক সহজ হয় ও নমুনার ফলাফল জনসষ্টির চরিত্রকে অনেক বেশী নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়।

তবে একথা সত্য যে নমুনা নির্বাচনে যদি কোন গলদ থাকে অর্থাৎ ঝোঁকশূন্য ও নিরপেক্ষভাবে নমুনা নির্বাচন করা না যায় তাহলে নমুনার ফলাফল গবেষণাকে বিভ্রান্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা যদি একটি বস্তির অধিবাসীদের পারিবারিক ব্যয় নির্ধারণ করতে চাই এবং নমুনা সমীক্ষায় যদি সেই পরিবারগুলিকে নির্বাচন করি যাদের পাকা বাড়ি আছে তাহলে প্রাপ্ত ফলাফল বস্তিবাসীদের সঠিক

পারিবারিক ব্যয় নির্ধারণ করতে সমর্থ হয় না। কারণ নমুনাতে যাদের পাকা বাড়ি নেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে নমুনা পদ্ধতি তখনই সফল হয় যখন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ও নিরপেক্ষভাবে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয়। ইচ্ছামত নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচন করলে ফলাফলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাজেই গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে ও যত্নসহকারে নমুনা নির্বাচন করে গবেষণার কাজ চালানোই যুক্তিযুক্ত।

(ঙ) নমুনাকরণের পদ্ধতিসমূহ (Mothods of Sampling) :

গবেষণার ক্ষেত্রে বিশাল জনসমষ্টি (population) থেকে ছোট নমুনা নির্বাচন (sampling) করে তথ্য সংগ্রহ করা খুবই কার্যকরী বলে গণ্য হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে নমুনা নির্বাচন অবশ্যই বৈজ্ঞনিকভাবে সম্পাদিত হবে অর্থাৎ এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকবে এবং মূল্য জনসমষ্টির সঠিক প্রতিনিধিত্ব করতে সমর্থ হবে। অন্যথায় গবেষণায় বিচ্যুতির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় নমুনাকরণ বা নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অনুসৃত হয় সেগুলিকে প্রধানত: দুটিভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল:

(1) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ বা নিরপেক্ষ বা ঝোঁকশূন্য স্যাম্পলিং পদ্ধতি (random sampling method); এবং

(2) সম্ভাবনা রহিত নমুনাকরণ বা ঝোঁকপূর্ণ নন-স্যাম্পেলিং পদ্ধতি (non-random sampling method)।

(1) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ বা নিরপেক্ষভাবে নমুনাকরণ পদ্ধতি :

এই পদ্ধতি অনুসারে বৃহৎ জনসমষ্টি (population) থেকে যখন নমুনা (sample) তৈরী করা হয় তখন বৃহৎ জনসমষ্টির প্রতিটি উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। অর্থাৎ এরুপ নির্বাচন ব্যক্তি নিরপেক্ষ হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নমুনা তৈরী করেন তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ নমুনা। নির্বাচনকে প্রভাবিত করে না। এরুপক্ষেত্রে নমুনার প্রতিটি বিষয় বা উপাদান বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নির্বিচারে ও নিরপেক্ষভাবে তুলে নিয়ে নমুনাটি তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করা হলে ব্যক্তিগত ঝোঁক-এর বিষয়টিকে এড়ানো সম্ভব হয়। এই পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরুপ :

(i) সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ তৈরি ও তার কার্যকারিতা জনসমষ্টি সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের উপর নির্ভর করে না।

(ii) সম্ভবনাযুক্ত নমুনাকরণ থেকে অনুমান পাওয়া যায়। এই অনুমানগুলি ঝোঁকহীন ও নিরপেক্ষ এবং নির্ভুলতা পরিমাপযোগ্য।

(iii) যেক্ষেত্রে গবেষণায় এই পদ্ধতি অনুসারে একাধিক নমুনা তৈরী করা হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি নমুনার আপেক্ষিক দক্ষতা নিরুপণ করা সম্ভব হয়, যা' অন্য পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করলে সম্ভব হয় না।

এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি হল :**

(i) নমুনা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকারীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়।

(ii) এরূপ নমুনা নির্বাচনের জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয় এবং আগাম পরিকল্পনা ছাড়া নমুনা তৈরি সম্ভব হয় না।

(iii) এরুপ নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ব্যয় আনুপাতিকভাবে বেশি। নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনারহিত বা ঝোঁকপুর্ণ নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যাবহার করলে খরচ আনুপাতিকভাবে কম হয়।

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণের ধরণ (Types of probability sampling)

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণের চারটি ধরণ দেখা যায়। এগুলি হল—

(1) সরল নিরপেক্ষ বা ঝোঁকহীন নমুনাকরণ (simple random sampling);

(2) স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ (stratified sampling);

(3) তন্ত্রমূলক নমুনাকরণ (systematic sampling); এবং

(4) গুচ্ছ নমুনাকরণ (cluster sampling)

এগুলি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

(1) সরল ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষ নমুনাকরণ (simple random sampling) :

একটি নমুনাকরণ পদ্ধতিকে সরল ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষ নমুনাকরণ বলা হয় যখন নমুনার প্রতিটি বিষয় বা উপাদান নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, যে জনসমষ্টি থেকে নমুনাটি তৈরী করা হয় সেই জনসমষ্টির অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি বিষয় বা উপাদানের নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে। এক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ব পায় না। অন্যভাবে বলা যায় যে 'n' সংখ্যক উপাদান বিশিষ্ট কোন নমুনা যদি তৈরী করা হয় তাহলে ঐ n সংখ্যক উপাদান যতগুলি সম্ভাব্য সমবায় (possile combination) গঠন করে তাদের নমুনায় অন্তর্ভূক্তির সম্ভাবনা সমান হলে তাকে **সরল ঝোঁকহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি** বলা হয়। এরূপ নমুনা নির্বচনে নিচের প্রণালীগুলির ব্যবহার দেখা যায়:

(a) লটারী পদ্ধতি (Lottry method);

(b) টিপেট-এর সংখ্যা পদ্ধতি (Tippets number method);

(c) আনুক্রমিক তালিকা থেকে নির্বাচন (selection from sequential list); এবং

(d) ঝাঁঝরি বা গ্রিড পদ্ধতি (Grid method)।

এই প্রতিটি পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা নীচে দেওয়া হল।

(a) লটারী পদ্ধতি (Lottery method) : এই পদ্ধতিতে জনসমষ্টির প্রতিটি উপাদান আলাদা করে কাগজে লিখে একটি পাত্রে রাখা হয়। পাত্রের সমস্ত কাগজ ভালভাবে মিশিয়ে সেখান থেকে

একটি করে কাগজ তোলা হয়। এই প্রতিটি কাগজে উল্লিখিত উপাদান নমুনার অন্তর্ভূক্ত হয়। এভাবে যতগুলি উপাদান নিয়ে নমুনাটি গঠন করা স্থির করা হয়, পাত্র থেকে ততগুলি কাগজ তোলা হয়। এভাবে নমুনা নির্বাচনই হল লটারী পদ্ধতির মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন।

(b) টিপেট-এর সংখ্যা পদ্ধতি (Tippet's numbers method) : এল.এইচ. সি. টিপেট- এর নামানুসারে এই পদ্ধতিটির নামকরণ করা হয়েছে। কারণ **টিপেট** চার অঙ্কের সংখ্যা সম্বলিত এমন একটি তালিকা প্রণয়ণ করেছিলেন যার প্রতি পাতায় সংখ্যাগুলি নিরপেক্ষভাবে লেখা রয়েছে। এই তালিকা থেকে সহজেই ঝোঁকহীন বা নিরপেক্ষভাবে কোন নমুনা তৈরী করা যায়। উদাহরণস্বরুপ, যদি 500 লোকের মধ্য থেকে 50 জন লোকের একটি নমুনা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করার দরকার হয় তাহলে টিপেটের সংখ্যা তালিকার যেকোন পাতা খুলে 500-এর নীচে প্রথম 50টি সংখ্যা নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বচন বেশ নির্ভরযোগ্য।

(c) আনুক্রমিক তালিকা থেকে নির্বাচন (selection from sequention list) : এই পদ্ধতিতে জনসমষ্টির উপাদানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট ক্রমে পরপর সাজানো হয়। এই অনুক্রম নামের আদ্যক্ষর বা ভৌগোলিক বা ক্রমিক সংখ্যা অনুসারেও হতে পারে। এভাবে সাজানোর পর যেকোন উপাদানকে নমুনায় অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং নির্বাচন যে কোন জায়গায় থেকে শুরু করা যায়। উদাহরণস্বরুপ, যদি কোন ক্লাসের 100 জন ছাত্রের মধ্য থেকে 10 জন ছাত্রের একটি নমুনা নির্বাচন করা স্থির হয় তাহলে ছাত্রদের রোল নম্বর অনুসারে 5, 15, 25.....95. এই দশজন ছাত্রকে নির্বাচন করা যেতে পারে বা 10, 20, 30.....100 এই রোল নম্বরের 10 জন ছাত্রকে নির্বাচন করে নমুনা তৈরী করা যায়।

(d) ঝাঁঝরি পদ্ধতি (Grid system) : এই পদ্ধতির ব্যবহার সাধারণত: দেখা যায় যখন এলাকাভিত্তিক নমুনা নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এই পদ্ধতিতে পুরো এলাকার একটি মানচিত্র তৈরী করা হয়। এরপর ঐ ম্যাপের উপর বর্গক্ষেত্রসম্বলিত একটি পর্দা বসানো হয় এবং কতকগুলি বর্গক্ষেত্র নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। নির্বচিত বর্গক্ষেত্রগুলি মানচিত্রের যে এলাকাকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে নমুনার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

● সরল নিরপেক্ষ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমুহ (Merits and demerits of simple random sampling) :

এই পদ্ধতির নিমোক্ত সুবিধাগুলি দেখা যায় :

(i) পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত সরল এবং গবেষক বা নমুনা নির্বচনকারীকে নমুনায় কোন বিষয়টিকে নির্বাচন করা হবে এবং কোন বিষয়টিকে নির্বাচন করা হবে না এব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয় না।

(ii) এই পদ্ধতিটি ঝোঁকশূন্য ও নিরপেক্ষ হওয়ায় নমুনা নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

(iii) যেহেতু বৃহৎ জনসমষ্টির (population) প্রতিটি উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে সেহেতু নমুনা মুল জনসমষ্টিকে অনেক ভালভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

(iv) এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে নিয়মানুগ হওয়ায় ফলাফলে যদি কোন ত্রুটি দেখা যায় তাহলেও তা দূর করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) জনসমষ্টির আকার ও আয়তন খুব বড় হলে এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন সবসময় সম্ভব হয় না।

(ii) এই পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচনকারীর নমুনার উপাদান নির্বাচনে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ফলত: নির্বাচিত উপাদানগুলির বিস্তৃতি খুব বেশী হতে পারে এবং এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি উপাদানকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না।

(iii) জনসমষ্টির চরিত্র অসদৃশ (heterogeneous) হলে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয় না।

2. স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ (Stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র জনসমষ্টিকে কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি শ্রেণীকে স্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। এরপর এই প্রতিটি স্তর থেকে নমুনার বিষয় বা উপাদানগুলিকে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে জনসমষ্টিকে উপ-দলে বা উপ-বিভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সঠিক স্তর বিন্যাসের জন্য নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

(i) জনসমষ্টির প্রতিটি স্তর যেন যথেষ্ট বড় হয় যাতে নিরপেক্ষভাবে নমুনা নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো সম্ভব হয়।

(ii) প্রতিটি স্তরের উপাদান বা বিষয়গুলির চরিত্র যেন সদৃশ হয়।

(iii) প্রতিটি স্তর যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের উপাদানগুলি যেন অন্যস্তরের উপাদানগুলির দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত না হয়।

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত: **তিন ধরনের** স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) আনুপাতিক স্তরভিত্তিক নমুনা নির্বাচন (Proportionate stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে যে অনুপাতে মোট জনসমষ্টি থেকে বিভিন্ন স্তরবিন্যাস করা হয় সেই একই অনুপাতে বিভিন্ন স্তর থেকে নমুনার উপাদান নির্বাচন করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন জনসমষ্টি থেকে 5 টি স্তরের উদ্ভব ঘটে তাহলে প্রতিটি স্তর থেকে 5টি বিষয়কে নির্বাচন করে নমুনায় গঠন করা হয়। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই অনুপাত হল 1 : 5।

(ii) অনুপাতরহিত স্তরভিত্তিক নমুনা নির্বাচন (Disproportionate stratified sampling) :

এই পদ্ধতিতে প্রতিটি স্তর থেকে সমান সংখ্যাক উপাদান নির্বাচন করে নমুনাটি গঠন করা হয়।

অর্থাৎ জনসমষ্টি ও স্তরের অনুপাতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এই পদ্ধতিটিকে 'নিয়ন্ত্রিত নমুনা নির্বাচনও' (controlled sampling) বলা হয়।

(iii) স্তরভিত্তিক ভারযুক্ত নমুনা নির্বাচন (Stratified weight sampling) :

যেক্ষেত্রে জনসমষ্টি থেকে গঠিত স্তরগুলির আকার ও আয়তন বিভিন্ন হয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি স্তর থেকে সমপরিমাণ উপাদান প্রথমে নির্বাচন করা হয় এবং ভারযুক্ত গড় পদ্ধতিতে তাদের গড় বের করা হয়। কোন স্তরের উপর কতটা ভার আরোপ করা হবে তা নির্ভর করে মোট জনসমষ্টির আকারের সাথে ঐ স্তরের আকারের অনুপাতের উপর। এভাবে নমুনা নির্বাচনই হল স্তরভিত্তিক ভারযুক্ত নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি।

● স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Merits and demerits of stratified sampling method) :

এই পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিতে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচকের অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণ থাকে। কারণ সরল নিরপেক্ষ বা ঝোঁকশূন্য নমুনাকরণ পদ্ধতিতে (simple random sampling method) কোনো গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীর নমুনাতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না থাকার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু স্তরভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতিতে এই সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।

(ii) এই পদ্ধতিতে খুব কম সংখ্যক উপাদান নিয়েই জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা গঠন করা সম্ভব হয়। এমনকি, যেক্ষেত্রে স্তরগুলি সদৃশ প্রকৃতির সেক্ষেত্রে অতি অল্প সংখ্যক উপাদান নিয়েই নমুনা তৈরি করা যায় অথচ ফলাফলের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি দেখা যায় না।

(iii) এই পদ্ধতির অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, যেসব বিষয় অগম্য (inaccessible) সেগুলি সুগম বিষয়গুলি দ্বারা প্রতিস্থাপন (replacement) করা সম্ভব হয়।

অপরদিকে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতি জনসমষ্টির স্তরবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোন গলদ থাকলে তা নমুনা গঠনের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযুক্ত হয়।

(ii) স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার সেভাবে ঘটে না। নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার উপর নির্ভর করেই স্তরগুলি গড়ে তোলা হয়। তাই স্তরগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা পরবর্তী সময়ে সমস্যার সৃষ্টি করে।

(iii) স্তরভিত্তিক ভার যুক্ত নমুনাকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ভার আরোপ করা হয় তা কম বা বেশী হলে নমুনাটির আদর্শমান বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

3. তন্ত্রগত নমুনাকরণ (Systematic sampling) :

তন্ত্রগত নমুনাকরণ প্রকৃতপক্ষে সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণের একটি অন্য সংস্করণ বা ধরন। এই

পদ্ধতিতে জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত বিষয় বা উপাদানগুলি প্রথমে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে প্রতিটি উপাদানই তালিকায় সঠিকভাবে বিন্যস্ত থাকে। ভোটার তালিকা, টেলিফোন ডাইরেক্টরী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে ধরা যাক, 500টি উপাদান বিশিষ্ট জনসমষ্টি থেকে 50টির একটি নমুনা গঠন করতে হবে। এক্ষেত্রে 1থেকে 10 পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আমরা যেকোন একটি সংখ্যা নিরপেক্ষভাবে বেছে নিতে পারি। ধরা যাক্ সংখ্যাটি হল 6 তাহলে তালিকার 6,16,26.36.....486,496 অবস্থানের উপাদানগুলি নিয়ে নমুনাটি গঠন করা হবে, এভাবে নমুনা গঠন করার পদ্ধতিটিই হল তন্ত্রগত নমুনাকরণ।

এই পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট হল যে নমুনার উপাদানগুলি একটি অনুক্রম (sequcnce) অনুসারে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি নির্বাচিত উপাদানের মধ্যে সমান অন্তর বর্তমান থাকে। তবে তালিকায় উপাদানুগুলির অবস্থানের উপরই নমুনার নির্ভরযোগ্যতা মূলত: নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল নিম্নরুপ:

(i) নমুনা তৈরি করা সহজ ;

(ii) কালান্তিক উপাদান সম্বলিত জনসমষ্টি ব্যতিরেকে এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরি বলে গন্য হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—

(i) নমুনার উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক দুটি উপাদানের মধ্যে পার্থক্য যদি খুব বেশী হয় তাহলে নমুনার কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই খুব বড় জনসমষ্টি থেকে ছোট নমুনা তৈরী করার ক্ষেত্রে উপযোগী নয়।

(ii) জনসমষ্টির মধ্যে একাধিক স্তরের উপস্থিতি থাকলে ত্রুটি বা বিচ্যুতি পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কাজেই এরূপক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি উপযোগী বলে বিবেচিত হয় না।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল নিম্নরুপ:

(i) যদি জনসমষ্টির উপাদানগুলির তালিকায় সাজানোর ভিত্তি কালান্তিক হয় তাহলে নমুনা সুস্থিত না হয়ে পরিবর্তনশীল হয়। ফলে নমুনা জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না।

(ii) যেক্ষেত্রে জনসমষ্টির উপর স্তরবিন্যাসের প্রভাব থাকে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে নমুনা তৈরী করা হলে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(iii) তালিকা থেকে নমুনার উপাদানগুলি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্বাচন করা হয়। এরূপ প্রতিটি উপাদানের মধ্যে পার্থক্য বা অন্তর যদি খুব বেশী হয় তাহলে নমুনাটিকে আদর্শ নমুনা বলা যায় না।

(4) গুচ্ছ নমুনাকরণ (cluster sampling) :

গুচ্ছ নমুনাকরণকে বহুস্তর নমুনাকরণও বলা হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে নমুনা অনেকগুলি স্তর বা ধাপের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে। যখন বিশাল জনসমষ্টি (population) থেকে নমুনা নির্বাচনে এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। সাধারণত: তিনটি বা চারটি ধাপে বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনাটি তৈরি

করা হয়। প্রথম ধাপে প্রথম শ্রেণীর উপাদানগুলি নির্বাচন করা হয় এবং দ্বিতীয় ধাপে এই উপাদানগুলির উপবিভাগ তৈরি করা হয় এবং তৃতীয় ধাপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর উপাদানগুলি নিয়ে নমুনা তৈরি করা হয়।

এই পদ্ধতিটি আনুপাতিকভাবে অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা জটিল। একটি উদাহরণের মাধ্যমে পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করলে বোঝার সুবিধা হয়। ধরা যাক্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে যুক্ত রয়েছে এরূপ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের থেকে একটি 100 জনের নমুনা নির্বাচন করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তালিকায় 100টি পৃষ্ঠা রয়েছে এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় 20 জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নাম তাঁদের নামের আদ্যক্ষর (alphabetically) অনুযায়ী সাজানো রয়েছে। এমত অবস্থায় 100টি পৃষ্ঠা থেকে নিরপেক্ষভাবে 20টি পৃষ্ঠা প্রথমে নির্বচন করা হয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপে প্রতি পৃষ্ঠা থেকে নিরপেক্ষভাবে 5টি নাম নির্বাচন করা হয়। সুতরাং 100টি পৃষ্ঠা থেকে 20টি পৃষ্ঠা নির্বাচন করার জন্য 1থেকে 5 এর মধ্যে যে কোনো একটি সংখ্যা নির্বাচন করতে হয়। মনে করা হল সংখ্যাটি 4, তাহলে নির্বাচিত পৃষ্ঠাগুলি হবে 4,8,12,16.....96 ও 100। এরপর নির্বাচিত প্রতিটি পাতা থেকে নিরপেক্ষভাবে 5টি নাম বেছে নেওয়া হলে 100টির একটি নমুনা তৈরি হবে। সুতরাং এই পদ্ধতিটি প্রকৃতপক্ষে তন্ত্র নমুনাকরণ পদ্ধতি (systemtic sampling) ও সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণ (simple random sampling) -এর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

তবে এই পদ্ধতির ব্যবহার খুব বেশী হয় না। কারণ পদ্ধতিটি ব্যয়সাপেক্ষ এবং নমুনাকরণ-বহির্ভূত ত্রুটির (non-sampling error) উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা জটিল।

(2) সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতিসমূহ (Non-probability sampling methods) :

সম্ভাবনাযুক্ত নমুনাকরণ পদ্ধতি (Probability sampling method) সম্বন্ধে জানার সাথে সাথে আমাদের সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি (Non-probability sampling method) সম্বন্ধেও ধারণা গড়ে তোলা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে যে নমুনাকরণ পদ্ধতিতে বৃহৎ জনসমষ্টি (propulation) প্রতিটি উপাদানের নমুনায় নির্বাচন হওয়ার সমান সম্ভাবনা থাকে না সেই পদ্ধতিকেই সাধারণভাবে সম্ভাবনাহীন নমুনাকরণ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে নমুনার উপাদানগুলি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয় না। অন্যভাবে বলা যায় যে নমুনা গঠনের ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া আংশিক পছন্দ-ভিত্তিক অর্থাৎ নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত মতামত ও পছন্দ-অপছন্দের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো উপাদানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি সম্ভাবনার উপর যতটা না নির্ভর করে তার চেয়ে নির্বাচনকারীর ব্যক্তিগত বিচারবোধ ও সুবিধা-অসুবিধার উপর বেশী নির্ভর করে। এরূপ নমুনাকরণ পদ্ধতিকে **তিনটি** ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হল—

(i) বিচারভিত্তিক বা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনাকরণ (Judgement or purposive sampling);

(ii) সুবিধাজনক নমুনাকরণ (Convenience sampling); এবং

(iii) অংশ নমুনাকরণ (Quota sampling)।

(iv) দুটি তথ্যের কখনোই একই সংকেত হতে পারবে না।

গবেষণার তথ্যের সংকেতায়নের ক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রক্রিয়া দেখা যায়। এগুলি হল—প্রাক্ সংকেতায়ন, পরবর্তী সংকেতায়ন ও প্রান্ত সংকেতায়ন।

(ii) তথ্য প্রবেশন (Data entry): তথ্য কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই গবেষণার কাজ শেষ হয় না। সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এই বিশ্লেষণের জন্য তথ্যগুলিকে বর্গীকরণ বা শ্রেণিকরণ করে সুবিন্যস্ত করতে হয়।

প্রথাগত পদ্ধতিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে তথ্য সংকেতায়ন করে সংকেতপত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে পরিগণক বা কম্পিউটার-এর সাহায্যে এই কাজটি করা হয়। কারণ তাহলে অনেক দ্রুততার সাথে ও অনেক নির্ভুলভাবে তথ্য বিশ্লেষণের কাজ করা সম্বন্ধ হয়। তাই বর্তমানে সংকেতপত্র থেকে তথ্যাবলী কম্পিউটার ফাইলে দাখিল করা হয়। এই সংকেতপত্রে কম্পিউটার কার্ডের মতই **আশিটি** স্তম্ভ থাকে। সংকেতকারক তথ্যসংকেত নির্দিষ্ট স্তম্ভে লিখে রাখে অবশ্য বর্তমানে সংকেতপত্র ছাড়াই এই কাজ করা যায়। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য CAT 1 পদ্ধতিতে সরাসরি কম্পিউটার প্রবেশ করানো যায়। বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে অতিদ্রুত ও শুদ্ধভাবে সংকেত ফাইল প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

(iii) সারণী বিন্যাস (Tabulation): তথ্য গণনা বলতে বোঝায় বিভিন্ন শ্রেণি বা বর্গে কতগুলি তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয় তা গণনা করা। তবে তথ্য গণনার কাজ শুরু করার আগেই তথ্য বিশ্লেষণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হয়। এই গণনার কাজে মেশিনের সাহায্যও নেওয়া যাতে পারে। তবে তথ্যগণনার ক্ষেত্রে মেশিনের সাহায্য সাধারণত নেওয়া হয় যখন তথ্যের পরিমাণ অনেক বেশী হয় এবং যেখানে আড়াআড়ি সারণী বিন্যাস (Cross tabulation) করা হয়।

(iv) তথ্য বিশ্লেষণ (Data analysis): গবেষণার ক্ষেত্রে এটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা বলা যায় গবেষণার মূল কাজ। এর আগে পর্যন্ত যেসব কাজ করা হয়েছে সেগুলি সবই আনুষঙ্গিক কাজ বা বলা যায় গবেষণার ভিত তৈরীর কাজ। তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণার ফলাফল পাওয়া যায়। তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যবহার খুব বেশী পরিমাণে হয়। পরিসংখ্যাণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্যগুলির বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক পরিমাপ করা হয়। যেমন, তথ্যগুলির যৌগিক গড় (A.M.), গুণোত্তর গড় (H.M.), সম্যক পার্থক্য (S.D.), বিচ্যুতি (variation), সহ সম্পর্ক বা সহগমন (correlation) প্রতিগমন (regression) ইত্যাদি। আবার প্রাপ্ত ফলের তাৎপর্যও (significant) পরিমাণ করা হয়। এসব পরিমাপ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও গবেষণার বিষয় বা উদ্দেশ্যের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুতরাং তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া কতকগুলি সম্পর্কযুক্ত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রায়। এগুলি হল—

(a) অবিন্যস্ত তথ্য বা উপাত্তগুলিতে কতকগুলি বর্গে বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা।

(b) উল্লিখিত শ্রেণিগুলিকে সংকেতায়িত করা ও সারণী-বিন্যাস করা।

(iii) তথ্যগুলির মধ্যে সমরূপতা (Uniformity) রয়েছে কিনা তা যাচাই করা কারণ তথ্যের মধ্যে সমরূপতা না থাকলে তথ্য বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করতে অসুবিধা হয়।

সুতরাং সম্পাদনার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিকৃত করা যায়—

(i) তথ্যের নির্ভুলতা বা সঠিকতা ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান।

(ii) অন্যান্য তথ্যের সাথে প্রাসঙ্গিকতা স্থাপন করা।

(iii) সংগৃহীত সমস্ত তথ্য সমরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ-ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া।

(iv) তথ্যের মধ্যে কোনো অসম্পূর্ণতা নেই এ-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

(v) তথ্যের সন্নিবেশকরণ যেন সংকেতায়ন (Coding) ও গণনার (Tabulation) উপযোগী হয়।

(2) তথ্যবলীর সঙ্কোচন, সংক্ষেপায়ন ও ব্যবহাররোপ যোগ্যতা (Briefing and making useable the data collected) :

তথ্যবলী সম্পাদনার পর তথ্যাবলীর সংক্ষেপায়ন শুরু হয়। বস্তুত: সংগৃহীত বিপুল তথ্যাবলী গবেষকের কাছে ভীতির কারণ হয়ে ওঠে। এই বিশাল তথ্য প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা খুব সহজ কাজ নয়। তাই এদের সংক্ষিপ্ত করতেই হয়। এই সংক্ষেপায়নের কাজ সবসময় হাতে করা সম্ভব হয় না বলে বর্তমানে পরিগণনা বা কম্পিউটারের সাহায্যে নেওয়া হয়। পরিগণকের মাধ্যমে এই কাজ করতে হলে সংকেতায়ন আবশ্যিক। কারণ সংকেতায়নের মাধ্যমে তথ্যগুলিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও অবিন্যস্ত তথ্যগুলি কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সংক্ষেপ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন তালিকায় তথ্যগুলিকে সাজানো হয় এবং টেবিলে সন্নিবেশিত করা হয়। এর ফলে অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সুবিন্যস্তরূপ পায় এবং সেগুলি ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। এছাড়াও এভাবে তথ্যগুলিকে সংগঠিত করার ফলে পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করাও সহজ হয়। এই কাজ প্রধানত: তিনটি পর্যায়ে সম্পাদিত হয়। এগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(i) সংকেতায়ন (Coding) : সংকেতায়ন হল সংগৃহীত তথ্যের কোনো সংখ্যা সংকেত বা মান দেওয়ার প্রক্রিয়া যাতে উপযুক্ত শ্রেণিতে সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। মেশিনের মাধ্যমে যখন তথ্য গণনা বা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা হয় তখন সংকেতায়নের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বস্তুত: তথ্যের সাংকেতিক ভাষা তৈরী করা সংকেতায়ন নামে অভিহিত হয়। সংকেতায়ন করার জন্য চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। এগুলি হল—

(i) গবেষণার সমস্যা ও উদ্দেশ্যের উপযুক্ত হতে হবে;

(ii) একটি শ্রেণিবিভাজন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে;

(iii) বহু তথ্য-সংকেত অন্তর্ভুক্ত করার মত ব্যাপ্তি থাকতে হবে; এবং

হিসাবে গণ্য হয়। আরো বেশী নিবিড় সমীক্ষণের মাধ্যমে নির্দেশকগুলি চিহ্নিত করে এই ব্যতিক্রমী এককদের শ্রেণিভুক্ত করতে হয়।

4. সব তথ্যের সংকেতায়ন করা: সব তথ্যকেই নির্দেশক অনুসারে শ্রেণিবদ্ধ ও সংকেতায়িত করতে হয়, এপ্রসঙ্গে নিউম্যান (Neuman) তিন ধরনের শ্রেণিবিভাজনের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল— (i) অবাধ শ্রেণি বিভাজন, (ii) অক্ষীয় শ্রেণিবিভাজন ও (iii) নির্বাচিত শ্রেণিবিভাজন।

(i) অবাধ শ্রেণিবিভাজন (Open Coding): সংকলিত তথ্যাবলীর বা তথ্যায়নের প্রথম পাঠে এই সংকেতায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে তথ্যের বিভিন্ন উৎসগুলিকে সতর্ক নিরীক্ষণের মাধ্যমে মূল ঘটনা, বিষয় ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে সংকেতায়ন করা হয়।

(ii) অক্ষীয় শ্রেণিবিভাজন (Axial Coding): তথ্যাবলীর দ্বিতায় পাঠে এই শ্রেণিবিভাজন করা হয়। এক্ষেত্রে সংকেতায়ন সরাসরি তথ্যের সাথে সম্পর্কীত থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক ধারণা থেকে বিমূর্ত ধারণায়, প্রাথমিক শ্রেণি থেকে সংযুক্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটে। এরূপ শ্রেণিবিভাজন প্রাথমিক শ্রেণিবিভাজনের সহায়ক হয় এবং প্রাথমিক শ্রেণিবিভাগকে আরো বেশী স্পষ্ট বিমূর্ত করে।

(iii) নির্বাচিত শ্রেণিবিভাজন (Selective Coding): এটি সংগৃহীত তথ্যাবলীর চরম বা শেষ পর্যায়। এক্ষেত্রে আগের সংকেতায়ন সূত্রে গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রধান বিষয় চিহ্নিত করে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট শ্রেণিগুলির তথ্যাবলী বিশদভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

তথ্য বিশ্লেষণ (Data Analysis) :

গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমেই গবেষণার ফলাফলের উদ্ভুত হয়। এই কাজ মূলত: তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হয়। এগুলি হল—

(1) তথ্যবলীর সম্পাদনা ও সংক্ষিপ্ত

(2) বিশাল তথ্যভাণ্ডারকে সঙ্কুচিত ও সংক্ষিপ্ত করে ব্যবহারযোগ্য করা এবং

(3) পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ করা। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(1) তথ্যবলীর সম্পাদনা (Editing) : তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার প্রথম কাজটি হল সংগৃহীত অবিন্যস্ত তথ্যগুলি সম্পাদনা করা। সম্পাদনার উদ্দেশ্য হল তথ্যের ভুল-ভ্রান্তিগুলি চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় সংশোদন ঘটানো। এটি একটি নিয়মমাফিক কাজ হলেও বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সাথে এই কাজ করতে হয়। সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব কাজ করতে হয় সেগুলি হল:

(i) তথ্যের সম্পূর্ণতা যাচাই করা এবং তথ্যের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকলে তা দূর করা।

(ii) তথ্যের সঠিকতা বা নির্ভুলতা যাচাই করা এবং কোনো অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা দূর করা।

(iii) ভ্রান্ত নিশ্চয়তাবোধ: এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল নিজ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গবেষকের ভ্রান্ত নিশ্চয়তার ধারণা।

(iv) সামান্যীকরণের (Generalisation) অসুবিধা: একক-বিশেষ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যকে সামান্যীকরণ করা যায় না কারণ প্রতিটি একক-বিশেষ স্বতন্ত্র।

(v) নির্ভরযোগ্যতা ও সিদ্ধতা: একক-বিশেষ সমীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ অন্য কোনো গবেষক একই একক বিষয়ের উপর সমীক্ষা চালালেও সমরূপ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয় না।

2. (চ) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ (Date Processing and Anslysis) :

তথ্য কেবলমাত্র সংগ্রহ করলেই হয় না, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করা দরকার। এজন্য প্রথমে তথগুলিকে সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত করা দরকার। কারণ সংগৃহীত তথ্যগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকলে সেগুলি বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। তথ্য সুবিন্যস্তকরণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—তথ্যের প্রকৃতি এবং গবেষণার উদ্দেশ্য। তাই গুণবাচক তথ্যনির্ভর ক্ষেত্র গবেষণার এবং পরিমাণগত তথ্যনির্ভর নিরীক্ষণমূলক গবেষণায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ আলাদা ধরনের হয়।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing) :

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বলতে বোঝায় সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্লেষণের উপযোগী করে তোলা। কারণ সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রথম পর্যায়ে অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে বলে সেগুলি বিশ্লেষণ করতে অসুবিধা হয়। তাই অবিন্যস্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ উপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রথমে সুবিন্যস্ত এবং সংক্ষিপ্ত করা হয়। আর এই কাজটি করা হয় তথ্যগুলিকে ধারণা ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীকরণ বা বর্গীকরণের (classification) মাধ্যমে। বর্গীকরণ করার প্রক্রিয়া হল গুণবাচক সংকেতায়ণ (qualitative coding)। গুণবাচক সংকেতায়ণ প্রকৃতপক্ষে গুণবাচক বর্গীকরণ। এই কাজের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল নিম্নরূপ:

1. **তথ্যাবলী থেকে কি চাওয়া হচ্ছে তা স্পষ্ট করা:** সংগৃহীত তথ্যগুলি গবেষণার উদ্দেশ্যের নিরিখে বর্গীকরণ করা প্রয়োজন। কারণ তথ্যগুলিকে যেকোনোভাবে বর্গীকরণ করলেই চলে না। উদ্দেশ্যমুখী বিশ্লেষণ করার উপযোগীরূপে বর্গীকরণ করতে হয়।

2. **শ্রেণি বিভাজনের নির্দেশকসমূহ নির্দিষ্ট করে শ্রেণিবিভাজন করা:** তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নমালাগুলি ভালভাবে পাঠ করলে শ্রেণিবদ্ধকরণের একটি সাধারণ ধারণা জন্মায়। অনেক সময় গবেষণার শুর থেকেই শ্রেণি বিভাজনের একটি ধারণা গড়ে উঠে। বস্তুত শ্রেণিবিভাজনের নির্দেশকগুলি প্রথমে বেছে নিয়ে শ্রেণিবিভাজন তৈরী করাই সাধারণ নিয়ম।

3. **শ্রেণিগুলিকে তথ্যানুগ করা:** প্রাথমিকভাবে নির্দেশকগুলিকে চিহ্নিত করে তথ্যগুলি শ্রেণিবদ্ধ করতে হয়। তবে কিছু তথ্য থাকে যেগুলি কোনো শ্রেণির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় না। এগুলি ব্যতিক্রমী একক

(iv) তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া (Data collection process): গবেষণার একক নির্ধারণের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল তথ্য সংগ্রহ। গবেষণা নক্শায় তথ্যসূত্রের ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার উল্লেখ করতে হয়।

(v) তথ্যের সাথে প্রস্তাবনার সম্পর্ক স্থাপন (Linking data with proposition): এটিই হল একক-বিশেষ গবেষণার অন্তিম স্তর। সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে গুণবাচক সংকেতায়নের (Qualitative Coding) মাধ্যমে কতকগুলি বিশেষ ধরন (pattern) নির্দেশ করা হয় এই স্তরে।

একক-বিশেষ সমীক্ষার সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and disadvantages of case study): একক-বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি প্রয়োগ করে গবেষণায় কতকগুলি বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতিটি অসুবিধা থেকেও মুক্ত নয়। নিচে এ-সংক্রান্ত আলোচনা তুলে ধরা হল।

সুবিধাগত দিক (Advantages) :

(i) পদ্ধতিগত নমনীয়তা: এক্ষেত্রে গবেষক পদ্ধতিগত বাঁধা-ধরা নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। সমীক্ষণের প্রয়োজনে গবেষক যেকোনো পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। পর্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত ও বহুজন নথি পর্যালোচনা ইত্যাদি পদ্ধতি তথ্য সংগ্রাহক বা গবেষক প্রয়োজনমত অনুসরণ করতে পারে।

(ii) স্বাভাবিক পরিবেশে সমীক্ষণ: গবেষণার একককে স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে সমীক্ষণ করা হয় বলে এই পদ্ধতিতে স্বত:স্ফুর্ত ও যথাযথ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

(iii) নিবিড় সমীক্ষণ: মনে করা হয় যে মাত্র একটি এককের নিবিড় সমীক্ষণের মাধ্যমে গবেষক কোনো গবেষণামূলক প্রশ্ন সম্বন্ধে সুগভীর ও বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও মূল প্রশ্নের আনুষঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরও এর মাধ্যমে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(iv) প্রকল্প নির্মাণ: একক-বিশেষ সমীক্ষা পরবর্তী কোনো গবেষণার পরিচায়ক সংবাদ উপস্থাপনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি অন্বেষণমূলক গবেষণার ভূমিকা গ্রহণ করে পরবর্তী গবেষণার প্রশ্ন প্রকল্প তৈরীতে সাহায্য করে।

(v) তত্ত্ব যাচাইকরণ: একক-বিশেষ সমীক্ষার প্রাপ্ত তথ্য প্রচলিত কোন তত্ত্বের সত্যায়ন, পরিবর্তন বা পরিশীলন করতে সাহায্য করে।

অসুবিধাজনক দিগ (Disadvantages):

(i) ব্যয়সাপেক্ষ: এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাপেক্ষ। এছাড়াও তথ্য বিশ্লেষণে প্রচুর সময় লাগে।

(ii) বিষয়গত পক্ষপাত: এই পদ্ধতিতে ব্যক্তি-গবেষক বা তথ্যসংগ্রহকারীকে কোনো বাধা-ধরা নিয়ম মেনে কাজ করতে হয় না বলে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রভাব ও পক্ষপাত কাজ করে। অর্থাৎ পদ্ধতিটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়।

(i) অন্তর্নির্বিষ্ট সমীক্ষা (Intrinsic case study): এই ধরনের সমীক্ষায় গবেষক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একক বিশেষকে কোনো তত্ত্ব নির্মাণ ছাড়াই সম্পূর্ণভাবে জানতে চায়। যেমন, কোন শিশু, রোগী, অপরাধী বা প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত দিকগুলি সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য যখন সমীক্ষা চালানো হয় তখন তাকে অন্তর্নির্বিষ্ট সমীক্ষা বলে।

(ii) উপায়মূলক সমীক্ষা (Instrumental case sutdy): এই ধরনের একক-বিশেষের বৈশিষ্ট্যগত দিকের বিশদ ও নিবিড় সমীক্ষরণ করা হয় পরবর্তী কোনো গবেষণার পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য বা কোনো তত্ত্বকে আরও পরিশীলিত (refinement) করার জন্য।

(iii) একক-সমষ্টির সমীক্ষা (Collective case studies): এই ধরনের সমীক্ষার একাধিক একক-বিশেষ পরম্পরাক্রমে সমীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এরূপক্ষেত্রে পূর্ব একক থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী এককের সমীক্ষণ দ্বারা সমর্থিত বা অসমর্থিত হয়। একক-সমষ্টি সমীক্ষণ কোনো ঘটনা বা সমস্যার তত্ত্ব গঠনে সহায়ক হয়।

(iv) নিয়ন্ত্রিত তুলনামূলক একক-বিশেষ সমীক্ষা (Disciplined–comparative case study): কোনো তত্ত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে এরূপ সমীক্ষার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। এধরনের সমীক্ষা থেকে সংগৃহীত তথ্য কোনো প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে সত্যায়িত বা অপ্রমাণিত করতে পারে। যেমন অপরাধসংক্রান্ত একটি ধারমা বা তত্ত্ব হল—অসামাজিক সংসর্গ অপরাধ প্রবণতার জন্ম দয়ে। এই ধারমা বা তত্ত্বটি একক-বিশেষ সমীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা যায়। একক-বিশেষ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে ঐ তত্ত্ব বা ধারণাটি সিদ্ধ হলে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বা ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধ না হলে সেটির পরিবর্তন বা পরিমার্জন নির্দেশ করে।

একক বিশেষ সমীক্ষার নক্শা (Desing of Case Study): একক বিশেষ সমীক্ষা গবেষণার তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসাবে গণ্য হয়। তাই এর নক্শায় কয়েকটি বিশেষ দিকে উল্লেখ করা হয়। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

(i) প্রশ্ন গঠন (setting of questions): অন্যান্য পদ্ধতির মত এখানেও প্রথমে গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করতে হয়। এই প্রশ্নগুলি কে, কি, কেন, কখন, কিভাবে ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে।

(ii) সম্বন্ধসূচক প্রস্তাবনা (Relational propositions): এক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়কে কোনো বিশেষ দিকের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ প্রস্তাব করা যেতে পারে যে বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর দক্ষতা ও শিক্ষকদের সহযোগিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের সহায়ক।

(iii) গবেষণার একক নির্ধারণ (Deciding units of research): গবেষণার বিষয় বা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণামূলক প্রশ্নসাপেক্ষ গবেষণার একক নির্ধারণ করা হয়। গবেষণার বিষয়-ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রশ্ন যদি হয় সহযোগী শিক্ষকদের ভূমিকা তাহলে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের একক হয় সহযোগী শিক্ষক। আবার পাঠদান পদ্ধতির ভূমিকা যদি গবেষণামূলক প্রশ্ন হয় তাহলে গবেষণার একক হয় পাঠদান পদ্ধতি বা রীতি।

(5) প্রশ্নমালার প্রাক্‌পরীক্ষণ (Pretesting of questionnaire) : প্রশ্নমালা গঠনের শেষ পর্যায় হল প্রাক্ পরীক্ষণ, প্রশ্নমালা তৈরী করার সময় প্রথমে একটি খসড়া প্রশ্নমালা তৈরি করতে হয়। এরপর এই খসড়া প্রশ্নমালার মাধ্যমে অল্প কয়েকজন উত্তরদাতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে প্রশ্নমালার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন করা হয়। এই উত্তরদাতারা মূলপর্বের উত্তরদাতা নাও হতে পারে। বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী বা সহকর্মীদের নিয়ে এই পরীক্ষাপর্ব চালানো যেতে পারে। তবে এরূপ পরীক্ষা সর্বত্র চালানো যায় না, অর্থাৎ প্রাক্ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন অবিবাহিত সদস্যদের উপর পরিবার পকিরল্পনা কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রশ্নমালা পরীক্ষা করা যায় না। প্রাক্ পরীক্ষণকালে উত্তরদাতাদের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নমালাটি পরিমার্জিত করা হয়। যেমন উত্তরদাতারা যদি খসড়া প্রশ্নমালার কোনো প্রশ্নকে অর্থহীন বলে মনে করে তাহলে ঐ প্রশ্ন প্রশ্নমালা থেকে বাদ দেওয়াই বিধেয়। এছাড়াও উত্তরদাতারা বিভিন্ন প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর দিচ্ছে তার উপরও প্রশ্নমালার চূড়ান্তকরণ নির্ভর করে। যেমন উত্তরদাতাদের উত্তর যদি "জানি না", "প্রযোজ্য নয়", "কোনো উত্তর নেই" বা "উত্তর দিতে সমর্থ নেই" ইত্যাদি ধরনের বা সমধর্মী বা নিয়ন্ত্রিত উত্তর হয় তাহলে প্রশ্নগুলির ত্রুটি বা অসুবিধানজক দিকগুলি জেনে নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হয়। এইভাবে প্রাক্ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে গবেষণার মূলপর্বে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। **মোজার** (Moser) ও **কালটন** (Kalton)-এর মতে প্রশ্নমালার উপযুক্ততা বিচারের ক্ষেত্রে প্রাক্ পরীক্ষণ একটি আদর্শ প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হয়।

4. একক বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি (Case Study Method) :

গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ এককদের পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকার স্বীকৃত পন্থা হিসাবে গৃহীত হলেও গবেষণা সংশ্লিষ্ট একক-বিশেষত্ত (Case study) তথ্য সংগ্রহের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। মনোসমীক্ষণ ও রোগ নিরূপণ প্রক্রিয়ায় এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও পরিমাণবাচক গবেষণায় এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী না হলেও গুণবাচক গবেষণায়, বিশেষত: জীবনীমূলক গবেষণায় (Biographical research) এই পদ্ধতি উপযোগী বলে গণ্য হয়।

একক বিশেষ সমীক্ষা হল তথ্য সংগ্রহের এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা কোনো এককের নিবিড় পর্যালোচন করে কোনো ঘটনার উপাদান, কারণ, ইত্যাদি সম্পর্কীত সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যাবলী সংগ্রহ করা যায়। এই এককগুলি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ ক্রমে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অর্থাৎ এককগুলি ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, জেলা, জনসমষ্টি ইত্যাদি হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পটভূমিতে (inthe context of natural history) তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। এভাবে সংগৃহীত তথ্য একক-বিশেষের সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ এবং নিবিড় তথ্যচিত্র উপস্থাপনা করে।

একক বিশেষ সমীক্ষার বিভিন্ন ধরণ (Types of Case Study) : একক বিশেষ সমীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধরন হল নিম্নরূপ:

হবে। এই স্তরে কোনো স্পর্শকাতার প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী স্তরের প্রশ্নাবলীর সহায়ক তথ্য জ্ঞাপক প্রশ্ন এ স্তরে থাকা প্রয়োজন। এরপর মধ্যভাগে সাধারণ বিষয়ের প্রশ্নগুলি করতে হয় ও যুক্তিবোধ্য ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এছাড়াও একই বিষয়ের প্রশ্নগুলি একসাথে সন্নিবেশিত করা দরকার এবং প্রশ্নগুলির পূর্বাপর সম্পর্ক দেখা দরকার। প্রশ্নমালার একেবারে শেষের দিকে স্পর্শকাতর বিষয়ের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ প্রশ্নমালার শেষদিকে এধরনের প্রশ্ন থাকলে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

(3) প্রশ্নের শব্দচয়ন ও ব্যাপ্তি (Selection of word and length of question): প্রশ্নে শব্দের ব্যবহার উত্তরপ্রাপ্তিকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। প্রশ্নের প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও যথাযথ হওয়া দরকার। প্রশ্নমালায় প্রশ্ন দেখার একটি সাধারণ সূত্র হল কম কথায় প্রত্যাশিত বিষয়টি প্রকাশ করা। যেক্ষেত্রে একটি শব্দই যথাযথ অর্থ প্রকাশ করতে সমর্থ সেক্ষেত্রে একাধিক শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। দীর্ঘ প্রশ্ন উত্তরদাতার বেশী সময় নষ্ট করে বলে তার উত্তর দেওয়ার আগ্রহ কমে যায়। এছাড়া প্রশ্ন বোঝার ক্ষেত্রেও অসুবিধা দেখা দেয়। ডাকে পাঠানো প্রশ্নমালার ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা বেশী হয়। প্রশ্নের শব্দ চয়নে আর একটি বিবেচনার দিক হল শব্দের যথার্থ মান নির্ণয় করা। শিক্ষিত উত্তরদাতাদের জন্য নির্মিত প্রশ্নমালায় যে শব্দ ব্যবহার করা যায় অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত উত্তরদাতাদের জন্য লিখিত প্রশ্নমালার প্রশ্নে একই শব্দ ব্যবহার করা যায় না, প্রশ্ন তৈরীর সময় গবেষককে অবশ্যই উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাথায় রাখতে হবে। আবার প্রশ্নে কথ্য শব্দ সীমিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে কথা কথ্য শব্দ ব্যবহার করা গেলেও সাধারণ ক্ষেত্রে কথ্য শব্দের প্রয়োগ ঘটে না। সবশেষে শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে দেখতে হবে যে প্রশ্নের শব্দ স্পষ্ট, অর্থবহ ও দ্ব্যর্থহীন।

(4) প্রশ্নমালার সার্বিক আকার (Overall format of questionnaire) : প্রশ্নমালার বিষয়দফা, তাদের ক্রমবিন্যাস এবং প্রশ্নের শব্দ নির্বাচনের পর প্রশ্নমালার সার্বিক আকার সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে হয়। **ডেভিড ডুলে** (Devid Dooley) বলেছেন যে দৃশ্যত: প্রশ্নমালা স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং, সহজবোধ্য হওয়া দরকার। এক প্রশ্ন থেকে পরের প্রশ্নে যাওয়া যেন সহজ হয়। প্রতিটি প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা ও পরিচায়ক সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে একসাথে বেশী প্রশ্ন না রেখে প্রশ্নগুলি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা উচিত। এর সুবিধা হল, উত্তরদাতা যে বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই বিভাগের উত্তর দিয়ে থাকে। অযথা সব ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয় না। এছাড়া প্রয়োজনবোধে উত্তরদাতার নাম, তারিখ, পরিচয়জ্ঞাপক সাংকেতিক সংখ্যা ইত্যাদি দেওয়ার মত জায়গা রাখতে হয়। এগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য সাধারণত: প্রশ্নমালার উপরদিকে ডান বা বাম কোনো নির্দিষ্ট জায়গা রাখা হয়। প্রশ্নমালার উপরে থাকে গবেষণা সংস্থা বা গবেষকের পরিচয় ও প্রশ্নমালার উদ্দেশ্য। এছাড়াও মুক্তপ্রান্ত প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করার জন্য যাতে প্রশ্নমালার যথেষ্ট জায়গা থাকে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। বস্তুত: প্রশ্নমালার অবয়বই উত্তরদাতাকে উত্তর দিতে উৎসাহিত করে। যদিও এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই তবুও প্রশ্নমালার আকার ছোটো হলেই ভাল হয়। উত্তরতাদাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রশ্নমালা শেষ হয়।

(vi) এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতার সম্মুখীন হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে উত্তরদাতার বিকৃত তথ্য দেওয়ার সুযোগ থাকে।

প্রশ্নমালা তৈরীর বিচার্য বিষয়সমূহ (Considerations in Questionnaire Design) :

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয় সেটি হল প্রশ্নমালাটি যেন প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ হয়। কারণ গবেষণার ফলাফল প্রশ্নমালার মাধমে সংগৃহীত তথ্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। তাই প্রশ্নমালায় যদি কোনো গলদ থাকে তাহলে গবেষণার উদ্দেশ্যসাধন ব্যহত হয় এবং গবেষক ভুল পথে পরিচালিত হয়। তাই প্রশ্নমালা তৈরী খুবই সতর্কতা ও যত্নের সাথে সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত: প্রশ্নমালা তৈরীর ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলি অবশ্যই বিবেচনা করতে হয়।

1. বিষয়দফা (Items): একটি প্রশ্নে কেবলমাত্র একটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। একটি প্রশ্নে একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলে উত্তরদাতা যেকোনো একটির উত্তর দিয়ে থাকে। ফলে অন্য বিষয়টি বাদ পড়ে। এছাড়াও উত্তরের একটি বিষয় অপর একটি বিষয় থেকে ভিন্ন হওয়া দরকার, যাতে একটি উত্তরের সাথে অপর উত্তরটি জটলা না বাঁধে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, একটি বন্ধ প্রান্ত ও তার উত্তর হল নিম্নরূপ:

তুমি কতদিন অন্তর অসুস্থ হও?

(i) বছরে একবার বা তার কম

(ii) মাসে একবার থেকে চারবার

(iii) সপ্তাহে একবার

(iv) সপ্তাহে একবারের বেশী।

এখানে উত্তরদাতা সপ্তাহে একবার অসুস্থ হলে তার উত্তর হবে (ii) নং বা (ii) নম্বরের যেকোনো একটি। এক্ষেত্রে উত্তরের বিকল্পগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় উত্তরদাতার উত্তর বাছায় অসুবিধা হয়। এছাড়াও কোনো স্পর্শকাতর বিষয় প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। কারণ এধরনের উত্তর বিশেষ পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও তাদের মধ্যে সত্যতা বিশেষ থাকে না বলে নির্ভরযোগ্যতাও থাকে না। যেমন, তুমি কি ঘুষ নাও? এধরনের প্রশ্নের উত্তর শুধু প্রত্যাখ্যাতই হয় না, উত্তরদাতার উত্তর দেওয়ার মানসিকতাকেই নষ্ট করে দেয়। ফলে উত্তরদাতা অসহযোগী হয়ে পড়ে।

(2) প্রশ্নের ক্রমবিন্যাসে (Order of question): প্রশ্নতালিকায় একাধিক প্রশ্ন দেওয়া থাকে। প্রশ্নমালায় প্রশ্নগুলির ক্রমবিন্যাস সুপরিকল্পিতভাবে করা দরকার। প্রশ্নের এই ক্রম উত্তরদাতার প্রত্যাখ্যানের হার এবং উত্তরপ্রাপ্তির হার নির্ধারণ করে থাকে। এ ব্যাপারে **নিউম্যান**-এর (Neuman) পরামার্শ হল প্রশ্নতালিকাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হবে—শুরু, মধ্যভাগ ও শেষভাগ। প্রশ্নতালিকার শুরুতে কেবলমাত্র সেসব প্রশ্নই থাকবে যেগুলি উত্তরদাতার কাছে সহজ, সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, উৎসাহব্যাঞ্জক ও মনোরম বলে মনে

প্রশ্নমালা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits And Demerits of Questionnaire Method):

প্রশ্নমালা পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত ও পছন্দমাফিক পদ্ধতি। তবে এই পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। গেুলি নিচে তুলে ধরা হল।

সুবিধা :

(i) অন্য পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিতে অনেক দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(ii) পরিচালনার দিক থেকে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহকারীদের খুব বেশী দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।

(iii) যেক্ষেত্রে তথ্যসরবরাহকারী অর্থাৎ উত্তরদাতারা বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে উপযোগী বলে গণ্য হয়।

(iv) যেহেতু একই সাথে সকল উত্তরদাতার কাছ থেকেই তথ্য চাওয়া হয় তাই এই পদ্ধতিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটে।

(v) কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হয় যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেয়।

(vi) এইরূপ পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হলে উত্তরদাতারা বাহ্যিক প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকে ফলে নির্ভরযোগ্য, বৈধ ও অর্থবহ তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

(vii) যেহেতু উত্তরদাতারা নিজেরাই তথ্য সরবরাহ করে তাই তথ্যের মৌলিকত্ব বজায় থাকে এবং ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে।

(viii) এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

অসুবিধা :

(i) উত্তরদাতারা উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহী না হওয়ায় অনেক সময়ই সম্পূর্ণ তথ্য পেতে অসুবিধা হয় এবং এর বিরূপ প্রভাব গবেষণার উপর পড়ে।

(ii) উত্তরদাতার অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট ও অপাঠ্য উত্তর সামগ্রিক তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়াকেই অনেকসময় বানচাল করে দেয়।

(iii) গবেষণার বিষয়ের উপর যদি গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী সমীক্ষার প্রয়োজন হয় তাহলে এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয় না।

(iv) এই পদ্ধতির মধ্যে নমনীয়তা খুবই কম। কারণ প্রশ্নমালার প্রশ্ন পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা যায় না। ফলে তথ্যসংগ্রহে অসুবিধা হয়।

(v) প্রশ্নমালা তৈরীর ক্ষেত্রে কোনো গলদ থাকলে তা পুরো গবেষণা প্রক্রিয়াকেই বানচাল করে দেয়।

হলে ঐ প্রশ্নের ছাঁচ প্রশ্ন বলে। সাধারণত পর্যবেক্ষণের একক (Units of observation) প্রকৃত আলোচনার একক (final unit of analysis) থেকে পৃথক হলে এধরনের প্রশ্নতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন গুচ্ছ নমুনাচয়ন প্রক্রিয়ায় (cluster sampling) কোনো পরিবার প্রধান পর্যবেক্ষণ একক হলেও প্রকৃত পর্যবেক্ষণের একক হয় পরিবারের সদস্যরা। এক্ষেত্রে পরিবারের কর্তাকেই প্রশ্ন করে পরিবারের সকল সদস্যদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং প্রতিটি সদস্যসংক্রান্ত তথ্যাবলী একসাথে একটি ছাঁচে লিপিবদ্ধ করা হয়।

(vi) মুক্তপ্রান্ত ও বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নাবলী (open-ended and closed-ended questions): প্রশ্নমালায় দু'ধরনের প্রশ্ন থাকে—মুক্তপ্রান্ত ও বদ্ধপ্রান্ত। মুক্ত প্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনও উত্তর দেওয়া থাকে না। যেমন, দূরদর্শনের কোন্ অনুষ্ঠান তুমি দেখতে ভালবাস? তোমার জীবনের লক্ষ্য কি? এধরনের প্রশ্ন মুক্তপ্রাপ্ত প্রশ্নের উদাহরণ। গবেষণায় যখন উত্তরদাতার স্বাভাবিক ও স্বত:স্ফূর্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয় তখন মুক্তপ্রান্ত প্রশ্নের ব্যবহার ঘটে।

পক্ষান্তরে বদ্ধপ্রান্ত প্রশ্নের একাধিক উত্তরের ইঙ্গিত দেওয়া থাকে যেগুলির মধ্য থেকে একটি উত্তর উত্তরদাতাকে পছন্দ করতে হয়। বৃহদাকার সমীক্ষা ও পরিমাপবাচক গবেষণায় এধরণের প্রশ্নের ব্যবহার বেশী ঘটে। এরূপ প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণায় শ্রম, সময় ও অর্থের সাশ্রয় ঘটে। এছাড়া পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে উত্তর বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। অবশ্য এধরনের প্রশ্ন গঠনের ক্ষেত্রে কিছু বিতর্ক দেখা দেয়। যেমন—প্রশ্নের কতগুলি উত্তর দেওয়া হবে? নিরপেক্ষ পছন্দের উত্তর থাকবে কিনা? পছন্দের উত্তরের ক্রমবিন্যাস কিরূপ হবে? ইত্যাদি। বাস্তবক্ষেত্রে পছন্দের উত্তর দুটি বিকল্প হতে পারে, যেমন—'হাঁ বা না' অথবা 'মানি (agree) বা মানি না (disagree)' আবার বহু বিকল্পও হতে পারে, যেমন—'উদারনীতি অর্থনৈতিক প্রগতির' বাহক এই বক্তব্য সম্পর্ক তোমার অভিমত কি? এই প্রশ্নের বহু বিকল্প উত্তরগুলি হল—সঠিক, আংশিক সঠিক, জানি না, আংশিক ভুল ও সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত: দুই বিকল্প উত্তর সম্বলিত প্রশ্ন প্রশ্নমালায় কম থাকে কারণ এরূপ প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে উত্তরদাতার পছন্দের স্বাধীনতা থাকে না। ফলে গবেষকের পক্ষপাতযুক্ত উত্তর দিতে বাধ্য হয়। তবে অল্পশিক্ষিত উত্তর দাতাদের ক্ষেত্রে এরূপপ্রশ্ন ব্যবহার করা সুবিধাজনক হয়। তবে বিশেষ তথ্য সংগ্রহের জন্য বেশি বিকল্প উত্তরই প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ উত্তরদাতা চিন্তাভাবনার অবকাশ পেয়ে থাকে। কিন্তু অতি বেশি বিকল্প বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। আবার এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে মধ্যপদে নিরপেক্ষ মত অন্তর্ভুক্ত করাও বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই নিরপেক্ষ উত্তরের বিপক্ষে বলা যায় যে, উত্তরদাতা প্রকৃতপক্ষে ভিন্নধর্মী উত্তর দিতে চাইলেও অন্য বিকল্প না থাকায় ঐ নিরপেক্ষ উত্তর পছন্দ করতে বাধ্য হয়। আবার অনেকসময় উত্তরদাতার কোনো উত্তর না থাকলেও কিন্তু বাধ্য হয়ে ঐ নিরপেক্ষ উত্তর পছন্দ করতে হয়। আবার অনেকসময় প্রকৃত উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার জন্যও ব্যক্তি নিরপেক্ষ উত্তরের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে—যা একেবারেই কাম্য নয়।

(i) দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন (Dichotomous questions): যখন প্রশ্নতালিকায় কোনো প্রশ্নের কেবলমাত্র দুটির উত্তর দেওয়া থাকে, যাদের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও অন্যটি ঋনাত্মক এবং যেকোনো একটির উত্তর বেছে নিতে হয় তখন তাকে দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন বলে। উদাহরণ স্বরূপ, "উত্তরদাতা ইংরাজী জানে কিনা.....হ্যাঁ বা না" এরূপ প্রশ্ন দুই-উত্তর বিশিষ্ট প্রশ্ন।

(ii) বহু পছন্দমূলক প্রশ্ন (Multiple choice questions): এরূপ প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রশ্নতালিকায় তিন থেকে পাঁচটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া থাকে। প্রতিটি উত্তরই অপরের পরিবর্ত হিসাবে গণ্য হয়। উত্তরদাতাকে যেকোনো একটি উত্তর পছন্দ করে নির্বাচন করতে হয়। প্রশ্নতালিকাটি প্রণয়ন করার সময় প্রণয়নকারীকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় যাতে সমস্ত সম্ভাব্য উত্তরগুলি উল্লেখ করা সম্ভব হয়।

(iii) ঘটনা সম্বলিত এবং মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন (Factual and opinion questions): প্রশ্নতালিকার বেশিরভাগ প্রশ্নই ঘটনা সম্বলিত ও মতামত সংক্রান্ত হয়ে থাকে। উত্তরদাতার পেশা, আয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্ন ঘটনা সম্বলিত প্রশ্ন বলে গণ্য হয়। অন্যদিকে মতামত সংক্রান্ত প্রশ্নের মাধ্যমে কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতার মতামত জানতে চাওয়া হয়। জনমত সমীক্ষায় এই ধরনের প্রশ্নই বেশি থাকে। যেমন, প্রাণদণ্ড থাকা উচিৎ কি উচিৎ নয় মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন বলে গণ্য হয়। এধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল যে-কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ উত্তরদাতার প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্য হেতু একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান হল প্রথমে ঘটনা সম্পর্ক প্রশ্ন করা ও তারপর মতামত সংক্রান্ত প্রশ্ন করা।

(iv) শঙ্কা সঞ্চারী প্রশ্ন (Threatening questions): প্রশ্নমালায় কোনো সংবেদনশীল বিষয় সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উত্তরদাতার মনে শঙ্কার সৃষ্টি করে। এধরনের প্রশ্নকেই শঙ্কা সঞ্চারী প্রশ্ন বলে। অবৈধ কাজকর্ম, অসামাজিক আচরণ, মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী এধরণের প্রশ্ন হিসাবে গণ্য হয়। এইসব প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে বিষয়টি এড়াতে চায়। কাজেই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে উত্তরদাতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারলে ও গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারলে সঠিক উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(iv) সাপেক্ষ প্রশ্ন (Contingency questions): এধরনের প্রশ্নে দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশটির উত্তরের সাপেক্ষে উত্তরদাতাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্তরদাতার কাছে প্রাসঙ্গিক কিনা তা প্রথম প্রথম প্রশ্নের উত্তরের নিরিখে নির্ধারিত হয় বলে দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে সাপেক্ষ প্রশ্ন বলে। যেমন পারিবারিক জীবন সম্পর্কে উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে—(i) আপনি কি বিবাহিত? (ii) কতবছর আগে আপনি বিবাহ করেছেন? এদের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ-সূচক হলে তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করতে হয়।

(v) ছাঁচ প্রশ্ন (Matrix questions) একটি প্রশ্নের মাধ্যমে একাধিক বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য চাওয়া

(a) অনেকসময় উত্তরদাতা উত্তর দেওয়ার সময় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে এবং প্রকৃত ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আতিশয্য করে ফেলে, সাক্ষাৎকার যিনি গ্রহণ করে তাঁকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং অতিরিক্ত অংশ বাদ দিতে হবে।

(b) সাক্ষাৎকারে উভয়ের মধ্যে কোনো যোগসূত্রজনিত ফাঁকা থাকা চলবে না। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ এমন হবে যাতে উত্তর দেওয়া ও তার অর্থ অনুধাবন করার মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে।

(c) অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উত্তরদাতা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করে এবং কখনো কখনো তাকে বিদ্রুপ করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে এ ধরনের উত্তরদাতাকে খুব কৌশলের সাথে ও মাথা ঠান্ডা রেখে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

(d) আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষত: অনভিজ্ঞ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা উত্তরদাতার আচরণের কারণে অসন্তুষ্ট হয় এবং তার রিপোর্টে ঐ উত্তরদাতার তথ্যকে বিকৃতরূপ দেয়। এরূপ হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

(e) উপরের ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারের যেসব বিষয় কার্য-কারণ সম্পর্কিত সেগুলি বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

3. প্রশ্নাবলী পদ্ধতি (Questionnaire Method) :

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতিরও ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। গবেষণার বিশ্লেষণের উপকরণ বা চলক (variable) সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষককে একটি উপায় স্থির করতে হয়। এখানে উপায় বলতে প্রশ্নমালা বা প্রশ্নতালিকা তৈরী করতে হয় । এই তালিকায় কতকগুলি রীতিবদ্ধ প্রশ্ন থাকে এবং তালিকাটি তথ্য সরবরাহকারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণভাবে প্রশ্নমালাটির সাথে একটি পত্রও তথ্য সরবরাহকারীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং সেটি পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ দেওয়ার আবেদন করা হয়। প্রশ্নাবলীর মধ্যেই উত্তর লিপিবদ্ধ করার মত যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং কিভাবে প্রশ্ন তালিকাটি পূরণ করতে হবে সে ব্যাপারেও নির্দেশ দেওয়া থাকে। উত্তরদাতা গবেষকের সাহায্য ছাড়াই প্রশ্ন তালিকাটি পূরণ করে ও সাধারণত ডাকযোগে গবেষকের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এই প্রশ্নতালিকা সংগঠিত বা অসংগঠিত হতে পারে। সংগঠিত প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও তাদের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া থাকে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তরগুলির মধ্যে যথাযথ উত্তরটি বেছে নিতে হয়। কিন্তু অসংগঠিত প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া থাকে না, উত্তরদাতারা নিজ নিজ ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুসারে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

প্রশ্নতালিকার অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরন (Types of Questionnaire) :

গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে যে প্রশ্নতালিকা তৈরী করা হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রশ্নসংশ্লিষ্ট উত্তরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ:

জটিলতা থাকে এবং বিষয়টি পরিমাণবাচক নয়। যেমন—কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যার গভীরতা পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে **একক বিশেষ সমীক্ষায়** (case study) যে সাক্ষাৎকার চালানো হয় তাকে গুণবাচক সাক্ষাৎকার বলে। কারণ এরূপ সাক্ষাৎকার সমস্যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জানার চেষ্টা করা হয়।

(ii) পরিমাণবাচক সাক্ষাৎকার (Quantitative interview) **:** পরিমাণবাচক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি হল কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে বহুজনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের উপায়। লোকগণনা বা আদমসুমারির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সাক্ষাৎকারে সঠিক উত্তর পাওয়ার উপায় (means of getting correct response in an interview) :

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে একজন গবেষক সেই সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি অনুসরন করবে যার মাধ্যমে সে সঠিক নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। তথ্যে বিচ্যুতির পরিমাণ যত কম হবে গবেষনার ব্যয় ও জটিলতা তত কম হবে। সাধারণত: তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নির্ভর করে গবেষক সাক্ষাৎকার কতটা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করতে পারে তার উপর। এ ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবুও সাক্ষাৎকারকে ফলপ্রসূ করার জন্য একজন সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি নিচের নিয়মাবলী মেনে চলে সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যসাধন সহজ হয়।

(i) সাক্ষাৎকার শুরুর আগে গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে অবশ্যই যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক ও সখ্যতা গড়ে তুলতে হবে।

(ii) উত্তরদাতা যাতে তার বক্তব্য পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে তার জন্য সুযোগ দিতে হবে।

(iii) সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে গবেষককে সচেতন থাকতে হবে। সাক্ষাৎকার চলাকালীন হাল্কা কৌতুক সাক্ষাৎকারকে ফলপ্রসু ও উদ্দেশ্যাভিমুখে করতে সাহায্য করে।

(iv) সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উত্তরদাতা যাতে প্রশ্নগুলি মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং ভেবেচিন্তে উত্তর দেয় সেদিকে গবেষকের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। গবেষক বা উত্তরদাতা যদি অমনোযোগী হয় তাহলে বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে।

(v) গবেষক যদি উত্তরদাতার দেওয়া উত্তরের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেয় এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করে তাহলে ভাল কাজ হয়। উত্তরদাতা অধিক উৎসাহের সাথে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করে এবং আরো ভালভাবে উত্তর দেয়।

(vi) যদি উত্তরদাতার উত্তর গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কাছে সন্দেহজনক মনে হয় তাহলে জের মূলক প্রশ্ন করে সন্দেহের নিরসন ঘটাতে হবে।

এগুলি ছাড়াও গবেষকদের যেসব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি হল—(a) প্রাপ্ত উত্তর বা তথ্যের মধ্যে তুলনা করা যায় না ; (b) এরূপ সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা আনুপাতিকভাবে কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ; (c) এরূপ সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয়; এবং (d) তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অত্যন্ত শ্লথ বলে নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী নয়।

(2) উত্তরদাতাদের সংখ্যার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকারকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল:

(i) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Personal interview)**:** ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে একই সময়ে মাত্র একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এরূপ সাক্ষাৎকার মুখোমুখি হয় এবং বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত মতামত জানা যায়।

(ii) দলবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Group interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার একই সাথে নেওয়া হয়। যেক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত অভিমত সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে এধরনের সাক্ষাৎকার চালানো হয়।

(3) উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার দু'ধরনের। এগুলি হল:

(i) রোগ নির্ণায়েক সাক্ষাৎকার (Diagnostic interview)**:** কোনো ঘটনা ঘটার পিছনে কি কারণ রয়েছে তার জানার জন্য যখন সাক্ষাৎকার চালানো হয় তখন তাকে রোগ নির্ণায়ক সাক্ষাৎকার বলে।

(ii) চিকিৎসামূলক সাক্ষাৎকার (Therapeutic interview)**:** রোগ নির্ণায়ক সাক্ষাৎকারের মত এই সাক্ষাৎকার ততখানি সুনির্দিষ্ট নয়। এরূপ সাক্ষাৎকারে কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রয়োজনমাফিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

(4) পদ্ধতিগতভাবে সাক্ষাৎকার আবার দু'ধরনের, এগুলি হল:

(i) দিক্ বা দিশাহীন সাক্ষাৎকার (Non-directional interview): এরূপ সাক্ষাৎকারকে স্বাধীন বা অসংগঠিত সাক্ষাৎকারও বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাক্ষাৎকারের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না বা দিক্ নির্দেশ করে না। এরূপ সাক্ষাৎকারে কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রশ্নমালাও ব্যবহার করা হয় না। উত্তরদাতাকে কেবলমাত্র উত্তর দিতে ও তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।

(ii) নির্দিষ্ট দিক বা দিশাযুক্ত সাক্ষাৎকার (Focused interview) **:** সাক্ষাৎকারের এই পদ্ধতি খুব বেশী ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন—রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা ইত্যাদির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জানার প্রয়োজন হয়। এরূপ সাক্ষাৎকারের বৈশিষ্ট্য হল যে এরূপ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কোন বিষয় সম্বন্ধে উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া, আবেগ এবং মানসিক গঠন সম্পর্কিত তথ্য জানা সম্ভব হয়।

(5) বিষয়ের উপর ভিত্তি করেও সাক্ষাৎকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল নিম্নরূপ: (i) গুণবাচক সাক্ষাৎকার (Qualitative interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকার চালানো হয় যেক্ষেত্রে বিষয়গত

সুতরাং এরূপ কোন বিষয়ের উপর যদি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাহলে তথ্য পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠে। অনেকসময় আবার তথ্য পাওয়া গেলেও তা সম্পূর্ণভাবে বা পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায় না।

(ii) সাধারণভাবে সাক্ষাৎকার হল একটি কলা (art)। সাক্ষাৎগ্রহণকারী বা গবেষকের এই কলায় ব্যুৎপত্তি না থাকলে সাক্ষাৎকার সাফল্য পায় না। অনুরূপভাবে যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তার মধ্যে যদি কম পরিমাণে বুদ্ধিমত্তা থাকে তাহলেও সঠিক তথ্য পেতে অসুবিধা হয়।

(iii) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী যদি কোনরূপ ভুল ধারণা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সাক্ষাৎকার ভ্রান্তিমূলক হয়ে পড়ে।

(iv) আবার অনেকসময় মানব চরিত্রের কতকগুলি বিশেষ দিক সাক্ষাৎকারে বেশি গুরুত্ব পায় এবং অন্যদিক গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। কারণ গবেষক বৃত্তিগত বিষয়ের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অথচ পরিবেশগত বিষয়গুলির উপর সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়ায় সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

সাক্ষাৎকারের ধরন বা প্রকারভেদ (Types of Interview) :

গবেষণায় তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকারের ব্যবহার দেখা যায়। প্রতিটি সাক্ষাৎকার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে সাক্ষাৎকারকে নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায়।

(1) রীতি বা নিয়ম অনুসারে সাক্ষাৎকারের ধরণগুলি হল:

(i) নিয়মানুগ বা রীতিবদ্ধ সাক্ষাৎকার (Formal interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে গবেষক বা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে সাক্ষাৎকার নেয় এবং সাক্ষাৎকারের উত্তরগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে লিপিবদ্ধ। এরূপ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের ক্রম (order) এবং যোগসূত্রের (sequence) উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের প্রত্যেককে একই ধরনের প্রশ্ন করা হয় যাতে প্রাপ্ত উত্তরগুলির মধ্যে তুলনা করা যায়। এরূপ সাক্ষাৎকারের সুবিধাগুলি হল—(a) সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে তুলনা করা যায়, (b) সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে সাদৃশ্যতা (uniformity) দেখা যায় এবং (c) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর কম দক্ষতা থাকলেও তথ্য সংগ্রহে অসুবিধা হয় না।

(ii) **নিয়মবহির্ভুত সাক্ষাৎকার** (Informal interview)**:** এরূপ সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী পরিবেশ পরিস্থিতি ও উত্তরদাতার প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্নগুলি পরিমার্জন, সংশোধন করতে পারে এবং তাদের ক্রমবিন্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে যাতে উত্তরদাতা খোলা মনে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এমনকি এরূপ সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের যে তালিকা থাকে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী তার মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারে অর্থাৎ কিছু নতুন প্রশ্ন যোগ করতে পারে বা তালিকার কিছু প্রশ্ন বাদ দিতে পারে। এধরনের সাক্ষাৎকারের **সুবিধাগুলি** হল—(a) এরূপ সাক্ষাৎকারে উত্তরদাতা কোনো চাপের মধ্যে থাকে না এবং খোলামনে উত্তর দিতে পারে এবং (b) উত্তরদাতার কাছ থেকে নির্ভেজাল উত্তর পাওয়া যায়। ফলে

ব্যবহার ঘটে। যেমন, টেপরেকর্ডার, ক্যামেরা, বাইনোকুলার ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্যবেক্ষকদের প্রয়োজন হয়। সুতরাং এসব যন্ত্রের ব্যবস্থাও আগাম করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে গবেষক তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হলে সংগৃহীত তথ্য অনেক বেশী উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য হয়।

2. সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method) :

গবেষণার তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটির ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারী তথ্যপ্রদানকারী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে ও মুখোমুখি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। সাধারণত: তথ্য সংগ্রহকারী গবেষণার বিষয় সম্পর্কীত কতকগুলি প্রশ্ন তথ্য প্রদানকারীকে করে এবং তার উত্তরগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখে। তথ্য সংগ্রহের এটি একটি প্রত্যক্ষ ও মৌলিক পদ্ধতি। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোনো গবেষক স্কুল শিক্ষকদের নিয়ে কোনো গবেষণা চালাতে চায় তাহলে সে তথ্য সংগ্রহের জন্য স্কুলে যাবে, শিক্ষকদের সাথে দেখা করবে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবে। এরূপ পদ্ধতি এতটাই উপযোগী যে নিরক্ষর ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় কারণ তথ্য সংগ্রহ করা হয় কথোপকথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি দু'ভাবে প্রয়োগ করা হয়। **নিরীক্ষামূলক গবেষণায়** গবেষক পূর্বনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ত প্রশ্নমালা নির্ভর প্রশ্নের মাধ্যমে সদস্যদের উত্তর লিপিবদ্ধ করে থাকে। পক্ষান্তরে **ক্ষেত্র গবেষণায়** কথোপকোথনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। সেকারণে এরূপ সাক্ষাৎকার হয় অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত ও অন্তর্ঘন (in-depth)। যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তারা বুঝতেই পারে না যে তারা সাক্ষাৎকার দিচ্ছে। এই সাক্ষাৎকারে সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং প্রশ্ন করা, উত্তর শোনা ও অর্থ বোঝা যুগপৎ ঘটে। যাইহোক না কেন, সাক্ষাৎকার পদ্ধতির **সুফল বা সুবিধাগুলি** নিচে তুলে ধরা হল।

(i) এই পদ্ধতিতে গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারী ও তথ্যজ্ঞাপনকারী অর্থাৎ যার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠে। এর ফলে তথ্য সংগ্রহে সুবিধা হয়।

(ii) যেহেতু সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় আলোচনা বা প্রশ্নোত্তর মুখোমুখি ঘটে তাই প্রশ্ন বা উত্তর খুব পরিষ্কারভাবে জ্ঞাপন করা সম্ভব হয়।

(iii) সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনাসম্পর্কীত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, যা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা যায় না। উত্তরদাতার আবেগজনিত দৃষ্টিভঙ্গী, গোপন অনুপ্রেরণা ও অন্যান্য মানব চরিত্রের দিকগুলি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেই উন্মোচিত হয়। সেজন্য সাক্ষাৎকারকে অনেক সময় অধি-পর্যবেক্ষণ বলা হয়।

(iv) এছাড়াও এই পদ্ধতির সাহায্যে অন্য সূত্র বা উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতাও যাচাই করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **কুফল বা অসুবিধাগুলি হল** নিম্নরূপ:

(i) এমন কতকগুলি বিষয় আছে যা সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করা যায় না, গোপনে লিখে ব্যক্ত করা যায়।

সংক্রান্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ চালায় তখন তাকে সংগঠিত পর্যবেক্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ কাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, কখন পর্যবেক্ষণ করা হবে, কাদের পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে আগাম পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা অনুসারে পর্যবেক্ষণের কাজ পরিচালিত করে তখন তাকে সংগঠিত পর্যবেক্ষণ বলা হয়। বস্তুত: এরূপ পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষক তার উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টাকে প্রয়োগ করে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি পরীক্ষামূলক গবেষণার নক্শা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপাট বা পরিমণ্ডল থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হয় তখন এই পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে। যেহেতু প্রাকৃতিক ঘটনার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না এবং এ ব্যাপারে আগাম অনুমান করা সম্ভব হয় না তাই পরিকল্পনা করে পর্যবেক্ষণ চালানোও যায় না। তাই এরূপ পর্যবেক্ষণে কোন পরিকল্পনা থাকে না এবং প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্রচেষ্টাও গ্রহণ করা হয় না। অজ্ঞাত কোন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রকৃতি স্বরূপ উন্মোচন বা আবিস্কার সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে গবেষণার ক্ষেত্র অনুসারে গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষকের ভূমিকা ঠিক করতে হয়। এ বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট ও পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক বিচারবোধ দ্বারা পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। তবে একথা অস্বীকার করা যায় না যে গবেষণার সাফল্যের পিছনের সঠিক পদ্ধতির ব্যবহার ও গবেষকের সঠিক ভূমিকা পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসৃত পদক্ষেপসমূহ (Stepe in organising observation):

যেসব গবেষক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে চান তাঁদের নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

(1) **পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি ও সীমা ঠিক করা :** গবেষণার বিষয়ের বা গবেষণা প্রকল্পের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গবেষককে একটি তথ্য সংগ্রহের একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরী করতে হবে। এই রূপরেখায় কি ধরনের পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং কোন্ বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং কোন্ বিষয়গুলিকে পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা কোন্ বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা হবে না সেগুলি উল্লেখ করা হয়। এর ফলে পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যমুখী হয় এবং অহেতুক শ্রম, সময় ও প্রচেষ্টার অপচয় ঘটে না।

(2) **পর্যবেক্ষণের সময়, স্থান এবং বিষয়:** তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য চালানো হতে পারে। আবার পর্যবেক্ষণ কোনো পরীক্ষাগারে বা খোলা জায়গায় চালানো হতে পারে। এছাড়াও পর্যবেক্ষণ সার্বিক হবে না আংশিক হবে, তাও আগাম ঠিক করতে হয়।

(3) **পর্যবেক্ষক নির্বাচন:** তথ্য সংগ্রহের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য-এর উপর নির্ভর করে উপযুক্ত মানের কর্মী নির্বাচন করা প্রয়োজন। যেক্ষেত্রে দলবদ্ধভাবে পর্যবেক্ষণ চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে দলের কর্মীদের বাছাই করে দল গঠন করা বাঞ্ছনীয়।

(4) **প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা:** পর্যবেক্ষণের সময় অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক যন্ত্রপাতির

(i) যেহেতু পর্যবেক্ষকের প্রকৃত ভূমিকা গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে অজ্ঞাত থাকে তাই তারা স্বাভাবিক আচরণ করে। এর ফলে তথ্য বিকৃত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

(ii) কেবলমাত্র এরূপ পর্যবেক্ষণের দ্বারাই কতকগুলি আবেগজনিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায়।

(iii) এভাবে সংগৃহীত তথ্য খুবই নির্ভরযোগ্য হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিতে যেহেতু পর্যবেক্ষক নিজের উদ্দেশ্য গোপন করে তাই এই পদ্ধতিটিকে **অনৈতিক** (unethical) এবং গোপনীয়তা ভঙ্গের কারণ বলে গণ্য করা হয়।

(ii) এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষক দলের অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং দলে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে দলীয় আচরণের ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে এবং দলের স্বাভাবিক আচরণ ব্যহত হয়। এর প্রতিফলন ফলাফলের উপরও পড়ে বলে সংগৃহীত তথ্য পুরোপুরি বিশুদ্ধ হয় না।

(iii) যেহেতু পর্যবেক্ষক দলের কার্যকলাপের সাথে যুক্ত থাকে তাই কিছু কিছু দলীয় আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলত: সংগৃহীত তথ্য পুরোপুরি সঠিক হয় না।

(iv) অনেক সময় পর্যবেক্ষক দলের কর্মের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যায় যে দলের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সে নিজের উদ্দেশ্য ভুলে যায়। এর ফলেও তথ্যসংগ্রহ ব্যাহত হয় কারণ সে নিজেকে দলের সঙ্কট মোকাবিলায় নিয়োজিত হয় এবং তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি অগ্রাহ্য হয়।

অবশ্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণে অনেক সময় পর্যবেক্ষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করে ও গবেষণার উদ্দেশ্য তাদের কাছে ব্যক্ত করে। এরূপক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা হয় সাংবাদিকের ভূমিকার মত।

(2) অনঅংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ (Non participants or Direct observation) :

এরূপ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ঠিক বিপরীত, এক্ষেত্রে গবেষক বা পর্যবেক্ষক দলীয় কাজকর্মে কোনও রকম অংশগ্রহণ না করে পর্যবেক্ষণ করে থাকে। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সদস্যরা বেশীরভাগ সময় জানতেই পারে না যে তাদের নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। কারণ এরূপ পর্যবেক্ষণে গবেষকই অপ্রকাশিত থাকে। যেমন কোনো রেলস্টেশনে যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা-নামা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে যা রেলযাত্রীরা জানতে পারে না। এক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকা নিরীক্ষামূলক এবং অনেকটাই পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকার মত। এরূপ পর্যবেক্ষণে গবেষকের নিজস্ব সত্ত্বা সংরক্ষিত থাকে এবং বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততা বজায় থাকে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দলীয় সদস্যদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না এবং তাদের আচরণের অপব্যাখ্যার সম্ভাবনা থাকে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আরো দুটি উপবিভাগ রয়েছে। এগুলি হল—(i) **সংগঠিত পর্যবেক্ষণ** ও (ii) **অসংগঠিত পর্যবেক্ষণ।**

সংগঠিত পর্যবেক্ষণ হল কারণ ও যুক্তি নির্ভর একটি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। গবেষক যখন পর্যবেক্ষণ

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি আবেগজনিত বিষয়ে যেমন 'পছন্দ-অপছন্দ' পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করে।

(ii) কোন কোন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফল অলীক বলে গণ্য হয়।

(iii) যেহেতু দীর্ঘ সময় ধরে পর্যবেক্ষণ চালাতে হয়, তাই এই পদ্ধতিটি ব্যয়বহুল ও খুব বেশি সময় সাপেক্ষ।

(iv) অনেক সময় যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় তারা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য জেনে যায় এবং তারা কৃত্রিম আচরণ করে। এরূপক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে।

(v) এই পদ্ধতিটি অত্যন্ত শ্লথ হওয়ায় পর্যবেক্ষক এবং যাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, উভয়েই হতাশ হয়ে পড়ে।

(vi) পর্যবেক্ষণের চূড়ান্ত ফলাফল পর্যবেক্ষণকারীর অনুধাবন ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে। ফলে পদ্ধতিটি নৈর্ব্যক্তিক নয়, ব্যক্তি নির্ভর। কাজেই ফলাফলে ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়, যা অনভিপ্রেত।

(vii) পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য যেহেতু পর্যবেক্ষকের অবহিত থাকে তাই বিভিন্ন তথ্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিশেষ গুরুত্ব পায় যা কাম্য নয়।

(viii) কোন কোন সময় এই পদ্ধতি গবেষণার নৈতিক দিককে উপেক্ষা করে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির ধরন (Types of Obeservation Method)

পর্যবেক্ষকের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল—

(1) অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ এবং

(2) অনঅংশ-গ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ

(1) **অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ** (Peraticipant observation) : এই পর্যবেক্ষণে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় প্রধান। এই পদ্ধতিতে গবেষক সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অংশগ্রহণ করে বিশদ তথ্যসংগ্রহ করে। এরূপ পর্যবেক্ষণকে ছদ্ম পর্যবেক্ষণ (disguised observation) বলা হয়। এই ভূমিকা গ্রহণের প্রকৃতি হয় সম্পূর্ণ অংশগ্রহণকারী। গবেষককে এক্ষেত্রে দীর্ঘসময় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে বসবাস করতে হয়। এমনকি ভাল না লাগলেও তাকে গোষ্ঠীর সাথে থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর সাথে একীকরণ ও একাত্ম হতে পারলে তবেই গবেষক গোষ্ঠীর আচার-আচারণ, জীবনবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলিকে **স্প্রেডলি** (Spreeadley) নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল—স্থান, কর্তা, কাজ, বস্তু, ক্রিয়া, ঘটনা, সময়, লক্ষ্য এবং অনুভূতি। অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে জণ মেজ (John Madge) মন্তব্য করেছিলেন যে পর্যবেক্ষকের হৃদয়ের সাথে গোষ্ঠীর সদস্যদের হৃদয়ের সংযোগ ঘটলে তবেই তাকে অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক বলা যাবে। এরূপ পর্যবেক্ষণের **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

এদের সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল।

(1) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method) :

তথ্য সংগ্রহের এই পদ্ধতিটির ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায়। বিশেষত: উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও আচরণমূলক বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার ঘটে। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পর্যবেক্ষণ হল কোন বস্তুর দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন এবং স্পর্শজনিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি। গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ হল **দেখা** (watching) এবং **শোনার** (listening) একত্রিত রূপ। বস্তুত: বিভিন্ন ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে তার পিছনে **কার্য-কারণ সম্পর্ক** (cause-effect relationship) অনুধাবন করাই হল পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকে সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি : পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে তথ্যসংগ্রহকারীকে ব্যক্তিগতভাবে চোখ ও কানের প্রয়োগ ঘটিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। তাই এটি একটি প্রত্যক্ষ পদ্ধতি।

(ii) পর্যবেক্ষণ ও লিখন : পর্যবেক্ষক বা তথ্যসংগ্রহকারী খুবই সতর্কতা ও যত্নের সাথে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করে ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখে।

(iii) নির্বাচিত ও উদ্দেশ্যমূলক তথ্য সংগ্রহ : এই পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ সবসময় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে চালিত হয়। পর্যবেক্ষক কেবলমাত্র সেসব তথ্যই সংগ্রহ করে যেগুলি গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত ও প্রাসঙ্গিক।

(iv) কার্য-কারণ সম্পর্ক : পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে কোন ঘটনা ঘটার পিছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুধাবন করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Observation Method)

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির **সুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) এই পদ্ধতিটি সহজ ও সরল বলে যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে সহজেই ব্যবহার করা যায়।

(ii) এটি অনেক বেশী বাস্তবানুগ কারণ প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত হয়।

(iii) এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য অনেক বেশী নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয়।

(iv) গবেষণার প্রকল্প প্রণয়নে এই পদ্ধতিটি খুবই কার্যকরী।

(v) যখন কোনো সমস্যা বা বিষয়কে গভীরভাবে সমীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তখন এই পদ্ধতি উপযোগী হিসাবে গণ্য হয়।

অন্যদিকে এই পদ্ধতির **অসুবিধাগুলি** হল নিম্নরূপ:

(i) সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি খুব কার্যকরী হয় না কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে

(ii) স্বল্পমেয়াদী তথ্য সংগ্রহ সমীক্ষা দীর্ঘমেয়াদী তথ্য সংগ্রহ সমীক্ষা থেকে অধিক উপযোগী বলে গণ্য হয়।

(2) **প্রযুক্ত বিষয়,** যার অন্তর্ভুক্ত হল—

(i) তথ্য সংগ্রহকারীকে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের প্রয়োজন তা সংগ্রহকারীর রয়েছে।

(ii) গবেষণার বিষয়ের প্রকৃতি ও আকার কি ধরনের তথ্যের প্রয়োজন তা ঠিক করে দেয়।

(iii) যেক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যাটি একাধিক স্বাধীন বিষয়ের সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথকভাবে কম সংখ্যক তথ্য সংগ্রহ করাই যুক্তিযুক্ত।

(iv) কিন্তু যেক্ষেত্রে গবেষণার সমস্যাটি একাধিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের সাথে যুক্ত সেক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে স্বাধীন সমীক্ষা চালানো যুক্তিযুক্ত কিন্তু তাদের মধ্যে অবশ্যই সমন্বয় থাকা দরকার। এভাবে সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী দলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

(3) **মানবিক বিবেচ্য বিষয়:** এর অন্তর্ভুক্ত হল যদি তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবর্তনজনিত মানবিক বাধা বা প্রতিক্রিয়া বর্তমান থাকে তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই বাধা দূর করা সম্ভর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া ঠিক না।

(4) **অন্যান্য বিষয়সমূহ:** প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলি হল—

(i) **সময়সীমা:** তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণার পরিকল্পনায় যে সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই তথ্য সংগ্রহ সম্পূর্ণ করতে হবে।

(ii) **ব্যয় :** তথ্য সংগ্রহের ব্যয় যেন এব্যাপারে অনুমিত ব্যয়ের বেশি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(iii) নির্ভুলতা : সংগৃহীত তথ্য যেন যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারটিও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।

(ঙ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিসমূহ (Methods of Primary Data Collection) :

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ গবেষণার ক্ষেত্রে দেখা যায়। এদের মধ্যে নিচের চারটি পদ্ধতির ব্যবহার সর্বাধিক। এগুলি হল—

(1) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ;

(2) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ;

(3) প্রশ্নাবলী পদ্ধতি ;

(4) একক বিশেষ সমীক্ষা পদ্ধতি।

(গ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক তথ্য বা উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	প্রাথমিক তথ্য	মাধ্যমিক তথ্য
1. তথ্যের উৎস	মূল বা প্রাথমিক উৎস অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়।	প্রকাশিত বা লিখিত নথি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়।
2. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	সাধারণত: পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বা প্রশ্নমালা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	বিভিন্ন প্রকাশিত বা লিখিত নথি সমীক্ষা করে তথ্য সংগৃহীত হয়।
3.পরিখ্যানমূলক প্রক্রিয়াকরণ	এধরনের তথ্যের পরিসংখ্যানমূলক প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়।	পরিসংখ্যানমুলক প্রক্রিয়াকরণ করার দরকার হয় না কারণ এগুলি সাধারণত প্রক্রিয়াকরণ করা থাকে।
4. তথ্যের মৌলিকত্ব	প্রাথমিক তথ্য মৌলিক। এরূপ তথ্য ব্যবহারকারীই প্রথম সংগ্রহ করে।	এরূপ তথ্য মৌলিক নয়, পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।
5. সময়	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করা সময় সাপেক্ষ।	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে সাধারণত: বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।
6. ব্যয়	এরূপ তথ্য সংগ্রহ ব্যয়বহুল। কারণ এজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়।	এরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যয় আনুপাতিকভাবে কম হয়।
7. তথ্যের নির্ভুলতা	প্রাথমিক তথ্য অনেক বেশি নির্ভুল হয়।	মাধ্যমিক তথ্যের মধ্যে ভুল থাকার সম্ভাবনা বেশি।

গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত: দুধরনের তথ্যই ব্যবহৃত হয়। তবুও এদের মধ্যে যেসব পার্থক্য বিদ্যমান সেগুলি নিচে তালিকাকারে তুলে ধরা হল।

(ঘ) প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Consideration for Primary Data Collection) :

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের বিষয় বা উৎস নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলি হল—

(1) **অর্থনৈতিক বিবেচ্য বিষয়,** যার অন্তর্ভুক্ত হল—

(i) তথ্য সংগ্রহের ব্যয় অর্থাৎ তথ্যের উপযোগিতা এবং ব্যয়ের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে।

হল মাধ্যমিক তথ্য। প্রাথমিক তথ্য যেখানে সরাসরি মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত হয় সেখানে মাধ্যমিক তথ্য নথিসূত্রে (paper) সংগৃহীত হয়। নথি বলতে যেকোনো লিখিত উপকরণকে বোঝায় যা গবেষণার বিষয় বা ঘটনা সম্বলিত সংবাদ বহন করে। এগুলি আবার দু'ধরনের—প্রত্যক্ষ বিবরণ নির্ভর নথি ও পরোক্ষ বিবরণ নির্ভর নথি। এই প্রথম শ্রেণির নথিকে 'রেকর্ড' ও দ্বিতীয় শ্রেণির নথিকে রিপোর্ট বলা হয়। জন ম্যাজ (John Madge)-এর মতে 'রেকর্ড' ঘটমান বর্তমানকে নথিভুক্ত করে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিবরণ দিয়ে থাকে। অন্যদিকে রিপোর্ট অতীতের ঘটনার বিবরণ নথিভুক্ত করে, কাজেই পরোক্ষ হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের অসংখ্য নথি গবেষণার তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই নথিগুলিকে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়—**ব্যক্তিগত নথি** ও **বহুজনীন বা সরকারী নথি**।

(খ) **সুবিধা ও অসুবিধা :** প্রাথমিক তথ্যের মতই মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্যেরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এরূপ তথ্যের সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) **ব্যয়:** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের মত মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ অতটা ব্যয়বহুল নয়। তাছাড়াও এর অপর এক সুবিধা হল যে তৈরী তথ্য পাওয়া যায়।

(ii) **সময়:** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ সময় লাগে তা মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাগে না। অনেক দ্রুত তার সাথে এরূপ তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(iii) **তথ্যের পরিধি:** মাধ্যমিক তথ্যের পরিধি বেশ ব্যাপক। এধরনের তথ্য আরো তথ্য সংগ্রহের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

অন্যদিকে এরূপ তথ্যের যেসব অসুবিধা দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) যেহেতু এরূপ তথ্য প্রাথমিকভাবে অন্য কোনো বিষয়ের প্রেক্ষাপটে সংগৃহীত হয়েছিল, তাই এরূপ তথ্য সবসময় গবেষণার প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে।

(ii) এরূপ তথ্য পরিবেশের গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার কারণে অপ্রচলিত বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা যায় না।

(iii) মাধ্যমিক তথ্যের নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রধানত: তথ্যের উৎস এবং তথ্য সংগ্রহের যে অনির্দিষ্ট অনুমান করা হয়েছিল তার উপর নির্ভর করে।

(iv) মাধ্যমিক তথ্যের উৎস খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা অনেক সময় বেশ সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

(v) অনেক সময় তথ্যের ব্যাপকতা এতটাই বেশি হয় যে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করতে প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয়িত হয়।

(ক) তথ্য সংগ্রহের ধরন :

প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য (Primary Data) : গবেষকের দ্বারা সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ তথ্যকে প্রাথমিক তথ্য বা প্রত্যক্ষ তথ্য বলে এধরনের তথ্য সরাসরি মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে এবং তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সাপেক্ষে (theoretical perspective) বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোঠারী (C. R. Kothari) তাঁর Research Methodology- Methods and Techniques গ্রন্থে প্রাথমিক তথ্য সম্বন্ধে বলেছেন যেসব তথ্য নতুনভাবে ও প্রাথমিকভাবে সংগ্রহ করা হয় এবং যাদের মধ্যে চরিত্রের মৌলিকত্ব বর্তমান থাকে সেগুলিই হল প্রাথমিক তথ্য (" The primary data are those which are collected afresh and for the first time, and thus happens to be original in character.")। বস্তুত: তথ্য হল গবেষণার কাঁচামাল স্বরূপ। সংগৃহীত তথ্য প্রয়োজনমত সংযুক্ত ও সংগঠিত করা যায়। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক তথ্য থেকে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য সততই নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হয়। কারণ প্রাথমিক তথ্য সবসময়ই অকৃত্রিম উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

(ii) ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য এসব উপাত্ত থেকে পাওয়া যায়।

(iii) এরূপ তথ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না বলে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।

(iv) এরূপ তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি, তথ্যের সীমাবদ্ধতা ও অন্যান্য দিকগুলি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা থাকে।

(v) উপাত্ত বা তথ্যগুলি যাতে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হয় সেজন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা তথ্যের সাথে দেওয়া হয়। কথায় আছে যে গোলাপ থাকলেই কাঁটা থাকবে। প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্যের যেমন অনেক সুবিধা রয়েছে তেমনি কয়েকটি অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। এগুলি হল নিম্নরূপ:

(i) ব্যয়: প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করা ব্যয়বহুল।

(ii) সময়: এরূপ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রচুর সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রাথমিক তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহে শ্রম, সময় ও অর্থের বেশি প্রয়োজন হয়।

(iii) **প্রশিক্ষিতকর্মী :** প্রাথমিক উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজসাধ্য নয়। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্য (Secondary Data) **:** যেসব তথ্য মৌলিক নয়, যেগুলি অপর কোনো ব্যক্তির দ্বারা সংগৃহীত এবং সাধারণভাবে প্রকাশিত তাদের মাধ্যমিক বা পরোক্ষ তথ্য বলে। এরূপ তথ্যের পরিসখ্যানমূলক প্রক্রিয়ার (statistically processed) মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে। উদাহরণস্বরূপ: ভারতীয় রির্জাভ ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত তথ্য বা কোন জার্নাল বা কোনো সরকারী দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত তথ্য

(i) গবেষণার সমস্যা সম্পর্কিত ভুল ব্যাখ্যা ও ভুল পরিকল্পনা।

(ii) গবেষণা চালানোর জন্য যে জনসমষ্টিকে নির্বাচিত করা হয় সেই নির্বাচনে যদি ভুল থাকে তাহলে গবেষণায় ত্রুটির উদ্ভব হয়।

(iii) অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্নাবলীর (Questionnaire) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হলে অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

(iv) তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভুল পদ্ধতির ব্যবহার।

(v) তথ্য সংগ্রহকারী যদি অসংলগ্ন ও ভুল তথ্য সংগ্রহ করে।

(vi) প্রতিবেদন ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত ঝোঁক বা পক্ষপাত।

(vii) গবেষণার অন্তর্ভুক্ত চলকগুলি (variables) সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব।

(viii) প্রকৃত সংখ্যার পরিবর্তে পড় সংখ্যার অপব্যবহার।

(ix) গবেষণা চালানোর জন্য ভুল পদ্ধতির ব্যবহার।

(x) গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে যদি কোনো গলদ থাকে।

উপরের কারণগুলি ছাড়াও নমুনা-বহির্ভূত ত্রুটি আরো কিছু কারণ থাকতে পারে। তবে উপরের কারণগুলি দূর করতে পারলে গবেষণা অনেকাংশেই ত্রুটিহীন করা সম্ভব হয়।

অনুশীলনী :

০১। নমুনাকরণের অর্থ ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

০২। এক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলীগুলি কি?

০৩। নমুনাচয়নের মূল পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

১.৭ উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ (Data Collection)

গবেষণা হল অজ্ঞাত কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। গবেষণার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একে গবেষণার অন্যতম মূল কাজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে দু'ধরণের উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এগুলি হল—(1) প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ উপাত্ত বা তথ্য এবং (2) মাধ্যমিক বা পরোক্ষ উপাত্ত বা তথ্য। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন অনুসন্ধানের কাজে প্রশ্নাবলী পদ্ধতির (questionnaire method) প্রয়োগ ঘটে। সাধারণত: দেখা যায় এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্নাবলীর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর উত্তরদাতা দেয় না বা নমুনার অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় না।

(iii) উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে ত্রুটি : যখন নমুনা থেকে উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন এই উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে তার প্রতিফলন সামগ্রিক প্রক্রিয়ার উপর পড়ে। যেসব কারণে তথ্য সংগ্রহে ত্রুটি দেখা যায় সেগুলি হল নিম্নরূপ:

(a) তথ্য সংগ্রহকারী যদি তথ্য সংগ্রহে যত্নশীল না হয় তাহলে সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিহীন হয় না। যেমন তথ্য সংগ্রহকারী যদি সঠিকভাবে প্রশ্ন না করে বা উত্তর সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তথ্যের মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়।

(b) উত্তরদাতার উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অভাব থাকলে প্রদত্ত উত্তর সঠিক ও যথাযথ হয় না।

(c) যদি প্রশ্নাবলীটি খুব দুর্বল হয় অর্থাৎ ভালভাবে তৈরী করা না হয়।

(d) তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে।

(iv) পরিবর্ত : নমুনার অন্তর্ভুক্ত কোনো উপাদান বা ব্যক্তিকে যদি পাওয়া না যায় তাহলে তথ্যসংগ্রহকারী নমুনার অন্তর্ভুক্ত কোনো পরিবর্ত ব্যক্তি বা উপাদানের থেকে তথ্যসংগ্রহ করে। এর ফলে নমুনার পরিবর্ত পক্ষপাতের উদ্ভব হয় এবং ফলাফল সঠিক হয় না।

(v) ত্রুটিপূর্ণ বিশ্লেষণ : প্রাপ্ত তথ্য বা উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে গবেষণার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু তথ্য বা উপাত্ত বিশ্লেষণ যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলেও নমুনাকরণ ত্রুটির (sampling error) উদ্ভব ঘটে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে তথ্য সংগ্রহকারী এবং উত্তরদাতা বা তথ্যপ্রদানকারীর পক্ষপাতমূলক আচরণ বিভিন্ন ধরনের ত্রুটির জন্ম দেয়। তবে অনেক সময় তথ্যসংগ্রহকারী বা উত্তরাদাতার কোনো ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক কারণে বা দুর্ঘটনাজনিত কারণেও কিছু ত্রুটির উদ্ভব ঘটে। এ ধরণের ত্রুটিকে পক্ষপাতহীন ত্রুটি (unleiased error) বলা হয় এবং এ ধরনের ত্রুটি অনেকাংশে পারস্পরিক ক্রিয়ায় অবলুপ্ত (set off) হয়ে যায় এবং গবেষণার ফলাফলকে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

(2) নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি (Non-sampling errors) :

নমুনাকরণের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি বা ভুল না থাকলেই বলা যায় না যে গবেষণা বা সমীক্ষা পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত, বস্তুত: গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়েই যেমন—তথ্যসংগ্রহ, তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও তথ্যবিশ্লেষণ ইত্যাদির সময় ত্রুটির উদ্ভব ঘটতে পারে। সুতরাং নমুনাকরণের ক্ষেত্রে ত্রুটি ছাড়াও নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির উদ্ভব ঘটতে পারে এবং এগুলিকে নমুনা-বহির্ভূত ত্রুটি বলে। এগুলি হল—

(iv) নমুনার সমদর্শিতা (homogeneity) পরীক্ষার মাধ্যমে : বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে যে নমুনা তৈরি করা হয় তার মধ্যে জনসমষ্টির সকল চরিত্রই প্রকাশ পেতে হবে। তাই সমদর্শিতা পরীক্ষার মাধ্যমে একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা যায়।

(v) নিরপেক্ষ নির্বাচন : বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে নমুনার উপাদানগুলি নির্বাচনে কোন পক্ষপাত বা ঝোঁক না থাকে। নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নমুনা নির্বাচন করা হলে তা অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়।

(vi) প্রধান নমুনা থেকে নমুনা তৈরীর মাধ্যমে : এটি হল নমুনা থেকে নমুনা তৈরি করা। অনেকসময় নমুনার নির্ভরযোগ্যতা পরিমাপ করার জন্য নমুনা থেকে আরো একটি নমুনা তৈরি করা হয়। এরপর এই নমুনাটি খুবই প্রগাঢ়ভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মূল নমুনার ফলাফলের তুলনা করা হয়। এর ফলে মূল নমুনার কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে তা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

(জ) নমুনাগত ও নমুনা বহির্ভুত ত্রুটি (Sampling and Non-sampling errors) :

পরিসংখ্যামূলক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ভুল বা ত্রুটি সাধারণভাবে দেখা যায় তাদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল (1) নমুনাগত ত্রুটি বা ভুল (Non-sampling errors) এবং (2) নমুনা বহির্ভূত ত্রুটি বা ভুল (Sampling errors)। নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

(1) নমুনাকরণজনিত ভুল বা ত্রুটি (Sampling errors) :

নমুনার মাধ্যমে সমীক্ষায় বৃহৎ জনসমষ্টির একটি ছোট অংশের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। কাজেই নমুনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে মূল জনসমষ্টির ফলাফলের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এমনকি একই জনসমষ্টি থেকে একাধিক নমুনা নির্বাচন করা হয় ও তাদের উপর সমীক্ষা চালানো হয় তাহলেও প্রাপ্ত প্রতিটি নমুনার ফলাফলের মধ্যে অল্পবিস্তার বিচ্যুতি দেখা যায়। এমনকি নমুনাগুলি যদি নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করা হয় তাহলেও ফলাফলের মধ্যে এই বিচ্যুতি দেখা যায়। এই বিচ্যুতি বা পার্থক্যকেই ভুল বা ত্রুটি বলা হয় এবং নমুনাকরণের জন্যই এই ত্রুটি বা ভুলের উদ্ভব হয় বলে এরূপ ভুলকে নমুনাগত বা নমুনাকরণজনিত ভুল বলে গণ্য করা হয়। যেসব কারণে নমুনাকরণজনিত ভুলের উদ্ভব ঘটে সেগুলি নিচে তুলে ধরা হল।

(i) **নমুনা নির্বাচনে ত্রুটি :** উদ্দেশ্যমূলক নমুনা নির্বাচন কখনই নিরপেক্ষ হয় না। কাজেই এরূপক্ষেত্রে ত্রুটি বা ভুলের উদ্ভব হয়। নমুনাকারী যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নমুনার উপাদানগুলিকে নির্বাচন করে তাহলে নমুনাটি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। নমুনা নির্বাচন যতটা অসংগঠিতভাবে হবে নমুনার ত্রুটি বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পায়।

(ii) **অসম্পূর্ণ অনুসন্ধান :** যদি নমুনার অন্তর্ভুক্ত সব উপাদানগুলির উপর অনুসন্ধান না চালানো হয় অর্থাৎ কিছু উপাদানকে অনুসন্ধানের বাইরে রাখা হয় তাহলে প্রাপ্ত তথ্য পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(3) যদি নমুনাকরণের ক্ষেত্রে স্তরভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাহলেও কিন্তু নিখুঁত স্তরীকরণনীতি (Principle of perfect stratification) অনুসরণ করা উচিত নয়।

(4) উৎস তালিকার অভাব বা অসম্পূর্ণ তালিকা থেকে নমুনা নির্বাচন করা হলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে।

(5) যদি তথ্য সংগ্রহকারীদের নমুনা নির্বাচনে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং কোনো নির্দিষ্ট গাইডলাইন দেওয়া না হয় তাহলে তারা তাদের সুবিধামত নমুনা নির্বাচন করে। এরূপক্ষেত্রে নমুনার পক্ষপাতহীন ও প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(6) এছাড়াও নমুনার উপাদান নির্বাচনের পদ্ধতি যথাযথ ও উপযুক্ত না হলেও নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ে। জটিল, বিষমপ্রকৃতির এবং বিশাল ব্যপ্তিযুক্ত জনসমষ্টি থেকে নমুনা তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(7) সবশেষে গবেষক বা সমীক্ষককে সবসময় দেখতে হবে যাতে নমুনা পক্ষপাতশুন্য ও জনসমষ্টির সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

(ছ) নমুনাকরণের নির্ভরযোগ্যতা (Sampling Reliability) :

গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি উদ্দেশ্য গুরুত্ব পায়। এগুলি হল—(i) নমুনাটি অবশ্যই **ঝোঁকশূন্য** ও **নিরপেক্ষ** হবে এবং (ii) **নির্ভরযোগ্য** হবে। একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল নমুনার আকার, গবেষণার বিষয়ের সাথে, সাযুজ্য, উপযুক্ততা, জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা ইত্যাদি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির নিরিখে একটি নমুনার নির্ভরযোগ্যতা বিচার করা হয়।

(i) নমুনার আকার : নমুনার জনসমষ্টির চরিত্রকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নমুনার আকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে দেখা যায় তাদের মধ্যে সরল সম্পর্ক বিদ্যমান। নমুনার আকার যত বড় হবে তার মধ্যে জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তত বেশী হবে। বিপরীতক্রমে নমুনার আকার যত ছোট হবে তার নির্ভর যোগ্যতাও তত হ্রাস পাবে। সেজন্য গবেষক বা সমীক্ষককে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমীক্ষা চালানোর জন্য নমুনাটি উপযুক্ত কিনা।

(ii) নমুনার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র পরীক্ষার মাধ্যমে : নমুনার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা পরীক্ষার মাধ্যমে নমুনার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। অর্থাৎ নমুনা জনসমষ্টির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে যত বেশী করে প্রকাশ করতে পারবে তার নির্ভরযোগ্যতাও তত বেশি হবে।

(iii) একটি সমান্তরাল নমুনা তৈরির মাধ্যমে : নমুনার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নমুনার সমান্তরাল অপর একটি নমুনা একই জনসমষ্টি থেকে তৈরি করা হয়। সমান্তরাল নমুনাটির নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার পর প্রথম নমুনাটি পরীক্ষা করা হয়। দুটি নমুনার ফলাফল তুলনা করে উভয় নমুনা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

নমুনা তৈরি কতকগুলি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যেমন—যেক্ষেত্রে জনসমষ্টির সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না, নমুনার উপাদানগুলিকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না এবং যেক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা (pilot study) চালানো হয়।

(iii) **অংশ বা ভাগ নমুনাকরণ :** অংশ বা ভাগ নমুনাকরণ স্তরভিত্তিক নমুনাকরণেরই একটি বিশেষ ধরন। এই পদ্ধতিতে গবেষণার অনর্থবক্ত জনসমষ্টির জ্ঞাত চরিত্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এরপর এই প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত উপাদান ও মোট জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত উপাদানের মধ্যে অনুপাত বের করা হয়। এরপর অনসন্ধানকারীদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ কোন্ কোন্ শ্রেণীর কোন্ অংশের উপর তারা সমীক্ষা চালাবে। এভাবে সম্পূর্ণ জনসমষ্টি থেকে আনুপাতিভাবে তথ্য সংগৃহীত হয়।

এই পদ্ধতির সুবিধা হল যে জনসমষ্টির ধরনের উপাদানগুলিকে নিয়ে এক একটি স্তর গঠন করা হয় এবং স্তরগুলি থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়। এরফলে সংগৃহীত তথ্য জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করতে অনেকটাই সম্ভব হয় এবং গবেষণার ব্যয়ও হ্রাস পায়। তবে এই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হল যে জনসমষ্টির স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে নমুনাকারীর পক্ষপাতিত্ব (biasness) দেখা যায়। এছাড়াও নমুনা নির্বাচনে যেহেতু নিরপেক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে না। তাই প্রাপ্ত ফলাফলের মধ্যে ভুল-ত্রুটির পরিমাণ পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না।

(চ) নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা (Precautions in using Sampling Methods) :

নমুনাকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্বাচনে প্রথম যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় সেটি হল নমুনাটি যেন অবশ্যই জনসমষ্টিকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। নমুনাটির মধ্যে যদি জনসমষ্টির সকল চরিত্রের প্রকাশ না ঘটে তাহলে ঐ নমুনাকে পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বমূলক বলা যায় না, কাজেই এরূপ নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা চালালে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সুতরাং নমুনা যাতে পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়ে তারজন্য গবেষককে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(1) যেক্ষেত্রে জনসমষ্টি পরিবর্তনীয় হয় অর্থাৎ জনসমষ্টির চরিত্রগত পরিবর্তন প্রায়শ:ই ঘটতে থাকে সেক্ষেত্রে জনসষ্টির উপর সমীক্ষা একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারে বারে চালাতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ বারে বারে সমীক্ষা চালালে জনসমষ্টির চরিত্রগত পরিবর্তন সমন্ধেও ধারণা পাওয়া যায়।

(2) জনসমষ্টি থেকে যে নমুনা নির্বাচন করা হবে তার আকার যেন খুব ছোট না হয়। কারণ বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে যদি ছোট আকারের নমুনা নির্বাচন করা হয় তাহলে তা জনসমষ্টিকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সুতরাং নমুনার আকার এমন হতে হবে যাতে জনসমষ্টির সমস্ত চরিত্রের প্রকাশ পায়। এছাড়াও নমুনা নির্বাচন যেন উদ্দেশ্যভিত্তিক না হয়। কারণ এরূপক্ষেত্রে নমুনার পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

(i) **বিচারভিত্তিক বা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনাকরণ :** এই পদ্ধতিতে বৃহৎ জনসমষ্টি থেকে নমুনা তৈরীর ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে গবেষক বা অনুসন্ধানকারীর বিচার বিবেচনা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে। যদিও নমুনা গঠনকারী সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা করে যাতে নমুনাটি সঠিকভাবে জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তথাপি সর্বোত্তম নমুনা গঠনের ক্ষেত্রে তার বিচার-বিবেচনাই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী বলে গণ্য হয় যখন জনসমষ্টি থেকে খুব কম সংখ্যক উপাদান নিয়ে নমুনা তৈরী করতে হয়। এরূপক্ষেত্রে যদি সরল নিরপেক্ষ নমুনাকরণ পদ্ধতি (simple random sampling) অনুসরণ করা হয় তাহলে কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বা বাদ পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। এরূপক্ষেত্রে বিচারভিত্তিক নমুনাকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের নমুনায় অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিৎ হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ধরা যাক একটি কোম্পানীর কর্মীদের কার্যকারিতা (effectiveness) নিরূপণের জন্য ঐ কোম্পানীর মোট 100 জন কর্মীর থেকে নিরপেক্ষভাবে 10 জন কর্মীকে বেছে নিয়ে একটি নমুনা তৈরি করা হল। এরূপ নমুনায় হয়তো দেখা যাবে যে কোম্পানীর সব বিভাগের প্রতিনিধিত্ব নেই, একটি বা দুটি বিভাগের কর্মীদের নিয়েই নমুনাটি গড়ে উঠেছে। সুতরাং কোম্পানী সমস্ত কর্মীদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নমুনার ফলাফল সঠিক ধারণা দিতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে ঐ নমুনা সমীক্ষার ফলাফল গবেষণার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত বিচারভিত্তিক নমুনাকরণও যথাযথভাবে প্রয়োগ করা না হলে গবেষণার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এছাড়াও এরূপ পদ্ধতির অন্য একটি অসুবিধা হল যে নমুনার ফলাফলের নির্ভরতা যাচাই করার কোন সুযোগ থাকে না।

তথাপি যখন কোন জনসমষ্টির অজ্ঞাত চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য জানার জন্য সমীক্ষা বা গবেষণা চালানো হয় তখন জনসমষ্টিকে প্রথমে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কতকগুলি স্তরে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি স্তর থেকে বিচার-বিবেচনার উপর নির্ভর করে নমুনার উপাদানগুলি বেছে নেওয়া হয়। এরূপক্ষেত্রে নমুনাটি অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক হয়।

(ii) **সুবিধাজনক নমুনাকরণ :** যখন নমুনা নির্বাচনে গবেষক বা অনুসন্ধানকারীর সুবিধার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তখন তাকে সুবিধাজনক নমুনাকরণ বলা হয়। এরূপ নমুনাকরণ যেমন 'সম্ভাবনার' বিষয়টি বিবেচনা করে না তেমনি ব্যক্তিগত বিচারবোধের উপরও নির্ভর করে না। পরিবর্তে নমুনাটি কিভাবে তৈরি করলে গবেষণা চালাতে সর্বাধিক সুবিধা হবে তার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়। কতকগুলি তৈরি তালিকা যেমন টেলিফোন ডাইরেক্টারী, গাড়ির নিবন্ধন তালিকা থেকে যখন কোন নমুনা তৈরি করা হয় তখন তাকে সুবিধাজনক নমুনাকরণ বলা হয়। এরূপ নমুনাকরণে যদি নিরপেক্ষ নমুনাকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তথাপি একে নিরপেক্ষ বা ঝোঁকহিন নমুনাকরণ বলে না। এরূপ নমুনার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলি কখনই জনসমষ্টির সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সেকারণে এভাবে তৈরি নমুনা পক্ষপাতদুষ্ট (biased) হয় এবং কোনোভাবেই সন্তোষজনক বলে গণ্য হয় না। তথাপি এই পদ্ধতিতে

(c) পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুবিন্যস্ত উপাত্ত বা তথ্যসূহের অনুপাত, সমানুপাত, শতাংশ হার নির্ণয়ের দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণী বা বর্গের মধ্যে তুলনা করা।

(d) সাধারণের বোধগম্য করার জন্য প্রয়োজনে তথ্যভিত্তিক রেখাচিত্র ব্যবহার করা।

(e) কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিস্তৃতি ইত্যাদি নিরূপণের মাধ্যমে উপাত্তসমূহের সংক্ষেপায়ণ এবং সহগমন সহগাঙ্ক (Co-efficient of correlation) নির্ণয়ের মাধ্যমে এক ঘটনার সাথে আর এক ঘটনার বা এক চলকের সাথে অন্য চলকের সম্পর্ক স্থাপন।

(f) যেহেতু গবেষণার উদ্দেশ্য হল সাধারণ সিদ্ধান্তকরণ (generalisation), তাই আরোহী পরিসংখ্যান পদ্ধতি যেমন—chi-square text, t-test, z-test ইত্যাদি প্রয়োগ করে সামান্যীকরণের চেষ্টা করা হয়।

অনুশীলনী :

০১। তথ্য সংগ্রহের ধরনগুলি ব্যাখ্যা করুন।

০২। সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কি কি অসুবিধা রয়েছে?

০৩। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কিভাবে করা হয়?

১.৮ গবেষণার প্রতিবেদন তৈরী (Writing of Thesis or Report) :

গবেষণার প্রতিবেদন তৈরী গবেষণার চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ, গবেষণার ফলাফল প্রতিবেদিত না হলে গবেষণার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। গবেষণার প্রতিবেদনকে প্রধানত: তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। এগুলি হল প্রারম্ভিক পর্ব। মধ্য বা মূল পর্ব ও অন্তিম পর্ব।

প্রতিবেদনের **প্রারম্ভিক পর্বে** তাকে প্রতিবেদনের শিরোনাম (Title), সূত্র-স্বীকৃতি (acknowledgement) এবং ভূমিকা বা মুখবন্ধ (preface) । এছাড়াও বিষয়সূচী, সারণী, লেখচিত্র প্রভৃতির তালিকাও এই পর্বে থাকতে পারে।

প্রতিবেদনের **মূল বা মধ্য** পর্বে গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুসৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যা এবং গবেষণার আলোচনার ক্ষেত্র ইত্যাদি প্রথমদিকে থাকে। এরপর সংগৃহীত তথ্যের বিবরণ ও মুখ্য বক্তব্য যুক্তি পরম্পরার বিভন্ন ভাগে পরিবেশিত হয়। মূল বক্তব্যের শেষে গবেষণার ফলাফল বা সিদ্ধান্ত স্পষ্ট এবং যথাযথভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এবং যেসব প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান অজ্ঞাত থাকে সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎ গবেষণার নির্দেশ করা হয়। প্রতিবেদনের **শেষ পর্বে** পরিশিষ্ট, গ্রন্থপঞ্জী, অনুক্রমনী (index) ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। যদিও গবেষণার বিভিন্ন ধরণ দেখা যায় তবুও সবধরনের গবেষণাপত্রে বা মূল কাঠামো প্রায় একই ধরনের হয়। প্রতিবেদনের মূল সাতটি অংশ নিচে উল্লেখ করা হল।

(i) গবেষণামূলক সমস্যা নির্দেশ (Stating the research problem): গবেষণাপত্রের প্রথম অংশে গবেষণামূলক সমস্যাটি ও গবেষণার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। এর থেকে গবেষণা চালানোর দিক্‌নির্দশ পাওয়া যায়। গবেষণা-নক্‌শা, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ ঐ গবেষণা-সমস্যা সূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে।

(ii) মুদ্রিত রচনার সমীক্ষা (Survey of Literature): গবেষণামূলক সমস্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অতীত পর্যবেক্ষণ, ধারণা এবং সমীক্ষা সূত্রে গবেষণামূলক সমস্যা স্থির করা হয়। তাই গবেষণামূলক সমস্যা উল্লেখের সাথে সাথে এর পশ্চাৎপট হিসাবে অতীত গবেষণার ফলাফল উল্লেখ করতে হয়। এর থেকে গবেষণার সমস্যা সম্বন্ধে অতীতে কি কাজ হয়েছে এবং কি অগ্রগতি ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ গবেষণা সমস্যা কতটা জানা আছে এবং কতটা অজানা আছে এই অংশে নির্দেশিত হয়। আর এজন্য বিভিন্ন মুদ্রিত রচনা যেমন বিষয়ভিত্তিক বই, প্রবন্ধ, গবেষণাপত্র, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সমীক্ষা করতে হয়। এই অংশে ঐ বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্বন্ধেও উল্লেখ করতে হয়। এরফলে সাধারণভাবে নির্দেশিত গবেষণার দিক্‌নির্দেশ পাওয়া যায়।

(iii) প্রকল্প তৈরী (Making of hypothesis): এই পর্বে গবেষণামূলক সমস্যা বিশেষভাবে নির্ধারণ করা হয়। এই বিশেষ সমস্যা এক বা একাধিক প্রশ্নের আকারে লেখা হয় এবং এদের পরীক্ষামূলক উত্তরও প্রস্তাবিত করা হয়। এই পরীক্ষামূলক উত্তরগুলিই গবেষণার প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত হয়। এই পর্বে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণা বা চলকের স্পষ্টীকরণ এবং সিদ্ধতার বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়।

(iv) গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কীত নির্দেশ (Methods of research): এই পর্বে গবেষণা সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ একক মনোনয়ন অর্থাৎ যে জনসমষ্টির উপর গবেষণা চালানো হয় তাদের বিবরণ দেওয়া হয়। পরবর্তী পর্যায়ে নমুনাচয়নের (sampling) বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ কোন পদ্ধতির সাহায্যে জনসমষ্টি থেকে নমুনা তৈরী করা হবে, নমুনাগত ত্রুটি ও নমুনাবহির্ভূত ত্রুটি কিভাবে দূর করা হবে, কোন্ পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাপত্রের এই অংশে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং তথ্য সংগ্রহ তথ্য, প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই এই পর্বে উল্লেখ করা হয়। এই পর্ব থেকে কিভাবে গবেষণা চালানো হয়েছে সে বিষয়ে পাঠক অবহিত হতে পারে।

(v) প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন (Presentation of findings): এই পর্বে সংগৃহীত তথ্য পাঠকের বোধগম্য করার উদ্ধেশ্যে গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়। সাধারণত: সংক্ষিপ্ত আকারে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এর অর্থ হল অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় তথ্য পরিহার করে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক মূল তথ্যাবলী উপস্থাপন করা। একারণে প্রতিবেদনে পরিসংখ্যা বন্টন সারণী, কেন্দ্রীয় প্রবণতা, বিস্তৃতি, লেখচিত্র, সম্পর্কের সহগাঙ্ক ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। এছাড়াও প্রকল্প পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে তথ্যাবলী সংক্ষিপ্ত ও যথার্থভাবে উপস্থাপন করা হয়।

(vi) **বিশ্লেষণমূলক আলোচনা (Analytical discussion):** এই পর্বে মূলত: তথ্যভিত্তিক আলোচনার উল্লেখ থাকে এবং আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হয়। গবেষণার বিষয় বা প্রশ্নের মূল দিকগুলি ও প্রকল্পের প্রস্তাবনা সম্পর্কীত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়। প্রকল্প যদি প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে সম্পর্কিত না হয় তাহলে তার কারণ এই অংশে উল্লেখ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে মূল তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে প্রকল্পের ব্যর্থতা অন্বিত করে তত্ত্ব কাঠামোর যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। আবার কোনো কোনো সময় গবেষণার সিধান্তকে অপর কোনো গবেষণার তথ্যের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়, যেমন—কোন্ তথ্য বা পদ্ধতি পরবর্তীকালে গবেষণার সহায়ক হতে পারে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে সংবাদ পরিবেশন ও বিশ্লেষণমুখী আলোচনা একই সাথে চলতে থাকে।

(vii) উপসংহার (Conclusion): এটিই গবেষণাপত্র বা প্রতিবেদনের শেষ অংশ। এই অংশে প্রতিবেদনে উল্লিখিত সব কয়টি অংশের সার সংক্ষেপে লিখতে হয়।

নিউম্যান (Neuman) বলেছেন "Its purpose is to summarize the report and it is sometimes titled "summary" উপসংহারের পর সূত্র নির্দেশ (references) এবং পরিশিষ্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেসব গ্রন্থ পত্র-পত্রিকা প্রতিবেদনে, উল্লেখ করা হয় সেগুলির সম্যক বিবরণ এই সূত্র নির্দেশপর্বে এবং পরিশিষ্টে গবেষণা প্রশ্নমালা, পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সারণী ও সংবাদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অনুশীলনী :

০১। গবেষণার প্রতিবেদন তৈরীর মূল কাঠামোটি ব্যাখ্যা করুন।

গ্রন্থপঞ্জি :

০১। সামাজিক গবেষণা—পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

অধ্যাপক কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়

০২। Research Methods

Ram Ahuja

০৩। Sociology

C.N. Shankar Rao

খ বিভাগ ❑ রাশিবিজ্ঞান (Statistics)

একক : ২ রাশিবিজ্ঞান বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচিত

২.১ সংজ্ঞা, গুরুত্ব, পরিধি ও সীমাবদ্ধতা।
পরিসংখ্যান ও পরিসংখ্যান প্রয়োগবিধির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার।
রাশিতথ্যের বিভিন্ন ধরন, উৎস ও সংগ্রহের পদ্ধতি।

২.২ একচলক বিশিষ্ট উপাত্তের বিশ্লেষণ।

২.৩ দ্বিচলক রাশিতথ্যের বিশ্লেষণ।

২.৪ সমগ্রক থেকে নমুনাচয়ন।

২.৫ নমুনাচয়ন পদ্ধতি।

২.৬ পরিসংখ্যানগত অনুমানসমূহের পরীক্ষা।

রাশিবিজ্ঞান
(Statistics)

২.১ ভূমিকা (Introduction)

(ক) সংজ্ঞা (Definition) : ঊনবিংশ শতকে 'Statistics' কথাটি তথ্যের সুবিন্যস্ত সঙ্কলন হিসাবে গণ্য করা হত। তথ্য বলতে যে শুধুমাত্র সংখ্যামূলক (numerical) তথ্য বুঝাত তা নয়—রাষ্ট্র বা তার জনগণ সম্পর্কে যে কোন ধরণের তথ্যের সঙ্কলন অর্থে 'Statistics' কথাটি ব্যবহার করা হত। অষ্টাদশ শতকের মধ্য ভাগ নাগাদ জার্মান পণ্ডিত গট্‌ফ্রায়েড এচেনওয়াল (Gottfried Achenwall) 'Statistics' শব্দটি প্রথম ব্যবহারে নিয়ে আসেন। 'State' শব্দটি থেকে 'Statistics শব্দটি উদ্ভূত হয়, প্রধানত: রাষ্ট্রীয় প্রশাসন সম্পর্কিত পরিমাণগত তথ্যের সঙ্কলন অর্থে 'Statistics' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়।

বর্তমানে 'Statistics' হল বহুল প্রচলিত শব্দ। রাশিবিজ্ঞান বা 'Statistics' বলতে বোঝায় রাশিতথ্যের সঙ্কলন, সেগুলির পরিমাপ (measurement), শ্রেণীবিন্যাস (classification), ছকবিন্যাস (tabbulation) বিশ্লেষণ (analysis) ইত্যাদি। সুতরাং সংজ্ঞার ভাষায় উল্লেখ করা যায় যে—কোন বিষয়ে পর্যবেক্ষণের ভিত্তি মাধ্যমে রাশিতথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি হতে তুলনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্য প্রভৃতির দ্বারা

তত্ত্ব নির্ণয়ের বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র হল রাশিবিজ্ঞান (Statistics) অতএব রাশিতথ্যের সঙ্কলন (collection of data), সেগুলির পরিমাপ (measurement), ছকবিন্যাস, বিশ্লেষণ (analysis) এবং তাৎপর্য নির্ণয় (interpretation) হল রাশিবিজ্ঞান অঙ্গ।

Statistics শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, একটি হল বহুবাচনিক অর্থ (plural sense) এবং অপরটি হল এক বাচনিক অর্থ (singular sense)। বহুবাচনিক অর্থে Statistics বলতে মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের যে কোন ক্ষেত্র সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত তথ্যাবলীকে বোঝায়। যেমন কোন ফার্মের বিভিন্ন বছরে উৎপাদনের পরিমান বিষয়ক পরিসংখ্যান, মূল্যস্তরের পরিসংখ্যান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পরিসংখ্যান ইত্যাদি। সুতরাং Statistics শব্দটির বহুবাচনিক অর্থ হল পরিসংখ্যান—অর্থাৎ পরিমাপ বা গণনা প্রসূত এক রাশিমালা। এক বাচনিক অর্থে Statistics হল বিজ্ঞানসম্মত ক্রিয়াকলাপের এমন এক বিষয় যেখানে রাশিতথ্য সংগ্রহ ও সেগুলির উপস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় সংক্রান্ত তত্ত্বাদি ও পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হল। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীবন বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা প্রভৃতির ন্যায় রাশিবিজ্ঞান কিন্তু বিজ্ঞানের এক স্বতন্ত্র শাখা নয়, এ হল গণিতের ন্যায় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিসমূহ বা হাতিয়ারগুলির সমষ্টি। বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কলা, প্রভৃতির সব শাখায় যেখানে পরিমাপ ও গণনা সম্ভব সেখানে পরিংখ্যানগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হয়। যাইহোক, Statistics বলতে সাধারণভাবে রাশিবিষয়ক তথ্যাদির সংগ্রহ থেকে শুরু করে যাবতীয় পদ্ধতিগত বিচার বিশ্লেষণকে বোঝায়।

(খ) গুরুত্ব (Importance) : নানাদিক থেকে Statistics-এর গুরুত্ব উপলব্ধী করা যায়। এর প্রয়োগের ক্ষেত্র হল বহু এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। লেখচিত্র (diagram), বিভিন্ন ধরনের গড় (different averages), বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপ প্রভৃতি পরিসংখ্যানগত কৌশলের সাহায্যে জটিল উপাত্তের (complex data) তাৎপর্য প্রকাশ করা যায়। উপাত্তের কালক্রমানুসারী ও ভৌগলিক তুলনা করার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি একান্তই অপরিহার্য। বিবিধ প্রকল্পে রচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে এবং গবেষণা বা অনুসন্ধানের যথাযথ রূপরেখা তেরীর ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষরূপে উপযোগী হয়ে ওঠে। ভৌতবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রগুলি পরীক্ষার জন্যও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল ও পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক হয়। রাশিবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নীতি বা প্রণালীগুলি দেশের প্রশাসনিক স্তরে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আধুনিক কমপিউটারের যুগে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগ ও গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) পরিধি (Scope) : পরিসংখ্যান শাস্ত্রের (Statistics) পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞানের প্রায় সব শাখায় পরিসংখ্যানের প্রয়োগ করা হয়। বাণিজ্যশাখা অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদিতে পরিসংখ্যানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। বস্তুত: আলোচনার যে শাখায় সংখ্যাগত উপাদানের (numerical element) ব্যবহার থাকে সেই শাখায় পরিসংখ্যানগত কলা-কৌশল প্রয়োগ করা হয়।

রাশিতথ্য সঙ্কলন (collection of data), শ্রেণীবিন্যাসের (classification) বা ছকবিন্যাসের (Tabulation) মাধ্যমে রাশিতথ্যের বিন্যাস (treatment), তথ্য বিশ্লেষণ (analysis of data), তাৎপর্য নির্ণয় (interpretation) প্রভৃতি পরিসংখ্যানগত ক্রিয়া কর্ম (activities) ও তদসম্পর্কিত পদ্ধতি ও কলাকৌশল কার্যত: পরিসংখ্যান শাস্ত্রের পরিধিভূক্ত। গণিতশাস্ত্রের বিবিধ বিষয়ও এর অন্তর্ভূক্ত। পরিসংখ্যান প্রয়োগ বিধির (Statistical methods) ধারণা বহুলাংশে গণিতের বিবিধ বিষয় নির্ভর।

(ঘ) সীমাবদ্ধতা (Limitations) : পরিসংখ্যান ব্যবহারের ক্ষেত্র অসংখ্য হলেও এর কিছু গুরুতর সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়:

1. পরিসংখ্যান বিদ্যা কেবলমাত্র সংখ্যামূলক তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। যেসব বিষয় সংখ্যাগতভাবে প্রকাশযোগ্য নয় সেসব বিষয়ের বিশ্লেষণে তা প্রয়োগ করা যায় না।

2. পরিসংখ্যান সমষ্টির বিজ্ঞান—ব্যষ্টির নয়। সুতরাং ব্যক্তিগত বিষয়গুলি নয়; শুধুমাত্র সমষ্টিগত বিষয়গুলির বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান বিদ্যা প্রয়োগ করা চলে।

3. সংগৃহীত উপাত্তের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথভাবে পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি অনুসরণ না করা হলে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এভাবে রাজনৈতিক নেতারা, ব্যবসায়ীগোষ্ঠী প্রভৃতীকে অনেক সময় পরিসংখ্যানের ভ্রান্ত ব্যবহার দ্বারা জনগণকে বিভ্রান্ত করতে দেখা যায়।

4. পরিসংখ্যানগত উপাত্ত সর্বাবস্থায় সমান বা একরূপ (uniform) হওয়া প্রয়োজন।

(ঙ) পরিসংখ্যান ও পরিসংখ্যান প্রয়োগ বিধির উদ্দেশ্য ও ব্যবহার (Objects and Utility of Statistics and Statistical Methods): রাশিতথ্যমালা (numerical data) যাতে সহজে বোধগম্য হয় সেইভাবে উপস্থাপিত বা প্রাকাশ করাই পরিসংখ্যানের (statistics) প্রধান উদ্দেশ্য। অবিন্যস্ত ও অসংলগ্ন তথ্যসমূহ অনেক সময় বোধ্যগম্য হয় না, ফলতঃ সেগুলি কোন কাজে আসে না। পরিসংখ্যান প্রয়োগবিধির মাধ্যমে রাশিতথ্যসমূহকে সুবিন্যস্ত করা হয় এবং অন্যান্য একই ধরনের তথ্যমালার সঙ্গে যাতে সহজে তুলনা করা যায় সেইভাবে উপস্থাপিত করা হয়।

সরকারি স্তরে বহুবিধ বিষয়ে পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করতে হয় উদাহরণ স্বরূপ যোজনা রচনার ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিতে কি পরিমাণ উৎপাদন হচ্ছে সেই বিষয়ে পরিসংখ্যানগত তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। বেকার সমস্যার সুচারু সমাধানের জন্য দেশে বেকারের সংখ্যা কত তা জানা অত্যন্ত জরুরী।

বেসরকারী ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যানের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ী শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেরই প্রতি পদক্ষেপে পরিসংখ্যান ও এর প্রয়োগবিধির উপর নির্ভর করতে হয়।

সাধারণভাবে একজন পরিসংখ্যানবিদের (statistician) কাজকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

1. উপাত্ত বা রাশিতথ্য সংকলন (collection of data)

2. তথ্যবিন্যাস (Treatment)–যেমন শ্রেণীবিন্যাস (classification), ছকবিন্যাস (tabulation),লেখ বা চিত্রাবলী (graphs on charts and pictures)

3. তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of the data)

4. তাৎপর্য নির্ণয় (Interpretation)

(চ) রাশিতথ্যের বিভিন্ন ধরন এবং উৎস (Types and Sources of data): উপাত্ত বা রাশিতথ্য সংগ্রহের উৎস অনুসারে উপাত্তের দুটি ধরন বা ধাপ উল্লেখ করা যায় : **(এক)** প্রাথমিক উপাত্ত বা রাশিতথ্য (Primary data) এবং **(দুই)** মাধ্যমিক উপাত্ত বা রাশিতথ্য (Secondary data)।

প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data) : বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান ক্ষেত্র থেকে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য রাশি হল প্রাথমিক উপাত্ত। ফলত: প্রাথমিক তথ্য রাশি হল প্রকৃতিগতভাবে মৌলিক। যেমন একজন ডাক্তার তার রোগীদের ওজনের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারে সরাসরি একটি ওজন মেশিনের সাহায্যে। এধরনের তথ্য রাশি হল প্রাথমিক তথ্য রাশি। অথবা আদমশুমারির (Population census) সময় সরাসরি তথ্য রাশি বা উপাত্ত সংগৃহীত হয়। এরূপ তথ্যরাশি হল প্রাথমিক তথ্যরাশি। প্রাথমিক রাশি তথ্যের উ২র অধিকতর আস্থা রাখা যায়, তবে প্রাথমিক রাশি তথ্য সংগ্রহের জন্য অধিকতর মাত্রায় অর্থ, শ্রম-শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়।

মাধ্যমিক উপাত্ত (Secondary data) : যেসব তথ্য রাশি পূর্বে কোন সংস্থা (Agency) দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে এবং পরে অন্য কোন বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী যখন ঐ তথ্যরাশিগুলি ব্যবহার করছে তখন সেগুলিকে মাধ্যমিক উপাত্ত বা মাধ্যমিক তথ্যরাশি বলে অভিহিত করা হয়। অন্যভাবে উল্লেখ করা যায় যে একজনের সংগৃহীত উপাত্ত যখন অন্যজন ব্যবহার করছে বা এক উদ্দেশ্যে সংগৃহীত উপাত্ত যখন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে তখন তা মাধ্যমিক উপাত্ত হিসাবে গণ্য হয়। মাধ্যমিক উপাত্ত কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে মৌলিক উপাত্ত নয়।

আদমশুমারি সমীক্ষা (census report) থেকে সংগৃহীত উপাত্ত যখন একজন অনুসন্ধানকারী ব্যবহার করছে তখন সেই উপাত্ত অনুসন্ধানকারীর নিকট মাধ্যমিক উপাত্তে পরিণত হচ্ছে। মাধ্যমিক উপাত্ত সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সস্তা যেহেতু এরজন্য অপেক্ষিকভাবে কম অর্থ, শ্রম-শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়।

উৎস থেকে নকল করা বা মোটামুটি আকারে (transcription or rounding) সংগ্রহ করার জন্য মাধ্যমিক উপাত্তের ক্ষেত্রে কিছুটা ভ্রান্তি (error) থেকে যায় এবং মাধ্যমিক উপাত্ত আপেক্ষিকভাবে কম নির্ভরযোগ্য হয়। সুতরাং মাধ্যমিক উপাত্তের ব্যবহার বিষয়ে সার্বিক অবলম্বন করা আবশ্যক। উপরোক্ত আলোচনা থেকে উল্লেখ করা যায় যে একজনের কাছে যে উপাত্ত হল প্রাথমিক উপাত্ত সেই উপাত্ত

অন্যজনের কাছে হল মাধ্যমিক উপাত্ত। উদাহরণ স্বরূপ ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক প্রকাশিত আদমশুমারির তথ্যরাশি হল প্রাথমিক উপাত্ত এবং অন্য পুস্তকে প্রকাশিত সেই একই তথ্যরাশি হচ্ছে মাধ্যমিক উপাত্ত।

অনেক সময় উপাত্তের উৎসগুলিকেও দু ভাগে ভাগ করা যায়: **প্রাথমিক উৎস** এবং **মাধ্যমিক উৎস**। যে কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানক্ষেত্র থেকে সরাসরি উপাত্ত সংগ্রহ করে তা হল প্রাথমিক উৎস। আবার অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যারা প্রাথমিক উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে অন্যত্র ব্যবহার করে তা হল মাধ্যমিক উৎস।

পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাত্ত সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়; অবশ্য অর্থ ও সীমাবদ্ধতা থাকার দরুন মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহার করা হয়। সুতরাং মাধ্যমিক উপাত্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রুটি এড়ানোর জন্য যথাযথ সতকর্তা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক উপাত্তের উৎস হিসাবে কয়েকটি প্রকাশনা (Publication) উল্লেখ করা যায়।

1. ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্তৃক আদমশুমারির রাশিতথ্যের প্রকাশনা,

2. ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক, বোম্বাই কর্তৃক প্রকাশিত "ভারতের রিজার্ভ ব্যাংকের মাসিক প্রতিবেদন (Reserve Bank of India Bulletin),

3. ভারতের খনি বিষয়ক মুখ্য পরিদর্শকের অফিস, ধানবাদ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন (Annual Report of the Chief Inspector of Mines in India)

4. বোম্বাই-এর টেক্সটাইল কমিশনার কর্তৃক প্রকাশিত 'ভারতীয় বয়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন' (Indian Textile Bulletin)

5. ধানবাদের খনি বিষয়ক মুখ্য পরিদর্শকের মাসিক কয়লা সংক্রান্ত প্রতিবেদন (Monthly Coal Bulletin). ইত্যাদি।

মাধ্যমিক উপাত্তের উৎস হিসাবে কয়েকটি প্রকাশনা উল্লেখ করা যায়।

1. কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানগত সংস্থা (Central Statistical Organisation–C.S.O.), নতুন দিল্লী কর্তৃক বার্ষিক প্রকাশিত 'ভারতীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যানগত সারাংশ' (Statistical Abstruct of the Indian Union),
2. C.S.O. কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসিক পরিসংখ্যানগত সারাংশ' (Monthly Abstruct of Statistics),
3. দেশী-বিদেশী সরকার, পৌরসভা, রাষ্ট্রসংঘ (U,N.O) প্রভৃতি কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও পুস্তকাদি,

4. বিভিন্ন চেম্বার অফ কমার্স (Chambers of Commerce), বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্টক্ এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) ইত্যাদি,

5. পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সমীক্ষা,

6. পুস্তকাদি, বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকাসমূহ, দৈনিক সংবাদপত্রাদি,

7. বিভিন্ন পরিসংখ্যায়ক প্রকাশিত রিপোর্ট,

8. বিভিন্ন কমিটি ও অনুসন্ধান কমিসনের রিপোর্টসমূহ।

(ছ) উপাত্ত বা রাশিতথ্য সংগ্রহের (Methods of collection of data) : পরিসংখ্যান সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের পূর্বে উপাত্ত বা রাশিতথ্য সংগ্রহ হল প্রাথমিক কাজ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বহুল প্রচলিত শব্দ (term)—যেমন প্রশ্নমালা (Questionnaire), তালিকা (Schedule) ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

A. প্রশ্নমালা (Questionnaire) : প্রশ্নমালা বলতে অনুসন্ধানের বিষয়ে কতকগুলি সুসম্বদ্ধভাবে বিন্যস্ত প্রশ্নাবলী বোঝায়। প্রশ্নাবলী যথাযথ সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে রচনা করা আবশ্যক যাতে প্রয়োজনীয় রাশিতথ্যসমূহ সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। নিরীক্ষণের প্রথম পর্যায়ে সাধারণত: একটি খসড়া প্রশ্নমালা রচনা করে পরীক্ষামূলকভাবে এক দল মানুষের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালা তৈরীর ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অনুসন্ধানের জন্য কার্যত: খসড়া প্রশ্নমালা এভাবে পরীক্ষা করা হয়। খসড়া প্রশ্নমালার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি অনুধাবন করে তার পরিমার্জনা করা হয়। একটি উত্তম প্রশ্নমালার (Questionnaire) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই থাকবে।

1. প্রশ্নমালার প্রশ্নগুলি অনুসন্ধানের বিষয়ের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবে এবং অতি সহজ ভাষায় রচিত হবে।

2. প্রশ্নের সংখ্যা সীমিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা উত্তরদাতারা সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিষয়ে উৎসাহ হারাবে।

3. প্রশ্নগুলি অর্থগতভাবে সন্দেহজনক হবে না।

4. তথ্যদানকারিদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা দানের জন্য অধিকাংশ প্রশ্ন বহু পছন্দ ধরনের (multiple choice type) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

5. উত্তরাদাতাদের অহংবোধে বা ভাবাবেগে আঘাত দিতে পারে এমন ধরনের প্রশ্ন পরিহার করা আবশ্যক।

B তালিকা (Schedule) : এই প্রসঙ্গে তালিকা বলতে বোঝায় যে যে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তার ফর্দ। এই তালিকায় কিন্তু প্রশ্নমালা রচনা করা বা প্রশ্ন করা বা ইপ্সিত তথ্য প্রকাশ করার বিষয়ে উল্লেখ থাকে না। এই কাজগুলি অনুসন্ধানকারীর উপর ন্যস্ত হয়।

উপাত্ত বা রাশিতথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা যেতে পারে; রাশিতথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সাধারণত: অনুসরণ করা হয়:

1. পরস্পর সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউ পদ্ধতি (Interview method)

2. ডাকের সাহায্যে প্রশ্নমালা প্রেরণভিত্তিক পদ্ধতি (Mail questionnaire method)

3. প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Direct personal observation method)

4. পরোক্ষ মৌখিক তদন্ত পদ্ধতি (Indirect oral investigation method)

এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে প্রথম এককে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেজন্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

1. ইন্টারভিউ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ তদন্তকারীদের সাহায্যে ইপ্সিত রাশিতথ্য সরাসরি তদন্তক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। তদন্তকারীরা সাধারণত: অনুসন্ধায়ক বা এনুমারেটার (Enumerator) বা ফিল্ডস্টাফ (Field stuff) নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক অনুসন্ধ্যায়ক বিশেষভাবে তৈরী একটি প্রশ্নমালা/তালিকাসহ তার জন্য নির্ধারিত এলাকায় উপস্থিত হয় এবং সেই এলাকার মানুষজনের সঙ্গে পারস্পরিক সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক রাশিতথ্যসমূহ সংগ্রহ করে। এলাকায় উপস্থিত হয়ে তথ্য প্রদানকারীদের তদন্তের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতে হয় এবং ইন্টারভিউ-এর ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর প্রদত্ত উত্তরগুলি যত্নসহকারে নথিভুক্ত করে নিতে হয়। এইভাবে তদন্তকারী নিয়োগের মাধ্যমে রাশিতথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সন্তোষজনক ফলদায়ী বলে গণ্য হয়।

2 ডাকের মাধ্যমে প্রশ্নমালা প্রেরণভিত্তিক পদ্ধতি : প্রশ্নমালা হল এই পদ্ধতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অনসন্ধানের বিষয় সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। এই প্রশ্নাবলীর উত্তর থেকে প্রয়োজনীয় রাশিতথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। নির্বাচিত তথ্যদাতাদের নিকট ডাক মারফৎ মূদ্রিত প্রশ্নমালা এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে ফেরৎ পাঠানর অনুরোধপত্র পাঠান হয়। একই সঙ্গে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং প্রশ্নমালা সম্বলিত ফর্ম পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কে অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য গোপন রাখা হবে বলেও সাধারণত: নিশ্চিত করা হয়। এই পদ্ধতি দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা; সীমিত ব্যয়ে বৃহত্তম এলাকা থেকে রাশিতথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই পদ্ধতির দুটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হল : **(এক)** এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত রাশিতথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতার মাত্রা স্বল্প হয় এবং **(দুই)** বহুসংখ্যক প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর আসে না।

3. প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি অনুসন্ধান-ক্ষেত্র থেকে পর্যবেক্ষণ, গণনা ও পরিমাপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রাশিতথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী রাশিতথ্য সংগ্রহের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত রাশিতথ্যসমূহ বহুলাংশে নির্ভরযোগ্য হয়। অবশ্য রাশিতথ্যসমূহের কার্যত বিশুদ্ধতা অনুসন্ধানকারীর সততা, আন্তরিকতা ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহের কয়েকটি সুবিধা আছে। **(এক)** এই পদ্ধতে অকৃত্রিম উপাত্ত সংগ্রহ করা যায়। **(দুই)** তথ্যদাতাদের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি বিচ্যুতির উদ্ভব হয় তা এই পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধাও দেখা দেয়: **(এক)** এই পদ্ধতি হল অত্যন্ত ব্যয়বহুল পদ্ধতি **(দুই)** অনুসন্ধানকারী বিশেষ পারদর্শী ও সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রতি আন্তরিক না হলে এই পদ্ধতিতে সঠিক উপাত্ত দানে ব্যার্থ হতে পারে। **(তিন)** অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বিশাল হলে এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয় না।

4. পরোক্ষ মৌখিত তদন্ত পদ্ধতি : প্রয়োজনীয় উপাত্ত কিছু পরোক্ষ সূত্র থেকে সংগ্রহ করা হয়। পারিপার্শ্বিক সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষদের নির্বাচিত করা হয় এবং তাদের প্রশ্ন করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তদন্ত কমিশনসমূহ এবং সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলি বহুলাংশে এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক উপাত্ত সংগহ করে থাকে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখনীয় যে এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত উপাত্তের যথার্থতা নির্ভর করে তথ্য সরবরাহকারীদের পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গীর উপর এবং তদন্তকারীদের সততার উপর।

পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিগুলি ছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত এজেন্ট বা যোগাযোগকারীগণ প্রয়োজনীয় উপাত্ত (data) সংগ্রহ করে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করে। যেসব ক্ষেত্রে নিয়মিত তথ্যের প্রয়োজন হয় সেই সব ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতিতে রাশিতথ্য মালা সংগ্রহ করা হয়; বিশেষথ: মিডিয়া ক্ষেত্র (Media Sector) এই কৌশল অবিলম্বন করে থাকে।

অনুশীলনী

1. 'Statistics' সাধারণত: যে দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।
2. 'Statistics'-এর বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ করুন।
3. রাশিতথ্যের বিভিন্ন ধরন ও উৎস সম্পর্কে আলোচনা করুন।
4. রাশিতথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

২.২ এক চলক বিশিষ্ট উপাত্তের বিশ্লেষণ (Analysis of Univariate Data)

'ইউনিভেরিয়েট ডাটা' বলতে এক চলক সম্পন্ন রাশিতথ্য মালাকে বোঝায়। এক চলক উপাত্তের বিশ্লেষণে একটি মাত্র চলকের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। তথ্যের কতকগুলি প্রকৃতিকে (characteristic) সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এরূপ এক একটি প্রকৃতি হল এক একটি চলক (Variate) যেমন বয়স, উচ্চতা, ওজন, কোন গ্রামে, শিশুর সংখ্যা ইত্যাদি। কোন একটি চলকের অনেকগুলি মান যদি এলোপাথাড়িভাবে (hapahazaradly) বা অবিন্যস্তভাবে থাকে তাহলে ঐ মানগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাৎপর্যবিশ্লেষণ করা বা তুলনা করা যায় না। যেমন বিভিন্ন বছরে কলিকাতা, মুম্বাই ও চেন্নাই—এই তিনটি নগরে (City) শিশুমৃত্যুর হার যদি এলোপাথাড়িভাবে উল্লিখিত হয় তাহলে তথ্যরাশিগুলি নিছক পর্যবেক্ষণ করে কোথায় শিশু মৃত্যুর হার সর্বাধিক বা কোথায় তা সর্বনিম্ন তা অনুধারণ করা যায় না। সুতরাং রাশিতথ্যসমূহ সুবিন্যস্তভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করা আবশ্যক।

(ক) উপাত্তের বা রাশিতথ্যমালার সারিকরণ বা বিন্যাস (Summarisation or Treatment of data) : উপাত্ত বা রাশিতথ্যমালা সংগ্রহের পর এর সারিকরণ হল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিভিন্নভাবে রাশিতথ্যমালা সারিকরণ বা সুবিন্যস্ত করা যায়। রাশিতথ্যমালা সারিকরণের জন্য নিম্নলিখিত কৌশলগুলি অবলম্বন করা হয়।

1. শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Classification)
2. ছক বিন্যাসকরণ (Tabulation)
3. লেখ বা চিত্রাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপনা (Representation in terms of Graph or Charts and diagram.)

(খ) রাশিতথ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Classification of data) : এ হল পরিসংখ্যান প্রয়োগবিধির প্রধান অঙ্গবিশেষ। সাধারণভাবে শ্রেণীবিন্যাসকরণ বলতে বোঝায় একসারি রাশিতথ্যকে তাৎপর্য নির্ণয়ের সুবিধার্থে কতকগুলি শ্রেণীতে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যাতে প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্গত তথ্যগুলির মধ্যে কোন না কোন প্রকার পারস্পরিক সাদৃশ থাকে। উদাহরণ স্বরূপ পোষ্ট অপিসে চিঠি বিলি করার পূর্বে পাড়া অনুযায়ী চিঠিগুলিকে বিভিন্ন কোপে সাজানোর পদ্ধতিটি উল্লেখ করা যেতে পারে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য অনুসারে রাশিতথ্যের এরূপ সারীকরণকে শ্রেণীবিন্যাসকরণ বলা হয়। বিন্যস্ত প্রতিটি শ্রেণীর তথ্যসমূহের মধ্যে কোনোও এক সম্পর্কে পারস্পরিক সাদৃশ থাকা দরকার—যেমন ডাক ঘরের প্রতিটি খোপের চিঠিগুলির মধ্যে সাদৃশ হল এই যে খোপভুক্ত প্রতিটি চিঠির প্রাপক একই পাড়ার লোক।

(গ) বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীবিন্যাস (Different types of Classification) : সাধারণত: চার ধরনের শ্রেণীবিন্যাসের প্রচলন দেখা যায়:

(a) গুণগত (Qualitative) : গুণগত শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে রাশিতথ্যগুলিকে বিশেষ কোন গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কোন শহরের জনসংখ্যাকে বৃত্তি (profession) অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(b) পরিমানগত (Quantitative) : পরিমানগত শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে রাশিতথ্যগুলিকে ওদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাগত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কোন একটি শহরের জনসাধারনকে বয়স, ওজন বা আয়ের ভিত্তিতে ভাগ করার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

(c) কালীন (Chronological or Temporal) : সময়ের ভিত্তিতে রাশিতথ্যসমূহের শ্রেণীবিভাগ হল কালীন শ্রেণীবিভাগ। উদাহরণ স্বরূপ প্রতি বছর কোন এক শহরে শিশুমৃত্যুর হিসাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সময়ের ভিত্তিতে বিন্যস্ত রাশিমালাকে কালীন সারি (Time series) বলা হয়। অর্থৎ বিভিন্ন সময়ে কোন একটি চলকের পরিলক্ষিত মানের সারি হল কালীন সারি।

(d) ভৌগোলিক (Geogrphical or Spatial) : ভৌগোলিক বিন্যাস (Geographical distribution) অনুযায়ী রাশিতথ্যসমূহের বিন্যস হল ভৌগোলিক শ্রেণীবিন্যাস। উদাহরণ স্বরূপ, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিকে উৎপন্ন সমের পরিমাণ অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস করার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কালীন অথবা ভৌগোলিক শ্রেণীবিন্যাস কার্যত: গুণগত শ্রেণীবিভাগেরই প্রকারভেদ; যদিও এই দুই ধরণের শ্রেণীবিন্যাসকে সাধারণত: পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।

রাশিতথ্যের এক স্বতন্ত্র ধরনের প্রকাশভঙ্গীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে; এ হল **বিবরণমূলক প্রকাশ** (Textual Presentation)। অনেক সময় রাশিতথ্যগুলিকে বিবরণমূলকভাবে প্রকাশ করা হয়। অফিসের রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে যেখানে কার্যক্রম বা পরিকল্পনা বিভিন্ন রাশিতথ্যসহ বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, এরূপ বিবরণী প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখককে প্রকাশের বিষয়ে সচ্ছতা ও যুক্তিগত সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় বিবরণী সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক।

উদাহরণ : সরকারের কোন এক কার্যের বিষয়ে জনমত সমীক্ষায় 3000 জন পুরুষ এবং 2700 জন মহিলা অংশগ্রহণ করে; 2300 জনের মধ্যে কার্যত: 1560 জন পুরুষ সরকারী কার্যের বিপক্ষে

মত প্রদান করে। সব মিলিয়ে 2140 জন সরকারী কার্যের পক্ষে মত প্রদান করে এবং 450 জন মহিলা নিরপেক্ষ থাকে। এইভাবে বিবরণমূলক প্রকাশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) রাশিতথ্যসমূহের ছকবিন্যাসকরণ (Tabulation of Data): রাশিতথ্যসমূহ ছকের মাধ্যমে প্রকাশ বা রাশিতথ্যসমূহের ছকবিন্যাস হল সর্বাধিক উপযোগী প্রকাশভঙ্গী। কিছু সারি ও স্তম্ভ নিয়োগটি একটি ছক বা টেবিলের কাঠামোতে রাশিতথ্যসমূহকে পদ্ধতিমাফিকভাবে প্রকাশ করাকে ছকবিন্যাসকরণ (Tabulation) বলা হয়। রাশিতথ্যসমূহকে ছকে বিন্যাসিত করার পরই তথ্যের বিশ্লেষণ বা তাৎপর্য নির্ণয় সহজে সম্ভব হয়। ছকবিন্যাসিত তথ্যাদি সাধারণভাবে প্রদত্ত বিবরণ অপেক্ষা সুবিন্যস্ত ও সংক্ষিপ্ত হয়। ছকের মাধ্যমে রাশিতথ্যসমূহের প্রকাশনায় সারিকরণের প্রয়োজন হয় বলে ছক্‌কে আবার সারণি বলে অভিহিত করা হয়।

ছক (Table) : ছক বলতে কিছু সারি ও স্তম্ভে রাশিতথ্যসমূহের সুসমঞ্জস্য সন্নিবেশ বোঝায়। **একটি ছকে নিম্নলিখিত অংশগুলি থাকে।**

1. **ছক নাম্বার** (Table number) : প্রতিটি ছক একটি সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে সনাক্তকরণ (Identification) এবং প্রসঙ্গ উল্লেখ (reference) সহজ হয়।
2. **শিরোনাম** (Title) : ছকের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বরূপ এর একটি শিরোনাম দেওয়া হয়।
3. **ছকের বাম প্রান্তে উল্লিখিত বিবরণলিপি (Stub) :** ছকের বাম পাশে সারিগুলির বিবরণলিপি দেওয়া হয়। এই বিবরণলিপি স্টাব্ (Stub) বলে অভিহিত হয়।
4. **ছকের উপরিভাগে উল্লিখিত বিবরণলিপি (Caption):** ছকের উপরিভাগে স্তম্ভগুলির বিবরণলিপি দেওয়া হয়। এই বিবরণলিপি ক্যাপসন্ (Capsion) নামে অভিহিত হয়। এই অংশে পরিমাপের একক (যদি থাকে) এবং স্তম্ভগুলির নাম্বার অন্তর্ভুক্ত হয়।
5. **ছকের মূল অংশ (Body) :** এ হল ছকের প্রধান অংশ যেখানে রাশিতথ্যসমূহ সন্নিবেশিত থাকে।
6. **পাদটিকা (Foot note) :** বিশেষ কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ছকের শেষ প্রান্তে পাদটিকা উল্লিখিত হয়।
7. **উৎস (Source) :** ছকে সন্নিবেশিত রাশিতথ্যসমূহের উৎস স্পষ্টভাবে ছকের নিম্নে উল্লেখ করতে হয়।

নিম্নে একটি ছকের বিভিন্ন অংশ সম্বলিত নকসা (Sketch) দেওয়া হল।

সারণি / ছক নম্বর .....

শিরোনাম .....

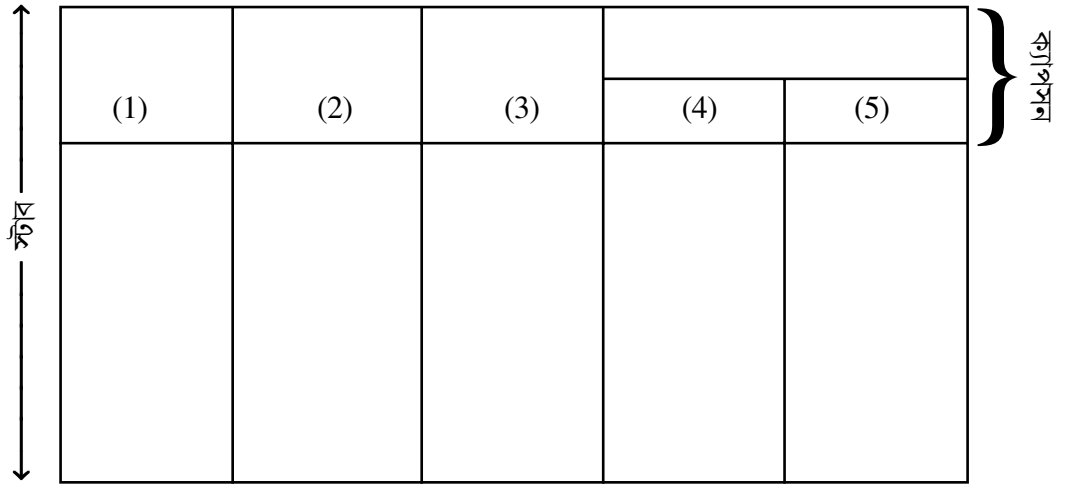

উৎস .....

পাদটিকা .....

উত্তম ছক তৈরী করা নিসন্দেহে এক বিদ্যা বিশেষ। ছক বহু রকমের হতে পারে। তবে সব ছকেরই উদ্দেশ্য হল রাশিতথ্যকে সহজে বোধগম্য করে প্রকাশ করা।

ছক যাতে জটিল না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে একটি জটিল ছককে ভেঙ্গে কয়েকটি সরল ছকে রাশিতথ্যসমূহ প্রকাশ করা যেতে পারে।

ছক তৈরী যদিও কোন অসনমনীয় নিয়ম কানুনের (rigid rule) অধীন নয়, তথাপি একটি ছকের নিম্নলিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন।

1. একটি ছক দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ছকের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যেন খুব বৈষম্য না থাকে।
2. ছকের অন্তর্ভূক্ত রাশিতথ্যসমূহ পদ্ধতি মাফিক ও যুক্তিসম্মত ক্রমে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক।
3. ছকের শিরোনামটি অর্থবোধক ও সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।
4. বিচার বিবেচনা করে ছকভূক্ত রাশিতথ্যসমূহের একক নির্বাচন করা এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

5. সাধারণত, ছকের সারিগুলিতে এবং স্তম্ভগুলিতে সন্নিবেশিত রাশিসমূহের সমষ্টি দেখান আবশ্যক।

6. সারি ও স্তম্ভের সংখ্যা অধিক হলে সেগুলিকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা উচিৎ।

7. একটি ছকে অধিক সংখ্যায় সংক্ষিপ্ত আকারের (abbreviations) ব্যবহার করা চলবে না।

8. প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যার জন্য ছকের পাদটিকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিম্নে কাল্পনিক রাশিতথ্য সম্বলিত একটি ছকের উদাহরণ দেওয়া হল—

ছক নং—1

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়

স্থূল আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষিত হার

পরিকল্পনাকাল	GDP-এর বার্ষিক বৃদ্ধির হারের ধার্য লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশে)
(1) প্রথম পরিকল্পনা (1951-'56)	2.1
(2) দ্বিতীয় পরিকল্পনা (1956-'61)	4·5
(3) তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-'66)	5·6
(4) চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-'74)	5·7
(5) পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-'79)	4·4
(6) ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-'85)	5·2
(7) সপ্তম পরিকল্পনা (1985-'90)	5·0
(8) অষ্টম পরিকল্পনা (1992-'97)	5·6
(9) নবম পরিকল্পনা (1997-'02)	6·5
(10) দশম পরিকল্পনা (2002-'07)	8·0

উৎস : Plan Documents, Govt. of India.

(ঙ) চিত্রের মাধ্যমে রাশিতথ্যসমূহের প্রকাশ (Diagramatic representation of data) : রাশিতথ্যসমূহ প্রকাশের আকর্ষণীয় ও কার্যকরী উপায় হিসাবে গ্রাফ, চার্ট ম্যাপ ও লেখচিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। চিত্রের সাহোয্যে রাশিতথ্যসমূহের কিছু বৈশিষ্ট্য সহজে ধরা যায়। যথাযথ লেখচিত্র (Diagram) নির্বাচন প্রধানত: সংগৃহীত রাশিতথ্যসমূহের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। রাশিতথ্যসমূহের এই প্রকাশভঙ্গীর কতকগুলি দোষ-গুণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

গুণ (Merits) :

1. চিত্র অতি সহজে বোধগম্য হয়।

2. জনসাধারণের নিকট পরিসংখ্যাগত তথ্য স্বল্প সময়ে পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে এ হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপায়।

3. এই পদ্ধতিতে প্রকাশিত রাশিতথ্যসমূহের কিছু বিশেষত্ব একনজরে পাওয়া যায়।

4. এই প্রকাশভঙ্গী দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলার পক্ষে উপযোগী।

5. এই পদ্ধতিতে দুটি শ্রেণীর সদৃশ রাশিতথ্যসমূহের মধ্যে সহজে তুলনা করা যায়।

ত্রুটি (Demerits) :

1. লেখচিত্রের সাহায্যে রাশিতথ্যসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রকাশিত হয় না। এর মাধ্যমে রাশিতথ্য সমূহের সাধারণ প্রকৃতিরই প্রকাশ ঘটে মাত্র।

2. এই উপায়ে তথ্য রাশিসমূহের আসন্ন মান (approximate) প্রকাশ করা যায় এবং প্রকৃত মান উপেক্ষিত হয়।

3. চিত্র অঙ্কন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

4. চিত্রের সাহায্যে কেবল সীমিত তথ্য প্রকাশ করা যায়।

(চ) পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency Distribution) : তথ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতিকে (Characteristic) সংখ্যায় প্রকাশ করা চলে। তথ্যের এক একটি প্রকৃতি হল এক একটি চলক (Variable) যথা বয়স, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি হল চলক। চলকের মানসমূহ শ্রেণী বা ছকের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়। চলকের বিভিন্ন মানযুক্ত রাশিগুলি অবিন্যস্ত থাকলে সেগুলি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং, পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করতে হলে কোন এক সারিকরণ পদ্ধতির সাহায্যে রাশিতথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা প্রয়োজন। চলকের বিভিন্ন মানগুলির সারিকরণ বা বিভাগীকরণ হল পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency distribution)। একটি চলকের বিভিন্ন মানগুলির মধ্যে একই মান একাধিক বার আসতে পারে। কোন মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ওজন সম্পর্কিত রাশিতথ্য সমূহ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা যেতে পারে যে একই ওজন সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশ কয়েকজন রয়েছে। পরিসংখ্যা বিভাজনের কোন এক শ্রেণীর (Class বা Group) অন্তর্গত রাশি বা সংখ্যাকে (অর্থাৎ চলকের এক একটি মান কতবার পাওয়া যাচ্ছে) উক্ত শ্রেণীর পরিসংখ্যা (Frequency) বলা হয়। পরিসংখ্যা বিভাজনের ছককে পরিসংখ্যা ছক (Frequency table) বলে। রাশিতথ্যের সংখ্যা অধিক হলে পরিসংখ্যা বিভাজন প্রক্রিয়া বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। প্রচুর পরিমাণ তথ্যের সারিকরণ (Summarisation) ছকের মাধ্যমে সুসম্পন্ন সম্ভব করা হয়।

নিম্নের ছকটি পরিসংখ্যা বিভাজনের একটি কাল্পনিক উদাহরণ। কোন এক শহরে 100টি বাড়ির ঘরের (room) সংখ্যা অনুযায়ী পরিসংখ্যা ছকটি প্রকাশ করা হয়েছে। যেহেতু ঘরের সংখ্যা কেবলমাত্র পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে সেহেতু এই ধরনের চলকের (ঘরের সংখ্যা) মানগুলি অবিচ্ছিন্ন (Continuous) নয়। এই ধরনের চলক হল বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variate)।

ছক নং—2

1000টি বাড়ির ঘর সংখ্যা অনুযায়ী পরিসংখ্যা বিভাজন

বাড়ির ঘরের সংখ্যা চলক (variate)	বাড়ির সংখ্যা পরিসংখ্যা (Frequency)
1	 75
2	 120
3	 175
4	 200
5	 275
6	 50
7	 35
8	 30
9	 35
10	 15
মোট	1000

(ছ) বিচ্ছিন্ন চলক ও অবিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable/variate and Continuous variable/variate) :

বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable) : যে চলক একটি প্রসারের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে তাকে বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable) বলে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংখ্যা, কোন অঞ্চলে পরিবারের আয়তন, 100 জনের মধ্যে পুরুষের অনুপাত ইত্যাদি হল বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ।

অবিচ্ছিন্ন চলক (Continuous variable) : একটি প্রসারের মধ্যে যে চলক যেকোন মান গ্রহণ করতে পারে তাকে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। ব্যক্তিদের ওজন বা উচ্চতা বিভিন্ন ব্যক্তির আয় ইত্যাদি হল অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। চলকের উদাহরণ।

(জ) গুণগত লক্ষণ (Attribute and variate/variable) : গুণগত লক্ষণ হল তথ্যের এক ধরনের প্রকৃতি (Characteristic) যা সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কোন একগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের (Individuals possessing an attribute) কিন্তু বহু সংখ্যক বিচ্ছিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। একজন গোষ্ঠীর মাতৃভাষা, ফুলের রং, শহরের হাসপাতালে জন্ম হওয়া শিশুদের লিঙ্গ (Sex) ইত্যাদি হল। আরোপিত গুণ (attribute)-এর উদাহরণ।

পক্ষান্তরে চলক হল তথ্যের এক ধরনের প্রকৃতি যা সংখ্যা বা রাশির মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য। এই ধরনের প্রকৃতিকে পরিমাণগত প্রকৃতি (Quantitative character) বলা হয় এবং এই ধরনের প্রকৃতি পরিমাপ করা বা গণনা করা যায়। কোন এক স্কুলের ছাত্রদের ওজন, বালকদের বয়স ইত্যাদি হল চলকের উদাহরণ।

(ঝ) একটি গুণগত লক্ষণ অনুসারে পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency distribution of an attribute) : কোন এক মাসে কোন এক শহরের হাসপাতালে জন্মান শিশুদের লিঙ্গ অনুসারে উল্লিখিত (কাল্পনিক) তথ্যসমূহ উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। কাল্পনিক তথ্য হল সেই হাসপাতালে 18টি স্ত্রীলিংগের শিশু এবং 22টি পুংলিঙ্গের শিশুর জন্ম হয়েছে। একটি গুণগত লক্ষণ সংশ্লিষ্ট (Pertaining to an attribute) পরিসংখ্যার ধারণা এই কাল্পনিক তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শিশুর লিঙ্গ (Sex of baby) হচ্ছে এক্ষেত্রে একটি (আরোপিত) গুণ (an attribute)। এখানে 18 সংখ্যাটি কত সংখ্যক স্ত্রীলিঙ্গের শিশুর জন্ম হয়েছে তা প্রকাশ করছে। অন্যভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 18 সংখ্যাটি গুণগত লক্ষণ সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলিঙ্গ ধরনের পরিসংখ্যা প্রকাশ করছে। অনুরূপভাবে 22 সংখ্যাটি আরোপিত গুণগত লক্ষণ অনুযায়ী পুংলিঙ্গ ধরনের পরিসংখ্যা প্রকাশ করছে। অবশ্য 18 এবং 22 সংখ্যা দুটির সমষ্টি হল মোট পরিসংখ্যা (Total frequency)।

নিম্নে সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা বিভাজনের ছকটি দেওয়া হল।

ছক নং—3

শহর হাসপাতালে জন্ম নেওয়া শিশুদের লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যা বিভাজন

লিংগ	জন্ম নেওয়া শিশুর সংখ্যা
স্ত্রীলিঙ্গ	18
পুংলিঙ্গ	22
মোট	40

উপরোক্ত ছকটিতে কিভাবে মোট পরিসংখ্যা 40 আরোপিত গুণের দুটি পর্যায়ের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে তা প্রকাশ করা হয়েছে। অনেক সময় ছকে পরিসংখ্যার বদলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা (Relative

frequency) ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গ পর্যায়ের আপেক্ষিক পরিসংখ্যা $\frac{18}{40} = 0.45$ এবং পুংলিঙ্গ পর্যায়ের আপেক্ষিক পরিসংখ্যা হল $\frac{22}{40} = 0.55$।

(ঞ) একটি চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency distribution of a variable) : একটি চলক বিভিন্ন মান গ্রহণ করতে পারে এবং একটি চলকের বিভিন্ন মান লব্ধ রাশিগুলির পরিসংখ্যা বিভাজন প্রকাশ করা যায়। একটি বিচ্ছিন্ন চলক অথবা একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের অসংখ্য মান থাকতে পারে। এরূপ একটি চলকের প্রতিটি মান অন্তর্ভুক্ত করে পরিসংখ্যা ছক (Frequency table) তৈরী করতে হলে চলকের প্রসারকে (range) কতকগুলি সসীম উপপ্রসারে (subrange) বিভক্ত করতে হয় এবং রাশিতথ্যসমূহকে উপপ্রসার অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কোন এক উপপ্রসারকে শ্রেণী (class) বলে অভিহিত করা হয়। কোন একটি শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা হল শ্রেণী পরিসংখ্যা (Class frequency)। ধরাযাক সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী কোন এক শহরের বিবিন্ন পরিবারের রাশিতথ্যগুলি সংগৃহিত হল, এক্ষেত্রে ধরাযাক সদস্য সংখ্যার প্রসারটি হল 2 থেকে 7, এরূপ বিচ্ছিন্ন চলকের ক্রমিক মানগুলি 2, 3, 4, ... 7 কার্যত ছয়টি শ্রেণী হিসাবে ধরা হয়। 2 জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা 9 হলে প্রথম শ্রেণীর পরিসংখ্যা হবে 9। অনুরূপভাবে প্রতিটি শ্রেণী ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি সন্নিবেশিত করে বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন করা যায়। নিম্নে একটি বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনজনিত ছক দেখান হল। কোন এক শহরের বিবিভন্ন পরিবারের সদস্য সংখ্যা সম্পর্কিত সংগৃহীত তথ্য নিম্নে দেওয়া হল এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্য ছকটিও প্রকাশ করাা হল—

ছক নং—4

বিভিন্ন পরিবারের সদস্য সংখ্যা

3	4	3	5	4	3	2	4	2	2
5	5	3	4	3	2	6	4	2	3
4	6	7	6	6	5	4	4	3	6
2	3	3	5	4	5	3	2	5	7
6	4	4	5	7	3	6	3	4	5
3	6	4	5	6	7	4	4	3	3
5	4	3	4	3	6	2	2	3	4
5	5	4	5	4	4	5	4	5	4
4	4	4	3	4	5	4	4	3	4

ছক নং—5

পরিবারের আয়তনের পরিসংখ্যা বিভাজন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	টালিমার্ক	পরিসংখ্যা
2	𝍸 ||||	9
3	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	20
4	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸	30
5	𝍸 𝍸 𝍸 |	17
6	𝍸 𝍸	10
7	||||	4
মোট		90

4 নং ছকে প্রদত্ত রাশিতথ্যসমূহ একে একে বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে টালিমার্কের সাহায্যে রেকর্ড করো হয়েছে। এরপর টালিমার্কগুলি গণনা করে প্রতিটি শ্রেণীর পরিসংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছে। এইভাবে ছয়টি শ্রেণী ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি দিয়ে 5 নং পরিসংখ্যা ছকটি তৈরী হয়েছে।

(ট) একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা বিভাজন (Frequency distribution incase of a continuous variable) : একটি অবিচ্ছিন্ন চলক একটি প্রসারের মধ্যে অসংখ্য মান গ্রহণ করতে পারে। স্বভাবত: চলকের প্রতিটি স্বতন্ত্র মানের জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী ধরা যায় না। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য উচ্চতা অবিচ্ছিন্ন চলক হিসাবে ব্যক্তির ধরা যেতে পারে। ধরা যাক সেন্টিমিটার এককে ব্যক্তিদের উচ্চতা হল 165.5 cm, 166.4 cm, 165.2 cm ইত্যাদি। এখানে প্রতিটি মান এক দশমিক স্থান অবধি অভ্রান্ত, বাস্তব সম্মত অর্থে কিন্তু 165.5 cm। উদাহরণ স্বরূপ 16.45 এবং 165.55 এর মধ্যে যেকোন মানের হতে পারে। এই ধরনের রাশিতথ্যসমূহকে কিছু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশের জন্য বিশেষ উপযোগী শ্রেণীবিন্যাসকরণের কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই প্রকৃতির পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরির ক্ষেত্রে কতকগুলি উপযোগী ধারণা প্রাসঙ্গিকভাবে ব্যাক্ষা করা আবশ্যক।

1. শ্রেণী সীমা (Class limits) : একটি শ্রেণীর দুটি প্রান্ত সীমার মানকে শ্রেণীসীমা বলে। শ্রেণীর বাম প্রান্তের লঘিষ্ট মানকে নিম্নতর শ্রেণীসীমা (Lower class limit) এবং ডান প্রান্তের গরিষ্ট মানকে উচ্চতর শ্রেণীসীমা (Upper class limit) বলে। অবশ্য শ্রেণী সীমাদ্বয় প্রকৃতই শ্রেণী সীমান্ত (Class boundaries) হিসাবে গণ্য হয় না।

2. শ্রেণী পরিসংখ্যা (Class frequency) : কোন শ্রেণীর অন্তর্গত রাশিকে বা চলকের মানসমূহের সংখ্যাকে ঐ শ্রেণীর পরিসংখ্যা বলা হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণে 2 জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের শ্রেণীর পরিসংখ্যা হল 9।

3. শ্রেণী অন্তর (Class internal) : একটি চলকের মানগুলির সমগ্র প্রসারকে (Range) কতকগুলি উপপ্রসারে বা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এরূপ একটি উপপ্রসারের দৈর্ঘ্য বা একটি শ্রেণীর দুটি সীমা মানের অন্তরকে শ্রেণী অন্তর বলা হয়।

4. শ্রেণী সীমান্ত (Class boundaries) : একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনে শ্রেণীগুলি যদি সমসীমাযুক্ত না হয়—অর্থাৎ একটি শ্রেণীর উর্দ্ধতর সীমা এবং পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নতর সীমা পরস্পর সমান না হয় তাহলে রাশিতথ্যসমূহ সন্নিবেশিত করা সর্বদা সম্ভব নাও হতে পারে। একটি শ্রেণীর উর্দ্ধতর সীমা ও পরবর্তী শ্রেণী নিম্নতর সীমার মধ্যে ফাঁক থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। এই উদ্দেশ্যে একটি শ্রেণীর উর্দ্ধতর সীমা ও পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নতর সীমার যৌগিক গড় নির্ণয় করে যা নির্ধারিত হয় তা হল শ্রেণী সীমান্ত। নির্ধারিত এই শ্রেণী সীমান্তটি প্রথমোক্ত শ্রেণীর উর্দ্ধতর শ্রেণী

সীমান্ত এবং তার পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণী সীমান্ত হিসাবে গণ্য হয়। বলা বাহুল্য শ্রেণী সীমান্ত একটি নতুন শ্রেণীবিন্যাস উৎপন্ন করে যার পার্শ্ববর্তী দুটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথমটির উর্দ্ধসীমা দ্বিতীয়টির নিম্নসীমার সমান হয়।

উদাহরণ :

শ্রেণী সীমা বিশিষ্ট শ্রেণী	শ্রেণী সীমান্ত বিশিষ্ট শ্রেণী
20—24	19.5—24.5
25—29	24.5—29.5
30—34	29.5—34.5

শ্রেণী সীমান্তের ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে প্রতিটি শ্রেণীর উর্দ্ধতর সীমান্ত পরবর্তী শ্রেণীর নিম্নতর সীমান্তের সঙ্গে সমান। একটি শ্রেণীর উর্দ্ধ সীমান্ত ও নিম্ন সীমান্তের অন্তরকেও শ্রেণী অন্তর (Class interval) বলা হয়।

5. **শ্রেণী মধ্যক (Class mark) :** একটি শ্রেণীর শ্রেণী অন্তরের মধ্যমান হল শ্রেণী মধ্যক বা ক্লাসমার্ক। উপরোক্ত উদাহরণে শ্রেণীগুলির শ্রেণী মধ্যক হল যথাক্রমে 22, 27 এবং 32।

6. শ্রেণী দৈর্ঘ্য (Class width) : একটি শ্রেণীর উর্দ্ধতর শ্রেণী সীমান্ত ও নিম্নতর শ্রেণী সীমান্তের অন্তর হল শ্রেণী দৈর্ঘ্য।

7. পরিসংখ্যা ঘনত্ব (Frequency density) : একটি শ্রেণীর পরিসংখ্যা ঘনত্ব হল সেই শ্রেণীর প্রতি একক দৈর্ঘ্য পিছু পরিসংখ্যা।

অতএব, পরিসংখ্যা ঘনত্ব = 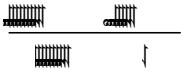

বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত পরিসংখ্যাসমূহের কেন্দ্রীকতা (Concentration) তুলনার জন্য পরিসংখ্যা ঘনত্ব ব্যবহার করা হয়, বিশেষত: যখন শ্রেণীগুলি অসম দৈর্ঘ্যের হয়।

এবার একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরীর সমস্যা এবং নিয়ম-কানুনসমূহ আলোচনা করা যেতে পারে।

ধরাযাক কান এক অবিচ্ছিন্ন চলকের n সংখ্যক মান সংগৃহীত হয়েছে। এই n সংখ্যক মান নিয়ে পরিসংখ্যা বিভাজন গঠন করতে হলে নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হতে হবে।

প্রথমে প্রদত্ত মানগুলির (values) সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মান দুটি চিহ্নিত করতে হবে। এই তথ্য রাশি দুটির অন্তর হল প্রসার (range)। মোট পরিসংখ্যা অনুযায়ী তখন প্রসারকে কয়েকটি

যথোপযুক্ত শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে। শ্রেণীর সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

(a) শ্রেণীগুলি সামগ্রিক (Exhaustive) হতে হবে যাতে সকল মান বা সকল রাশিতথ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

(b) শ্রেণীগুলি পরস্পর পৃথক (Mutually exclusive) হওয়া আবশ্যক যাতে একই মান একাধিক শ্রেণীর মধ্যে না পড়ে।

(c) শ্রেণীর সংখ্যা খুব বেশি বা খুব কম হওয়া বিধেয় নয়।

(d) শ্রেণীর সংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে বাঁধাধরা কোন নিয়ম নেই। কার্যকরী নিয়ম হল 1000-এর অধিক মোট পরিসংখ্যার জন্য শ্রেণীর সংখ্যা 15 থেকে 20 মধ্যে রাখা বিধেয়। 1000-এর কাছাকাছি মোট পরিসংখ্যার জন্য শ্রেণীর সংখ্যা 10 থেকে 15-এর মধ্যে রাখা যায়। 1000-এর অনেক কম মোট পরিসংখ্যার জন্য শ্রেণীর সংখ্যা আরও কমান যেতে পারে। যাইহোক, মোট পরিসংখ্যা যখন 200-এর নিকটবর্তী হয় তখন শ্রেণীর সংখ্যা 7 বা 8 রাখাই যথেষ্ট।

(e) বিভিন্ন শ্রেণীর দৈর্ঘ্য সমান রাখাই বিধেয়। ক্ষেত্র বিশেষে যথা আর বণ্টনের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসের গুরুত্ব বাড়াতে শ্রেণীগুলির দৈর্ঘ্য সমান রাখা হয় না। সুতরাং সমদৈর্ঘ্যের শ্রেণীর শর্ত কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হয় না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি স্মরণে রেখে প্রসারকে শ্রেণী সীমাদ্বার সংজ্ঞায়িত যথোপযুক্ত সংখ্যক শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়। অনেক সময় সুবিধার জন্য রাশিতথ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত প্রসার অপেক্ষকা বৃহত্তর প্রসার গ্রহণ করা হয়। এরপর প্রদত্ত মানগুলি (values) একের পর এক ধরে টালি মার্কের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলিতে রেকর্ড বা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পদ্ধতি চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সব মানগুলি বিবেচিত হচ্ছে। গণনার সুবিধার জন্য পাঁচটির মধ্যে টালিমার্ক নির্দিষ্ট রাখা হয়।

উদাহরণ : ধরা যাক, কোন এক কলেজের টেস্ট পরীক্ষায় 50 জন ছাত্র গণিতে নিম্নলিখিত নম্বর পেয়েছে—

37	42	48	46	64	63	53	63	55	57
55	72	33	66	56	48	77	34	58	65
59	47	35	44	40	75	56	45	65	55
56	48	53	52	42	34	65	58	54	43
57	46	58	62	43	53	54	47	48	60

এই রাশিতথ্যসমূহের একটি পরিসংখ্যা বিভাজন নিম্নে দেওয়া হল—

ছক নং—6

প্রাপ্ত নম্বর সম্পর্কিত রাশিতথ্যসমূহের জন্য টালিমার্ক

শ্রেণী সীমা	টালি মার্কস্
31—40	卌 I
41—50	卌 卌 卌
51—60	卌 卌 卌 卌
61—70	卌 II
71—80	III

ছক নং—7

একটি কলেজে 50 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের পরিসংখ্যা বিভাজন

শ্রেণী সীমান্ত	পরিসংখ্যা
30·5—40·5	6
40·5—50·5	14
50·5—60·5	20
60·5—70·5	7
70·5—80·5	3
মোট	50

(ঠ) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন (Cumulative frequency Distribution) : আপেক্ষিক পরিসংখ্যাসমূহ অনুসারেও পরিসংখ্যা বিভাজন প্রকাশ করা যায়। শ্রেণী পরিসংখ্যাগুলি উপর দিক থেকে (সর্বনিম্ন শ্রেণী থেকে) অথবা তলার দিক থেকে (সর্বোচ্চ শ্রেণী থেকে) ধারাবাহিকভাবে যুক্ত করে প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করা যায়। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা অধিকতর ধরনের (More than type) অথবা স্বল্পতর ধরনের (Less than type) হতে পারে। একটি শ্রেণীর স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর উচ্চতর শ্রেণী সীমান্ত অপেক্ষা স্বল্পতর পর্যায়ে দফাগুলির সংখ্যা 7 নং ছক অনুসারে উপরের দিক থেকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ও পরিসংখ্যা উভয়ই সমান (অর্থাৎ 6), দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা

হল 6 + 14 = 20। এর অর্থ হল ঐ শ্রেণীর উর্দ্ধতর শ্রেণী সীমান্ত 50·5-এর স্বল্পতর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা হল 20 জন, অনুরূপভাবে একটি শ্রেণীর অধিকতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণী সীমান্ত অপেক্ষা অধিকতর পর্যায়ে দফাগুলির সংখ্যা। একই ছকের নীচের দিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হল 3 + 7 = 10। এর অর্থ হল ঐ শ্রেণীর নিম্ন শ্রেণী সীমান্ত 60·5-এর অধিকতর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা হল 10। এইভাবে স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কার্যত উচ্চতর শ্রেণী সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত এবং অধিকতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা কার্যত নিম্নতর শ্রেণী সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত। ধরা যাক কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের শ্রেণী পরিসংখ্যাগুলি উপরের দিক থেকে হল যথাক্রমে f_1, f_2, f_3 .....। স্বভাবতঃ স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি হবে যথাক্রমে f_1, $f_1 + f_2$, $f_1 + f_2$, $+ f_3$ .....। ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে। ছকটি শ্রেণী সীমা অনুসারে দেওয়া না থাকলে তা শ্রেণী সীমান্ত অনুসারে পরিবর্তন করে প্রকাশ করতে হয়। যে পরিসংখ্যা বিভাজনে এই ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি দেখান হয় তাকে **ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন** (Cumulative frequency distribution) বলে। 7 নং ছক দ্বারা প্রকাশিত পরিসংখ্যা বিভাজনটি থেকে গঠিত ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন নিম্নের ছক দ্বারা প্রকাশ করা হল।

ছক নং—৪

একটি কলেজে 50 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন

শ্রেণী সীমান্ত	পরিসংখ্যা	ক্রমযৌগিক সংখ্যা	
		স্বল্পতর ধরনের	অধিকতর ধরনের
30·5 — 40·5	6	6	50
40·5 — 50·5	14	20	44
50·5 — 60·5	20	40	30
60·5 — 70·5	7	47	10
70·5 — 80·5	3	50	3
মোট	50	—	—

পরিবেশে পরিসংখ্যা বিভাজনের বিশেষত্ব উল্লেখ করা যায়। পরিসংখ্যা বিভাজন দু-ধরনের হয় : (a) সরল পরিসংখ্যা বিভাজন (Simple frequency distribution) এবং (b) শ্রেণী বা গোষ্ঠীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন। সরল পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে (Individually) একটি চলকের মানসমূহ এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি ছকের মাধ্যমে দেখান হয়। উদাহরণ স্বরূপ 5 নং ছকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে একটি

চলকের মানগুলির বিভিন্ন শ্রেণী অন্তর এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি ছকের মাধ্যমে দেখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ 7 নং ছকটি উল্লেখ করা যেতে পারে। রাশিতথ্যমালার সারিকরণের (Summarisation) সর্বোৎকৃষ্ট ও বহুল প্রচলিত ভঙ্গী হল পরিসংখ্যা বিভাজন।

(ড) নক্সা ও চিত্র (Charts and Diagram) : পরিসংখ্যাগত রাশিতথ্যমালা প্রকাশের কার্যকরী পদ্ধতি হল নক্সা ও চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ। বস্তুত নক্সা ও চিত্রের সাহায্যে এক নজরে রাশিতথ্যমালার প্রকৃতির বেশ কিছুটা অতিসত্ত্বর অনুধাবন করা যায়। তাছাড়া চার্ট বা নক্সা জটিল সমস্যার ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং গুপ্ত তথ্য সামনে তুলে ধরতে পারে। কালীনসারির প্রবণতা নিরূপণের ক্ষেত্রে নক্সা বিশেষ উপযোগী হয়। ত্রুটি বিচ্যুতি পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় গ্রাফ ব্যবহার করা হয়। নক্সা বা চিত্র অবশ্য রাশিতথ্যমালার পুঁঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে পারে না। এগুলির মাধ্যমে কেবল আসন্ন অবস্থার প্রকাশ ঘটে। নক্সা ও চিত্র অঙ্কন করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়।

নক্সা ও চিত্রের সাধারণ ধরনগুলি নিম্নে দেওয়া হল—

(1) রেখাচিত্র অথবা গ্রাফ (Line diagram of Graph)

(2) দণ্ড চিত্র (Bar diagram)

(3) পাই চিত্র (Pie diagram)

(4) আয়তলেখ, পরিসংখ্যা বহুভুজ, ওগিভ ইত্যাদি (Histogram, Frequency Polygon, Ogive etc)

(ঢ) রেখাচিত্র বা লেখ (Line diagram or Graph) : রেখাচিত্র বা লেখ হল পরিসংখ্যাগত রাশিমালা প্রকাশের সর্বাধিক সাধারণ পদ্ধতি। সরলরেখা বা বক্রের (Straight line or curve) সাহায্যে দুটি চালকের মধ্যে সম্পর্ক রেখাচিত্রে (Sine diagram) প্রতিফলিত হয়। একটি লেখ কাগজে (Graph paper) একটি অনুভূমিক রেখা (অনুভূমিক অক্ষ বা x-অক্ষ) এবং একটি উলম্ব রেখা (উল্লম্ব অক্ষ বা y-অক্ষ) অঙ্কন করা হল। অনুভূমিক অক্ষ এবং উলম্ব অক্ষ নামে কথিত রেখাদ্বয় যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে **মূলবিন্দু** (origin) বলা হয়। ধরা যাক x এবং y এমন দুটি বিচ্ছিন্ন অথবা অবিচ্ছিন্ন চলক যে x-এর প্রতিটি গ্রহণযোগ্য মানের জন্য y-এর একটি করে নির্দিষ্ট মান থাকে। এক্ষেত্রে x হল নিরপেক্ষ চলক (Independent variate) এবং y হল নির্ভরশীল চলক (Dependent variate)। পূর্ব নির্দিষ্ট একক অনুযায়ী অনুভূমিক অক্ষে x চলকের মানগুলি এবং উলম্ব অক্ষে y চলকের মানগুলি দেখান যেতে পারে। x-এর জন্য একক এবং y-এর জন্য একক ভিন্ন মাপের হতে পারে। অনুভূমিক অক্ষকে X-অক্ষ এবং উল্লম্ব অক্ষকে Y-অক্ষ বলেও অভিহিত করা হয়।

এবার x চলকের মানসমূহ x_1, x_2, x_3 ..... জন্য y চলকের সংশ্লিষ্ট মানগুলি যদি যথাক্রমে y_1, y_2, y_3 ..... হয় তাহলে লেখ কাগজের y-অক্ষবিশিষ্ট সমতলে প্রদত্ত রাশিতথ্যসমূহ (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3) ..... ভুজ কোটি সম্পন্ন P_1, P_2, P_3 ..... বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা

যায়। এই বিন্দুগুলি সরলরেখা দ্বারা যুক্ত করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় তা হল লেখচিত্র (Line diagram)।

শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে শ্রেণী সম্পর্কিত পরিসংখ্যাগুলিকে শ্রেণী মধ্যকের (Class mark) সংশ্লিষ্ট কোটিরূপে ব্যবহার করা হয়। একই গ্রাফের বা লেখার মধ্যে একাধিক রেখাচিত্রের প্রয়োজন হলে প্রত্যেক রেখাচিত্র পৃথকভাবে অঙ্কন করতে হবে।

লেখচিত্রের অনুভূমিক অক্ষের নিম্নে এবং উলম্ব অক্ষের বাম দিকে চলক দুটির বিভিন্ন মান পরিমাপের একক স্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। পরিসংখ্যাগুলি (frequencies) কার্যত উল্লম্ব অক্ষে দেখান হয়। রেখাচিত্রের যে-কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক (co-ordinates) (a, b) দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার অর্থ হল ঐ বিন্দুর ভুজ হচ্ছে a এবং কোটি হচ্ছে b অথবা x ও y অক্ষ থেকে বিন্দুটির দূরত্ব b ও a-র মানের সমানুপাতিক।

অনুভূমিক পরিমাপ মাত্রা (Scale) মূল বিন্দু থেকে শুরু নাও হতে পারে। কিন্তু উল্লম্ব পরিমাপ মাত্রা শূন্য বিন্দু থেকে দেখান আবশ্যিক। লেখচিত্রের একটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দিতে হয় :

উদাহরণ : কোন একটি ফার্মে মাসিক বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :

জানুয়ারী—50, ফেব্রুয়ারী—90, মার্চ—60, এপ্রিল—120, মে—140, জুন—100, জুলাই—150, আগষ্ট—90, সেপ্টেম্বর—130, অক্টোবর—150, নভেম্বর—120, ডিসেম্বর—130

উপরোক্ত রাশিতথ্যমালাকে রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নে প্রকাশ করা হল —

একটি ফার্মের মাসিক বৈদ্যুতিক পাখা উৎপাদনের রেখাচিত্র

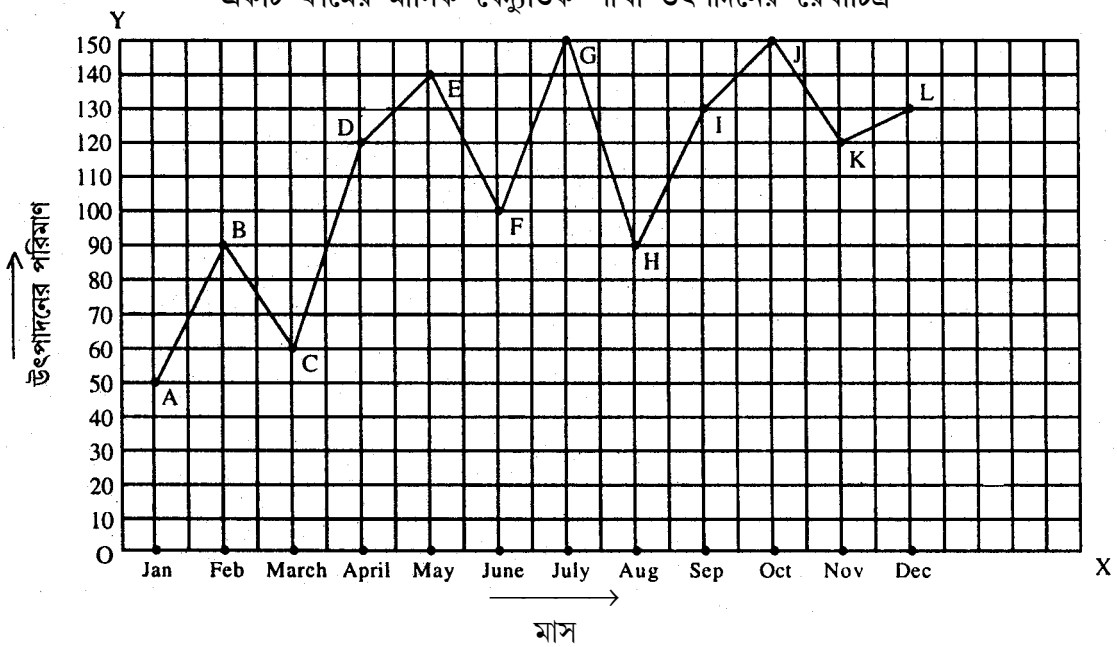

চিত্র নং—1

রেখাচিত্রটিতে মাসসমূহকে উল্লম্ব অক্ষরেখায় এবং উৎপাদনের পরিমাণকে অনুভূমিক অক্ষরেখায় নিম্নলিখিত পরিমাপ মাত্রা (Scale) অনুযায়ী দেখান হয়েছে।

পরিমাপ মাত্রা (Scale) : অনুভূমিক অক্ষ OX বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের 2টি বাহু দৈর্ঘ্য = 1 মাস এবং উলম্ব অক্ষ OY বরাবর ছোট বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু = 10টি পাখা ধরে পাখার মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ উপরোক্ত লেখচিত্র (Line diagram)-এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন মাসে পাখার উৎপাদনসমূহ অনুভূমিক অক্ষরেখা থেকে যথাক্রমে A, B, C, D..... প্রভৃতি বিন্দুগুলির উল্লম্ব দূরত্বের সমানুপাতিক হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে।

(ণ) দণ্ডচিত্র বা বারলেখ (Bar diagram or Bar graph) : কোন বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনের লৈখিক প্রকাশের জন্য দণ্ডচিত্র বা বারচিত্রের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। পরস্পর লম্ব এমন একটি দু-অক্ষবিশিষ্ট সমতলের অনুভূমিক ও উলম্ব অক্ষ বরাবর যথাক্রমে চলকের মানসমূহ ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি পরিমাপ মাত্রা অনুযায়ী দেখিয়ে কতকগুলি একই প্রান্তের দণ্ড বা বার (Bar) পরস্পর হতে সমান দূরত্বে খাড়া করা হয় (erected)। এক একটি দণ্ড বা বারের দৈর্ঘ্য উহা যে রাশিতথ্যকে বা চলকের মাত্রাকে প্রকাশ করছে তার পরিসংখ্যানের (frequency) সমানুপাতিক হয়। এই দণ্ড বা বারগুলিকে অনুভূমিক অথবা উলম্ব উভয়ভাবে প্রকাশ করা যায়। কালীনসারি সাধারণত উলম্ব দণ্ড চিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ : ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যের জনসংখ্যার ছক [1951 সালের আদমসুমারি (census) অনুযায়ী] নিম্নে দেওয়া হল—

রাজ	প. বঙ্গ	বোম্বাই	বিহার	মাদ্রাজ	উ: প্রদেশ
জনসংখ্যা (লক্ষে)	250	360	400	570	630

প্রদত্ত এই ছক অনুযায়ী নিম্নে দণ্ডচিত্রটি দেখান হল—

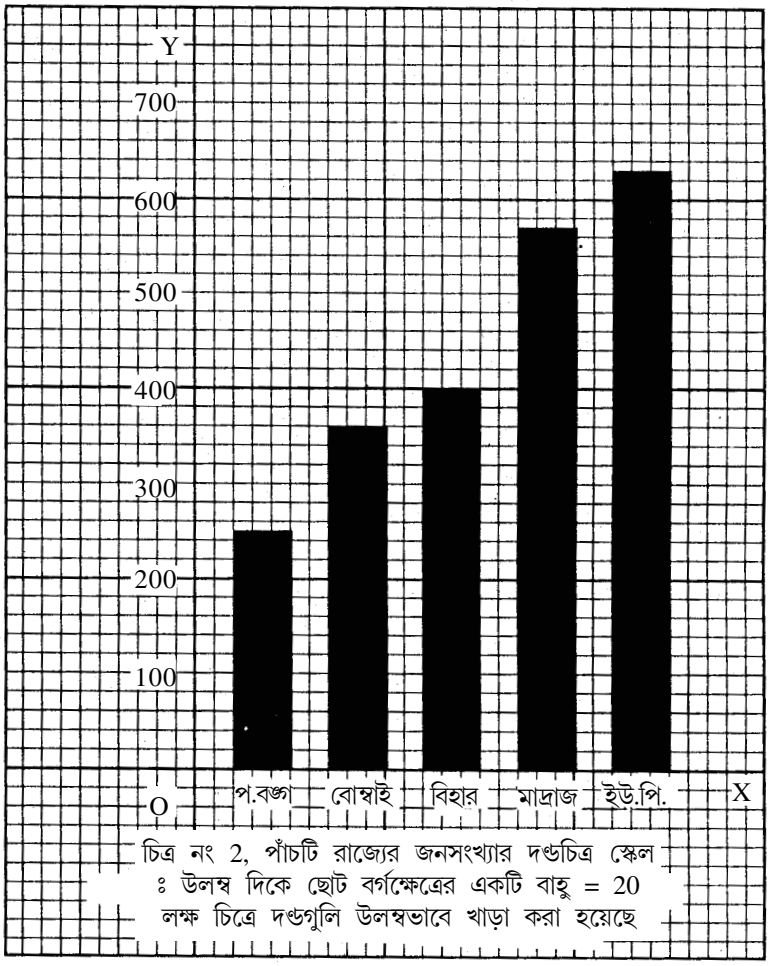

চিত্র নং 2, পাঁচটি রাজ্যের জনসংখ্যার দণ্ডচিত্র স্কেল
ঃ উলম্ব দিকে ছোট বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু = 20
লক্ষ চিত্রে দণ্ডগুলি উলম্বভাবে খাড়া করা হয়েছে

দণ্ডচিত্র কয়েক রকমের হতে পারে, যথা— অনুভূমিক দণ্ডচিত্র, উলম্ব দণ্ডচিত্র, যুগ্ম বা যৌগিক বা জটিল দণ্ডচিত্র এবং অংশভিত্তিক দণ্ড চিত্র।

(ত) পাই চিত্র বা বৃত্তাকার চিত্র (Pie chart or Circular Chart) : পাই চিত্রের (Pie chart) -এর সাহায্যে সম্পূর্ণ রাশিতথ্য ও তার অংশগুলিকে একই স্থানে দেখান হয়। প্রথমে একটি বৃত্ত আঁকা হয় এবং বৃত্তটির ক্ষেত্রফল দ্বারা সম্পূর্ণ তথ্য বা রাশিতথ্যগুলির সমষ্টিকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এবার সম্পূর্ণ তথ্যের বিভিন্ন অংশগুলি বৃত্তটির বিভিন্ন অংশ দ্বারা এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যাতে বৃত্তাংশসমূহের ক্ষেত্রফল, সম্পূর্ণ তথ্যের সংশ্লিষ্ট অংশগুলির মানের সমানুপাতিক হয়—স্পষ্টতই সম্পূর্ণ তথ্যের কোন একটি অংশ ঐ সম্পূর্ণ তথ্যের যত শতাংশ হবে সেই অংশ সংশ্লিষ্ট বৃত্তাংশটি সম্পূর্ণ বৃত্তের তত শতাংশ হবে।

পাই চিত্র অঙ্কনের সুবিধার্থে প্রথমে একটি বৃত্তের পরিধিকে 100টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। আবার বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোণ হল 360°। সুতরাং সম্পূর্ণ রাশিতথ্যের কোন অংশ বিশেষের শতাংশ যদি P হয় তাহলে তদ্‌সংশ্লিষ্ট বৃত্তাংশের কেন্দ্রস্থ কোণ $q = \frac{360}{100} \times P$ (3·6 × P) ডিগ্রি হবে। এভাবে সম্পূর্ণ রাশিতথ্যের অংশ বিশেষের জন্য সংশ্লিষ্ট বৃত্তাংশগুলি নির্ণয় করে পাই চিত্র বা বৃত্তাকার চিত্র অঙ্কন করা হয়।

উদাহরণ : ভারত সরকারের কোন এক বছরের রাজস্ব সংক্রান্ত রাশিতথ্যমালা দেওয়া হল। রাশিতথ্য মালাকে নিম্নে একটি পাই চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হল :

উৎস	রাজস্ব (লক্ষ টাকায়)	মোটর শতাংশ
কাসটমস	10880	32
কেন্দ্রীয় অন্ত:শুল্ক	6800	20
অন্যান্য কর (কর্পোরেট কর ছাড়া)	8160	24
কর্পোরেট কর	3400	10
অন্যান্য উৎস	4760	14

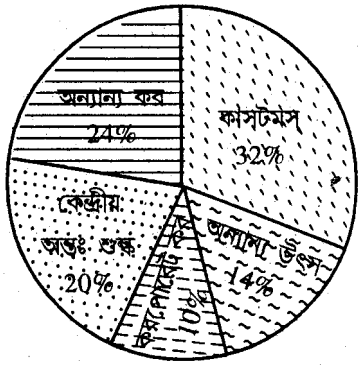

চিত্র নং 3 ঃ পাই চিত্র

কোন বৃত্তের কেন্দ্রে মোট 360° উৎপন্ন হয়। সুতরাং 360° হল 100% পরিসংখ্যার সমানুপাতিক এবং 1% পরিসংখ্যার জন্য কেন্দ্রে 3·6° কোণ উৎপন্ন হবে। বিভিন্ন সূত্র থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট পাই চিত্রের বিভিন্ন অংশের জন্য কেন্দ্রে যে কোণগুলি উৎপন্ন হবে সেগুলি হল যথাক্রমে (32 × 3·6) = 115·2°, (20 × 3·6) = 72°, (24 × 3·6) = 86·4°, (10 × 3·6) = 36° এবং (14 × 3·6) = 14°

(থ) পরিসংখ্যা বহুভূজ (Frequency Polygon) : একটি বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনের উপযুক্ত চিত্র সহযোগে প্রকাশ হল পরিসংখ্যা বহুভূজ। এই ক্ষেত্রে চলকের মানসমূহ অনুভূমিক অক্ষে এবং পরিসংখ্যানসমূহ উলম্ব অক্ষে দেখান হয়। দুই অক্ষবিশিষ্ট সমতলে সংগৃহীত রাশিতথ্যসমূহ বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যেখানে প্রতিটি বিন্দুর ভূজ এবং কোটি যথাক্রমে চলকের মান ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা প্রকাশ করে। একটি বদ্ধ চিত্রের জন্য শূন্য পরিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট চলকের নিম্নতম ও উর্দ্ধতম মানগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়—অর্থাৎ পরিসংখ্যা বহুভূজটি অনুভূমিক অক্ষ থেকে শুরু হয় এবং সর্বশেষে অনুভূমিক অক্ষে মিলিত হয়। চিহ্নিত বিন্দুগুলি রেখাংশ দ্বারা ক্রমান্বয়ে যুক্ত করে যে বহুভূজটি লিখিত হয় তা হল পরিসংখ্যা বহুভূজ। পূর্বোল্লিখিত পরিসংখ্যা ছক নং 5 অনুসারে নিম্নে একটি পরিসংখ্যা বহুভূজ অঙ্কন করা হল।

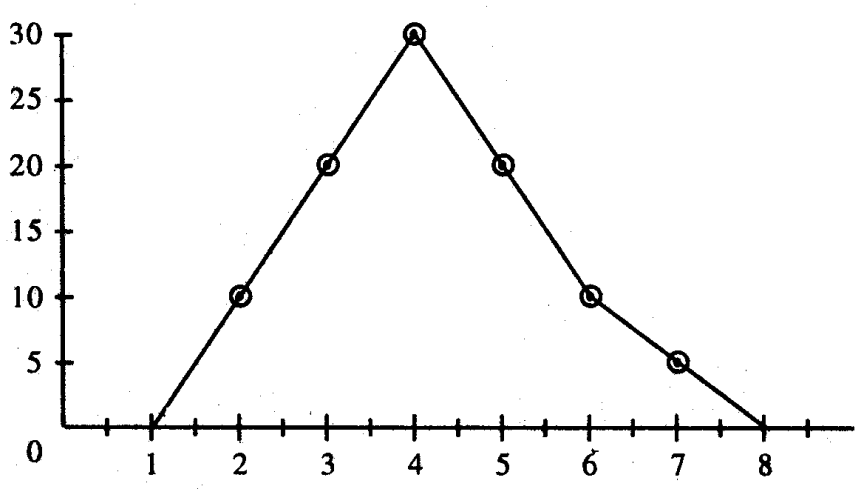

চিত্র নং 4 ছক : নং 5 অনুযায়ী পরিবারের আয়তনের পরিসংখ্যা
বিভাজনের পরিসংখ্যা বহুভুজ

(দ) আয়তলেখ (Histogram) : আয়তলেখ অবিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন প্রকাশের যথোপযুক্ত লেখচিত্র। আয়তলেক্ষ-এর ক্ষেত্রে ধরা হয় যে একটি শ্রেণীর অন্তর্গত পরিসংখ্যা শ্রেণীর দৈর্ঘ্যের মধ্যে সমানভাবে বিস্তৃত। এক্ষেত্রেও দুটি অক্ষ ধরা হয় এবং শ্রেণী সীমান্তগুলি (Class boundaries) শ্রেণীদৈর্ঘ্য নির্দেশ করার জন্য অনুভূমিক অক্ষে দেখান হয়। এরপর প্রতিটি শ্রেণীদৈর্ঘ্যের উপর পরস্পর সংলগ্ন আয়তক্ষেত্রগুলি খাড়া করা হয় (erected) এমনভাবে যেন প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর পরিসংখ্যার সমানুপাতিক হয়। সব শ্রেণীগুলি যদি সম দৈর্ঘ্যের হয় তাহলে আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা (উলম্ব দৈর্ঘ্য) শ্রেণী পরিসংখ্যাগুলির সমানুপাতিক হবে এবং তখন আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা সংখ্যাগতভাবে শ্রেণীপরিসংখ্যার সমান ধরা যাবে। আবার শ্রেণীগুলির দৈর্ঘ্য যদি অসম হয় তাহলে আয়তক্ষেত্রগুলির প্রস্থ অসম হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে পরিসংখ্যা ঘনত্বগুলির সমানুপাতিক।

উদাহরণ : 100টি দোকানের মাসিক মুনাফার (টাকায়) পরিসংখ্যা বিভাজন নিম্নে দেওয়া হল :

প্রতিটি দোকানের মুনাফা :	0–100	100–200	200–300	300–400	400–500	500–600
দোকানের সংখ্যা :	12	18	27	20	17	6

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্ন আয়তলেখটি দেখান হল :

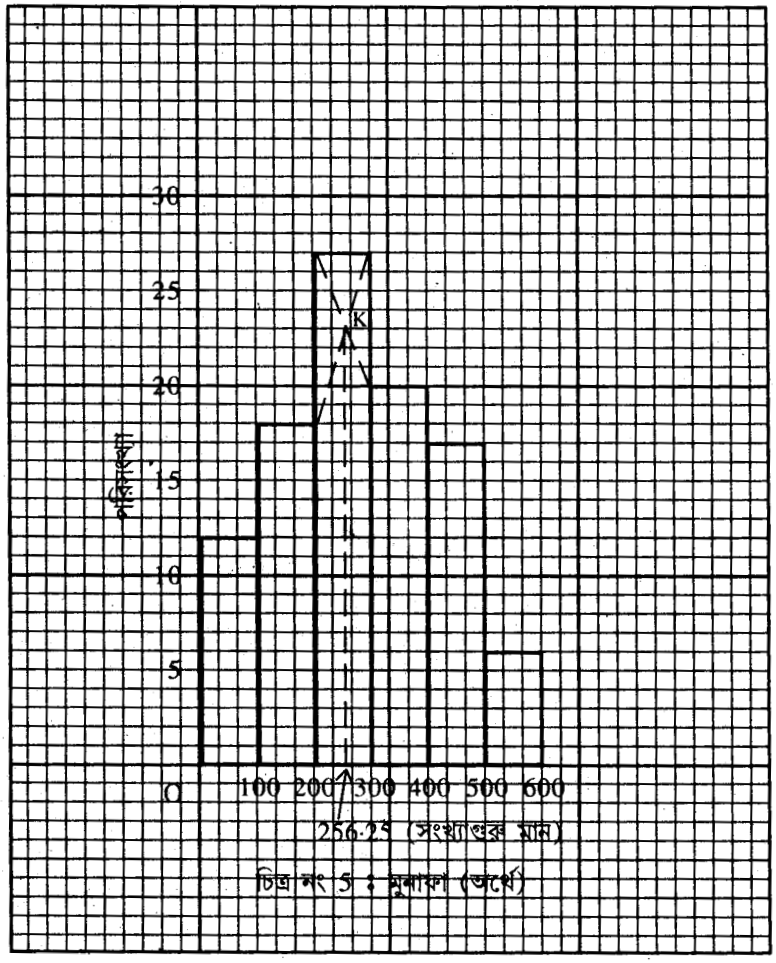

চিত্র নং 5 : মুনাফা (অর্থে)

চিত্রে ছেদবিন্দু K অনুসারে সংখ্যাগুরু মান (Mode) নির্ণয় করা যায়। K বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্ব অনুসারে নির্ধারিত সংখ্যাগুরু মান হল 256·25।

(ধ) অগিভ বা অজিভ (Ogive) : একটি অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্রমযৌলিক পরিসংখ্যাগুলির (যে কোন এক ধরনের) পরিপ্রেক্ষিতে পরিসংখ্যা বিভাজনের বহুল ব্যবহৃত লৈখিক প্রকাশ হল অগিভ বা অজিভ, এই লেখচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে দুই অক্ষ বিশিষ্ট সমতলের অনুভূমিক অক্ষে চলকের মানগুলি এবং উলম্ব অক্ষে সংশ্লিষ্ট ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি দেখান হয়।

স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে (In case of cumulative frequencies, less then type) ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি দুই অক্ষবিশিষ্ট সমতলে উর্ধ্বতর শ্রেণীসীমান্তের (Upper class boundaries) পরিপ্রেক্ষিতে বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং এরূপ চিহ্নিত বিন্দুগুলি রেখাংশ দ্বারা যুক্ত

করে স্বল্পতর ধরনের অগিভ (Ogive) পাওয়া যায়। আবার অধিকতর ধরনের অগিভ অঙ্কনের জন্য ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি (অধিকতর ধরনের) সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণী সীমান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দুই অক্ষবিশিষ্ট সমতলে বিভিন্ন বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই বিন্দুগুলি রেখাংশ দ্বারা যুক্ত করে অধিকতর ধরনের অগিভ/অজিভ পাওয়া যায়।

স্বাভাবিকভাবে, নিম্নতম শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণী সীমান্তের ক্ষেত্রে স্বল্পতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হল শূন্য এবং তা অগিভ অঙ্কনের বেলায় অন্তর্ভুক্তকরণ হয়। অনুরূপভাবে উচ্চতম শ্রেণীর উচ্চতর শ্রেণী সীমান্তের ক্ষেত্রে অধিকতর ধরনের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাও শূন্য হয় এবং অগিভ অঙ্কনের সময় এই তথ্য গৃহীত হয়।

পূর্বোল্লিখিত ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা ছক নং 8 অনুসারে নিম্নে উভয় ধরনের অগিভ অঙ্কন করে দেখান হল :

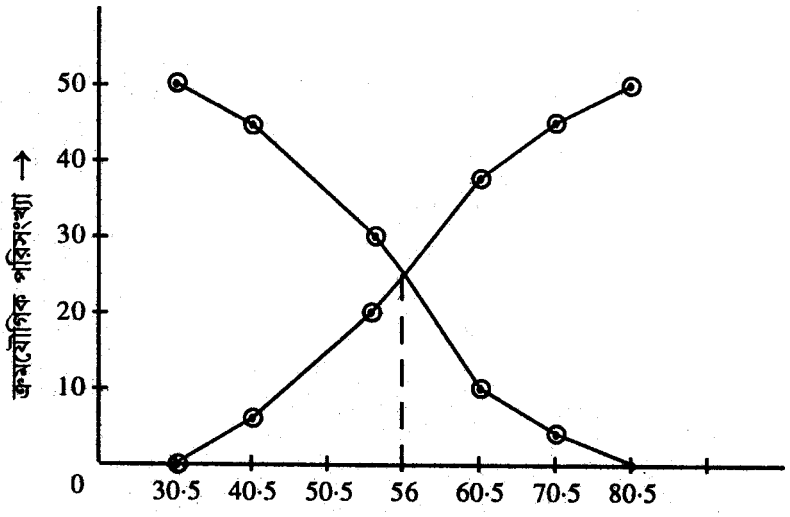

(ছক নং 8 অনুযায়ী) শ্রেণী সীমান্ত →

চিত্র নং 6

চিত্রগতভাবে অগিভ (Ogive) থেকে মধ্যমার (Median) আসন্ন মান নির্ণয় করা যেতে পারে। স্বল্পতর ধরনে অগিভ ও অধিকতর ধরনের অগিভ দুটির ছেদবিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর অবস্থান অনুযায়ী মধ্যমার মান স্থির হয়। অনুভূমিক পরিমাণগত মাত্রায় (horizontal scale) পাদবিন্দু দ্বারা প্রকাশিত চলকের মান হচ্ছে মধ্যমা। উপরোক্ত চিত্র অনুসারে নির্ধারিত মধ্যমা হল 56।

(ন) মধ্যগামিতার পরিমাপসমূহ (Measures of Central Tendency) : প্রচুর পরিমাণ রাশিতথ্যমালা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যা বিভাজনের মাধ্যমে ওগুলির সংক্ষিপ্তকরণ অনেক সময় যথেষ্ট হয় না ; বিশেষত যেখানে নানা ধরনের তুলনামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় সেখানে পরিসংখ্যা বিভাজনের বৈশিষ্ট্যগুলি আরও সংক্ষিপ্ত আকারে সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার বা চলকের মানগুলির মধ্য অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পরিসংখ্যা বিভাজনের আরও সংক্ষিপ্ত আকার বিশেষ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এরূপ একটি সংখ্যা যা রাশিতথ্যমালার মাঝামাঝি কোথাও অবস্থান করে তাকে পরিসংখ্যান গড় (Statistical Average) বা শুধু গড় (Average) বলা হয়। পরিসংখ্যান গড় প্রধানত তিন প্রকারের : (1) মধ্যক (Mean) ; (2) মধ্যমা (Median) এবং (3) সংখ্যাগুরু মান (Mode)। মধ্যক আবার তিন ধরনের হয় :

(1) যৌগিক মধ্যক বা গড় (Arithmetic Mean or A.M)

(2) গুণোত্তর মধ্যক বা গড় (Geometric Mean or G.M)

(3) বিবর্ত যৌগিক মধ্যক বা গড় (Harmonic Mean or Average)

(প) যৌগিক গড় (AM) : একটি চলকের যৌগিক গড় হল ঐ চলকের বিভিন্ন মানের সমষ্টি এবং চলকটির মানের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত।

যদি $x_1, x_2, \ldots\ldots x_n$ কোন একটি x চলকের n সংখ্যক মান (Values of the variable x) হয় তাহলে x-এর যৌগিক গড় $= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots\ldots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ এই ধরনের যৌগিক গড় হল সরল যৌগিক গড় (Simple A.M.)

প্রমাণ : $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = \sum_{i=1}^{n} x_i - n\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$

আরও উল্লেখ করা যায় যে ন্যূনতম হবে যদি অন্য কোন পরিসংখ্যান গড় হতে চলকের মানগুলির অন্তর নেওয়া হয়।

উদাহরণ—1 কোন একটি অফিসে 1995 সালের মে মাসে 8 জন কর্মচারীর মাসিক বেতন ছিল 4500, 4650, 4700, 4800, 4600, 4530, 4850 এবং 4774 টাকা। কর্মচারীদের গড় মজুরি (Mean wage) হল = = 4675·50 টাকা

চলকের প্রতিটি মান থেকে একটি যথাযথ উপাদন c বাদ দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যৌগিক গড় নির্ণয়

সহজে করা যায়। ধরি x চলকের বিভিন্ন মান থেকে কোন একটি উপাদান c বাদ দিয়ে যথাক্রমে y_1, y_2 .... y_n প্রভৃতি মানগুলি পাওয়া গেল—অর্থাৎ ধরি $y_1 = x_i - c$ প্রতিটি i-এর জন্য

অথবা যেখানে n হল চলকের মানগুলির সংখ্যা

অথবা $\sum_{i=1}^{n} y_i / n = \sum_{i-1}^{n} x_i / n - \frac{nc}{n}$

অথবা $\bar{y} = \bar{x} - c$

অথবা

উদাহরণ—2 কোন এক সপ্তাহের 7 দিনে কোন এক মুদি দোকানের মুনাফা হল 210, 200, 250, 240 230, 245 প্রতিদিনের গড় মুনাফা নির্ণয় কর।

ধরি x হল দোকানীর দৈনিক মুনাফা এবং এর মানগুলি হল x_1, x_2, ... x_7

ধরি $y_i = x_i - 200$, প্রতিটি i-এর জন্য। অতএব y_1, y_2 ..... y_7 হল যথাক্রমে 10, 0, 50, 40, 30, 40.

অতএব গড় মুনাফা = 200 + 25 = 225 টাকা

কোন এক বিচ্ছিন্ন চলকের মানগুলি যদি তাদের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি সহ দেখান হয় তাহলে যৌগিক গড় নির্ণয় করা যায়। ধরা যাক্ x চলকের n সংখ্যক মানগুলি হল x_1, x_2, ... x_n এবং তাদের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে f_1, f_2, ... f_n, তাহলে যৌগিক গড় নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে নির্ণিত হয় :

যেখানে $N = \sum_{i=1}^{n} f_i$ এধরনের যৌগিক গড় হল গুরুত্বযুক্ত যৌগিক গড় (Weighed A.M)।

আবার অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন শ্রেণী অন্তর ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি দেখিয়ে পরিসংখ্যা ছকের সাহায্যে তথ্যরাশিমালা প্রকাশ করা হয়। এই ক্ষেত্রে শ্রেণীমধ্যকগুলিকে (Class Mean) সংশ্লিষ্ট শ্রেণী অন্তরগুলির প্রতিনিধি হিসাবে ধরে যৌগিক গড় নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রেও

যেখানে x_1, x_2 ....x_n হল শ্রেণী অন্তরগুলির শ্রেণীমধ্যক এবং f_1, f_2, ... f_n হল সংশ্লিষ্ট শ্রেণী পরিসংখ্যাসমূহ।

শ্রেণী অন্তরগুলির দৈর্ঘ্য সমান হলে মূলবিন্দু (Origin) পরিবর্তন করে (change of origin or base) এবং পরিমাপ মাত্রা (scale) পরিবর্তন করে যৌগিক গড় নির্ণয় করা সুবিধাজনক হয়। প্রতিটি শ্রেণীমধ্যক থেকে c বাদ দিয়ে এবং তারপর d দ্বারা ভাগ করা হয়, যেখানে c হল অনুমিত কেন্দ্র এবং d হল পরিমাপমাত্রা অর্থাৎ সাধারণ দৈর্ঘ্য, যদি x_i-এর সংশ্লিষ্ট নতুন মানগুলি হয় y_i, তাহলে

অথবা $x_i = c + d$

অথবা $f_ix_i = f_ic + df_iy_i$

অথবা $\sum f_ix_i = c\sum f_i + d\sum f_iy_i$

অথবা $\sum f_ix_i = c + \sum f_iy_i$ যেখানে $\sum f_i = n$

অথবা

উদাহরণ—3 মাসিক আয় অর্জনকারীদের নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে যৌগিক গড় নির্ণয় কর :

মাসিক আয় : 200 এর নিচে 200–399 400–599 600–799 800–999 1000–1199

আয় অর্জনকারী সংখ্যা :25 72 47 22 13 7

যৌগিক গড় নির্ণয়ের জন্য ছক নং 3.1

শ্রেণীঅন্তর	পরিসংখ্যা (f)	শ্রেণীমধ্যক (x)		fy
0–199	25	99·5	–2	–50
200–399	72	299·5	–1	–72
400–599	47	499·5	0	0
600–799	22	699·5	1	22
800–999	13	899·5	2	26
1000–1199	7	1099·5	3	21
মোট	186	—	—	–53

যদি $y = (x - c)/d$ হয় তাহলে
এক্ষেত্রে $c = 499{\cdot}5$ এবং $d = 200$

$\therefore$ = 499·5 + 200 = 499·5 – 56·99 = 442·51 টাকা।

(ফ) যৌগিক গড়ের বৈশিষ্ট্য (Properties of A.M) : যৌগিক গড়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া হল :

(a) চলকের সংগৃহীত মানগুলি (values) যদি সবই সমান হয় তাহলে ঐ সাধারণ মানটি হবে সেগুলির যৌগিক গড়।

(b) x যদি y-এর এমন এক অপেক্ষক হয় যে x = a + by, তাহলে x এবং y-এর যৌগিক গড়ের মধ্যে সম্পর্কটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাবে :

(c) কোন এক চলকের যৌগিক গড় থেকে চলকের প্রতিটি মানের অন্তরের সমষ্টি শূন্য হয়।

(d) যদি কোন এক চলক x-এর মানগুলির দুটি গোষ্ঠীতে থাকে (two groups of values) এবং একটি গোষ্ঠীর n_1 সংখ্যক মান সহ যৌগিক গড় হয় এবং অপর গোষ্ঠীর n_2 মান সহ যৌগিক গড় হয় তাহলে সংযুক্ত রাশিতথ্যমালার যৌগিক গড় বা সংযুক্ত গোষ্ঠীর যৌগিক গড় নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়।

উদাহরণ : 20 জন বালিকার বয়সের গড় 15 বছর এবং 25 জন বালকের বয়সের গড় 24 বছর হলে বালক-বালিকার বয়সের গড় নির্ণয় কর—

ধরি বালিকার সংখ্যা = n_1 = 20, বালকের সংখ্যা = n_2 = 24

বালিকাদের গড় বয়স = 15, বালকদের বয়সের গড় = 24

ধরি হল সম্মিলিত বালক বালিকার গড় বয়স।

অতএব = বছর

(ব) গুণোত্তর গড় (Geometric mean—G.M) : একটি চলকের n সংখ্যক মান নিয়ে একটি শ্রেণীর গুণোত্তর গড় হল ঐ মানগুলির গুণফলের n তম মূল। এক চলক x এবং n সংখ্যক মানগুলি

যদি হয় x_1, x_2, ... x_n তাহলে উহাদের গুণোত্তর গড়, $x_G = \left(x_1, x_2 \ldots . x_n\right)^{\frac{1}{n}} = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$

পরিসংখ্যা বিভাজনের জন্য

$x_G = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i^{f_1}\right)^{\frac{1}{n}}$ যেখানে

(ভ) গুণোত্তর গড়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

(a) যদি চলকের প্রদত্ত মানগুলি সব সমান হয় তাহলে সেগুলির গুণোত্তর গড় হবে চলকটির সাধারণ মান (Common value)

(b) গুণোত্তর গড়ের লগ্ মান (Logarithim value) হল মানগুলি লগ্ মানের যৌগিক গড় (A.M of log values of the variable)

(c) x যদি y-এর এমন এক অপেক্ষক হয় যে $y = ax$, তাহলে y-এর মানগুলির গুণোত্তর গড় এবং x-এর মানগুলির গড়ের মধ্যে অনুরূপ সম্পর্কটি বজায় থাকবে অর্থাৎ $y_G = ax_G$

(d) দুটি চলকের গুণোত্তর গড়ের অনুপাত চলক দুটির অনুপাতের গুণোত্তর গড়ের সমান হবে।

অর্থাৎ

উদাহরণ : নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলির (Groups) সূচক এবং সংশ্লিষ্ট গুরুত্ব অনুসারে সাধারণ সূচক নির্ণয়ের জন্য গুণোত্তর গড়-এর প্রয়োগ কর :

গোষ্ঠী	:	A	B	C	D	E	F
গোষ্ঠীসূচক	:	118	120	97	107	111	93
গুরুত্ব	:	4	1	2	6	5	2

গুণোত্তর গড় নির্ণয়

গোষ্ঠী	গোষ্ঠীসূচক (x)	গুরুত্ব (f)	log x	f(log x)
A	118	4	2·0719	8·2876
B	120	1	2·0792	2·0792
C	97	2	1·9868	3·9736

গোষ্ঠী	গোষ্ঠীসূচক (x)	গুরুত্ব (f)	log x	f(log x)
D	107	6	2·0294	12·1764
E	111	5	2·0453	10·2265
F	93	2	1·9685	3·9370
মোট	—	20	—	40·6803

$$\log\ (\text{G.M}) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n} f_i(\log x_i) = \frac{40{\cdot}6803}{20} = 2{\cdot}0340$$

$\therefore$ G = anti log 2·0340 = 108·1

$\therefore$ নির্ণেয় গুণোত্তর গড় হল 108·1 (সাধারণ সূচক)

(ম) বিবর্ত যৌগিক গড় (Harmonic Mean) :

কোন একটি চলকের এক গুচ্ছ রাশিতথ্যের বিবর্ত যৌগিক গড় হল তথ্যরাশিগুলির অনোন্তকের যৌগিক গড়ের অনোন্তক। কোন এক চলক x-এর n সংখ্যক মান রাশিগুলি যদি $x_1, x_2 \ldots x_n$ হয় তাহলে চলকের বিবর্ত যৌগিক গড় (H.M) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{H.M} = \frac{n}{\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\ldots..+\frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{1}{x_1}\right)}$$ এ হল সরল বিবর্ত যৌগিক গড়।

উপরোক্ত n সংখ্যক মান রাশিগুলির সংশ্লিষ্ট গুরুত্ব যদি হয় যথাক্রমে $f_1, f_2 \ldots f_n$ তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বিবর্ত যৌগিক গড় নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{H.M} = \frac{n}{\frac{f_1}{x_1}+\frac{f_2}{x_2}+\ldots.+\frac{f_n}{x_n}} = \frac{n}{\sum\frac{f_i}{x_i}}$$ যেখানে

$n = f_1 + f_2 \ldots f_n$ এবং মান রাশিগুলির কোনটি কিন্তু শূন্য নয়।

বিবর্ত যৌগিক গড়-এর ব্যবহার কিন্তু খুবই সীমিত। এই পরিমাণ কিন্তু ক্ষুদ্রতম রাশিতথ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং বৃহত্তম রাশিতথ্যের উপর ন্যূনতম গুরুত্ব আরোপ করে। যখন রাশিতথ্যসমূহ অত্যধিক বড় মাত্রার কিম্বা অত্যধিক স্বল্পমাত্রায় হয় তখন মধ্যক হিসাবে যৌগিক গড় অপেক্ষা বিবর্ত যৌগিক গড় অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়।

উদাহরণ : একটি মটরগাড়ি 50 মাইল দূরত্ব চারবার অতিক্রম করে। প্রথম বার প্রতি ঘণ্টায় 50 মাইল বেগে, দ্বিতীয় বার প্রতি ঘণ্টায় 20 মাইল বেগে, তৃতীয় বার প্রতি ঘণ্টায় 40 মাইল বেগে এবং চতুর্থ বার প্রতি ঘণ্টায় 25 মাইল বেগে মটর গাড়িটি ঐ দূরত্ব অতিক্রম করে। মটর গাড়িটির গড় গতিবেগ নির্ণ কর।

সমাধান—চারটি গতিবেগের বিবর্ত যৌগিক গড় থেকে মটর গাড়িটির গড় গতিবেগ নির্ধারিত হবে।

সুতরাং গড় গতিবেগ (H.M) = $\frac{4}{\frac{1}{50}+\frac{1}{20}+\frac{1}{40}+\frac{1}{25}} = \frac{800}{27}$ = 30 মাইল প্রতি ঘণ্টায়।

(য) মধ্যমা (Median) : কোন চলকের মানগুলির মধ্যমা হল উর্দ্ধক্রম অথবা নিম্নক্রম অনুসারে সজ্জিত মান রাশিগুলির মধ্যতম মান (middle most value)। মধ্যমা কার্যত সমূহ রাশিতথ্যমালাকে এমন দুটি ভাগে ভাগ করে যে মানরাশির একটি ভাগের থেকে কম বা এর সমান হয় এবং অপর ভাগের থেকে অধিক অথবা এর সমান হয়।

তথ্যমালার মোট রাশিগুলির সংখ্যা অযুগ্ম (odd) হলে রাশিসমূহের একটি মধ্যতম রাশি পাওয়া যাবে এবং এই রাশিটি মধ্যমা বলে গণ্য হবে। কিন্তু মোট রাশির সংখ্যা যুগ্ম (even) হলে এরূপ দুটি রাশি পাওয়া যাবে যেগুলি মান অনুযায়ী রাশি শ্রেণীর মধ্যস্থানে থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে মধ্যস্থানে অবস্থিত রাশিদুটির যৌগিক গড় হল মধ্যমা। চলকের মান রাশিসমূহের সংখ্যা যদি $2n + 1$ (বিজোড়) হয় তাহলে মানের উর্দ্ধক্রম অথবা নিম্নক্রম অনুসারে সাজান রাশিগুলিকে $(n + 1)$ তম রাশিটি হবে মধ্যমা। পক্ষান্তরে মান রাশিগুলির মোট সংখ্যা যুগ্ম বা $2n$ হলে, মধ্যমা হবে n তম এবং $(n + 1)$ তম রাশি দুটির যৌগিক গড়। মধ্যমা যেহেতু একস্থান নির্ভর হয় সেহেতু মধ্যমা হল অবস্থানগত গড় (Positional average)।

উদাহরণ : 47, 49, 52, 80, 109, 112 এই শ্রেণীটির রাশির সংখ্যা অযুগ্ম—অর্থাৎ $2n + 1 = 7$ অথবা $2n = 6$ অথবা $n = 3$

অতএব $n + 1$ তম রাশি বা $(3 + 1 = 4)$ চতুর্থ রাশি 80 হলে এই শ্রেণীটির মধ্যমা।

এই রাশিমালাটিতে আরো একটি রাশি 40 অন্তর্ভুক্ত করা হলে রাশি সংখ্যা হয় যুগ্ম এবং সেক্ষেত্রে $2n = 8$ বা $n = 4$ সেক্ষেত্রে চতুর্থ রাশি 52 এবং পঞ্চম রাশি 80-এর যৌগিক গড় বা 66 হল মধ্যমা।

একটি বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয়ের পদ্ধতিটিও সরল। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র্য মানরাশির সংশ্লিষ্ট ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (স্বল্পতর ধরনের) নির্ণয় করা হয়। মোট পরিসংখ্যা যদি N হয় তাহলে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা $\frac{N+1}{2}$ সংশ্লিষ্ট মানরাশিটি হবে মধ্যমা।

অবিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয় কিছুটা জটিল। মধ্যমা নির্ণয় করার জন্য এরূপ পরিসংখ্যা বিভাজনটির শ্রেণীচলকে শ্রেণীসীমান্তের (Class boundaries) রূপান্তরিত করে এবং প্রতিটি শ্রেণী অন্তরের সংশ্লিষ্ট ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাগুলি দেখিয়ে পরিসংখ্যা বিভাজনটির পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং নিম্নের প্রদত্ত সূত্রের সাহায্যে মধ্যমা নির্ণয় করা হয়।

মধ্যমা (Median) =

যেখানে N হল চলকের মান রাশির সংখ্যা (Total no. of observation) বা মোট পরিসংখ্যা

L_1 হল মধ্যমা শ্রেণীর নিম্নতর শ্রেণী সীমান্ত (lower limit of the modal class)

F হল L_1-এর নিম্নের সকল শ্রেণীগুলির পরিসংখ্যার সমষ্টি অথবা মধ্যমা শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা

f_m হল মধ্যমা শ্রেণীর পরিসংখ্যা

c হল মধ্যমা শ্রেণীর দৈর্ঘ্য

উদাহরণ 1: (বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে) নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজনটি থেকে মধ্যমা নির্ণয় কর :

x	:	0	1	2	3	4	5	6	Total
f	:	7	44	35	16	9	4	1	116

সমাধান : **মধ্যমা নির্ণয়ের জন্য ছক**

x	f	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা
0	7	7
1	44	51
2	35	86
3	16	102
4	9	111
5	4	115
6	1	116 = N

এক্ষেত্রে $\frac{N+1}{2}$ = 58·5, ছকটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা 51 অপেক্ষা 58·5 বৃহত্তর কিন্তু পরবর্তী ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা 86 অপেক্ষা কম। সুতরাং 58·5 পরিসংখ্যা সংশ্লিষ্ট মান রাশিটি হবে ক্রমযৌগিক গড় 86 সংশ্লিষ্ট মান রাশি অর্থাৎ 2। অতএব নির্মেয় মধ্যমা = 2

উদাহরণ 2 : (অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে) নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে মধ্যমা নির্ণয় কর—

শ্রেণী সীমান্তগুলি :	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65	65-75
পরিসংখ্যা :	4	11	19	14	0	2

মধ্যমা নির্ণয়ের জন্য ছক

শ্রেণী সীমান্তগুলি	পরিসংখ্যা f	ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (স্বল্পতর ধরনের) cu. f (less than type)
15–25	4	4
25–35	11	15
(35–45)	19	34
45–55	14	48
55-65	0	48
65-75	2	50 = N

সমাধান : $\frac{50}{2} = \frac{N}{2}$, যেহেতু $15 < 25 < 34$ সেহেতু মধ্যমা শ্রেণী হল (35 – 45)

অতএব, $L_1 = 35$, $N = 50$, $F = 15$, $F_m = 19$, $c = 10$

$$\text{মধ্যমা} = 35 + \frac{25-15}{19} \times 10 = 35 + 5{\cdot}26 = 40{\cdot}26$$

(র) সংখ্যাগুরুমান (Mode) : কোন চলকের মান—রাশিসমূহের মধ্যে যে রাশিটির পরিসংখ্যা সর্বাধিক—অর্থাৎ যে মান—রাশিটি সর্বাধিক বার পাওয়া যায় তা সংখ্যাগুরুমান বলে অভিহিত হয়। কোন কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের একাধিক সংখ্যাগুরুমান থাকে। যে পরিসংখ্যা বিভাজনের একটিমাত্র সংখ্যাগুরুমান থাকে তা হল একসংখ্যাগুরুমানযুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজন (Unimodal frequency distribution)।

বিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে সংখ্যাগুরুমান নির্ণয় করা খুবই সহজ। পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে চলকের যে মানটির পরিসংখ্যা সর্বাধিক তা কেবল ছকটি পর্যবেক্ষণ থেকে সহজে নির্ধারণ করা যায়।

অবিচ্ছিন্ন চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে সংখ্যাগুরুমান নির্ণয় করা বেশ কিছুটা কষ্টসাধ্য। এরূপ ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুমান নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয়।

সংখ্যাগুরুমান (Mode) =

$$\text{অথবা } L_1 + \frac{d_1}{d_1 + d_2} i \qquad \text{যেখানে } f_1 - f_0 = d_1$$

$$\text{এবং } f_1 - f_2 = d_2$$

যেখানে L_1 সংখ্যাগুরুমান শ্রেণীর নিম্নসীমা

f_1 সংখ্যাগুরুমান শ্রেণীর পরিসংখ্যা

f_0 সংখ্যাগুরুমান শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা

f_2 সংখ্যাগুরুমান শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা

যে শ্রেণীটির পরিসংখ্যা বিভাজন সর্বাধিক সেই শ্রেণীটি হল সংখ্যাগুরুমান শ্রেণী।

উদাহরণ : 2·17 অংশে আয়তলেখ সম্পর্কিত আলোচনার উদাহরণটি অনুসারে সংখ্যাগুরুমান নির্ণয় করা যেতে পারে। 100টি দোকানের মাসিক মুনাফার (টাকায়) পরিসংখ্যা হল :

প্রতিটি দোকানের মুনাফা :	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600
দোকানের সংখ্যা (f) :	12	18	27	20	17	6

সমাধান : সংখ্যাগুরু শ্রেণী হল (200—300), কারণ এই শ্রেণী সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যা হল সর্বাধিক (27)

$1_1 = 200$, $f_1 = 27$, $f_0 = 18$, $f_2 = 20$, $c = 100$ এবং $d_1 = f_1 - f_0 = 9$,

$d_2 = f_1 - f_2 = 27 - 20 = 7$

$\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যাগুরুমান $= 200 + \frac{9}{9+7} \times 100 = 200 + 56{\cdot}25 = 256{\cdot}25$।

একক সংখ্যাগুরু সম্পন্ন পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে যৌগিক গড়, মধ্যমাও সংখ্যাগুরুমানের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পর্কটি বজায় থাকে।

যৌগিক গড় – সংখ্যাগুরুমান = 3 (যৌগিক গড় – মধ্যমা)

যৌগিক গড়, গুণোত্তর গড় ও বিবর্ত যৌগিক গড়ের মধ্যে সম্পর্কটি হল নিম্নরূপ:

যৌগিক গড় $\geq$ গুণোত্তর গড় $\geq$ বিবর্ত যৌগিক গড়।

তথ্যরাশিগুলি ক্রম অনুসারে সাজালে ঠিক মধ্যস্থিত তথ্যের মান হল মধ্যমা অনুরূপভাবে অবস্থানগতভাবে চলকের মান সম্পর্কিত আরও বিভিন্ন পরিমাপকগুলি উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন চতুর্থক (Quartiles) বা শতাংশক (Percentiles)। চলকে বিভিন্ন মানগুলিকে উর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে

তিনটি চতুর্থক পাওয়া যায়। ধরা যাক কোন একটি চলকের n সংখ্যক মানগুলিকে উর্দ্ধক্রম অনুসারে সাজান হয়েছে। তম স্থানে অবস্থিত চলকের মান রাশিটিকে প্রথম চতুর্থক বা নিম্ন চতুর্থক (First quartile) বলে, অনুরূপভাবে দ্বিতীয় চতুর্থক হল মধ্যমা এবং তম স্থানে অবস্থিত চলকের মান-রাশিটি হল তৃতীয় চতুর্থক (3rd quartile)। অনুরূপভাবে অবস্থানগতভাবে বিভিন্ন শতাংশকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ল) বিস্তৃতির পরিমাপসমূহ (Measures of Dispersion) : একটি চলকের বিভিন্ন মানগুলি সাধারণত: সমান হয় না। অনেক ক্ষেত্রে এই মানগুলি একটি অপরটির খুব নিকটবর্তী হয় আবার অনেক সময় একটি অপরটির অনেক দূরবর্তী হয়। একগুচ্ছ মানের বা একটি রাশিতথ্য শ্রেণীর যথাযথ প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য শ্রেণীটির গড় নির্ণয় ছাড়াও প্রদত্ত মান রাশিগুলির মধ্যে নৈকট্য বা পার্থক্য কতটা রয়েছে অথবা মান রাশিগুলি ওগুলরি গড়কে কেন্দ্র করে কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া প্রয়োজন। পরিসংখ্যা বিভাজনের এক পরিমাপক যার সাহায্যে এক শ্রেণীভুক্ত রাশিগুলির মধ্যে তারতম্য অথবা মধ্যবর্তী মান থেকে মানরাশিগুলি কতটা ছড়িয়ে (how scattered) রয়েছে তা প্রকাশ করা হয় তা হল বিস্তৃতির পরিমাপ। বিস্তৃতির (Dispersion) আলোচনায় সাধারণত গড় হতে বিভিন্ন রাশির ভেদ (Variation) বা বিচ্যুতি (Deviation) এর বিশ্লেষণ করা হয়।

বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায় :

1. প্রসার (Range)
2. গড় বিচ্যুতি (Mean deviation)
3. সম্যক বিচ্যুতি (Standard deviation)

(ব) প্রসার (Range) : প্রসার হল বিস্তৃতির সরলতম পরিমাপ। রাশিতথ্য শ্রেণীর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রাশিদ্বয়ের অন্তর হল ঐ রাশিতথ্য শ্রেণীটির প্রসার। প্রসার নির্ণয় করা অতীব সহজ, কিন্তু একে বিস্তৃতির সুষ্ঠু পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। মুক্ত শ্রেণীযুক্ত পরিসংখ্যা নিবেশনের ক্ষেত্রে প্রসার নির্ণয় করা যায় না। রাশিগুলির কেবলমাত্র বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম রাশিদ্বয়ের দ্বারাই প্রসার প্রভাবিত হয় এবং অন্যান্য রাশিগুলি উপেক্ষিত হয়। রাশিতথ্যমালার একটি রাশি অত্যাধিক বেশি বা কম হলে প্রসারের মাধ্যমে উক্ত রাশিতথ্যমালার স্বরূপ সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না।

উদাহরণ : ধরা যাক কোন একটি চলকের প্রদত্ত মানগুলি হল : 4, 7, 2, 1, 3, 5, –3
প্রসার (Range) নির্ণয় কর :

সমাধান : রাশিতথ্য শ্রেণীটির বৃহত্তম রাশি = 7 এবং ক্ষুদ্রতম রাশি = –3
অতএব চলকের প্রসার = 7 – (–3) = 10

উদাহরণ—2 : দুটি চলক x ও y-এর মধ্যে সম্পর্ক হল : $3y + 4x = 9$ এবং x চলকটির প্রসার হল 3, y চলকটির প্রসার নির্ণয় কর।

সমাধান : $3y + 4x = 9$

অথবা, $y = 3 -$

$\therefore$ প্রসার $(y) = \left|-\frac{4}{3}\right| \times 3 = 4$

(শ) গড় বিচ্যুতি (Mean Deviation) : চলকের প্রদত্ত মানগুলির কোন এক ধরনের গড় (মধ্যক বা মধ্যমা) থেকে মানগুলির চরম পার্থক্যসমূহের যৌগিক গড় হল গড় বিচ্যুতি। ধরা যাক x চলকটির n সংখ্যক বিভিন্ন মান হল $x_1, x_2, ... x_n$ এবং c হল অনুমিত গড় মান। অতএব অনুমিত গড় c থেকে গড় বিচ্যুতি হল :

$$MD_c = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - c\right|$$

যেহেতু সেহেতু যৌগিক গড় হতে গড় বিচ্যুতি হল কার্যত চরম গড় বিচ্যুতি

(Absolute Mean Deviation—AMD)

c-এর স্থলে বসাইয়া পাই

$\therefore$

আবার চলকটির n সংখ্যক প্রদত্ত মান $x_1, x_2, ...x_n$ -এর সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি ধরাযাক যথাক্রমে $f_1\ f_2\ .....\ f_n$ তাহলে

অনুরূপভাবে মধ্যমা (Median – me) থেকে গড় বিচ্যুতি হল :

$$MD_{me} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - me\right|$$

উদাহরণ—1 : 6 জন ব্যক্তির ওজন (কি. গ্রা. অনুসারে) 64, 60, 60, 64, 60, 64 হলে যৌগিক গড়ের ভিত্তিতে (চরম) গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর।

সমাধান : যৌগিক গড়

$\therefore \quad AMD_{\bar{x}} = \frac{1}{6}(3|60 - 62| + 3|64 - 62|) = \frac{12}{6} = 2$ কি. গ্রা.

উদাহরণ—2 : মধ্যমা হতে কোন চলকের প্রদত্ত মানগুলি 3, 9, 5, 1 এবং 2 এর গড় বিচ্যুতি (*MDme*) নির্ণয় কর।

সমাধান : প্রদত্ত মানগুলি ক্রমঅনুসারে হল 1, 2, 3, 5, 9

$\therefore$ মধ্যমা = 3

$\therefore$

= = 2·2

(ষ) গড় বিচ্যুতির কয়েকটি উপযোগী ফল : (Source useful results Absolute Mean Deviation) :

1. রাশিতথ্যগুলি পরিসংখ্যা ছকে দেওয়া থাকলে গড় বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য নিম্নের সূত্রগুলি ব্যবহার করা যায়।

2. মধ্যমার ভিত্তিতে নির্ধারিত গড় বিচ্যুতি সর্বনিম্ন (Least) হয়।

3. (i) হল যৌগিক গড় সম্পর্কিত গড় বিস্তারাঙ্ক (Co-efficient of Mean dispersion)

(ii) হল মধ্যমা সম্পর্কিত গড় বিস্তারাঙ্ক

(স) সমক বিচ্যুতি (Standard Deviation—SD) : বহুল ব্যবহৃত বিস্তৃতির পরিমাপ হল সমক বিচ্যুতি একটি চলকের বিভিন্ন মানযুক্ত রাশিগুলির যৌগিক গড় হতে বিভিন্ন রাশির বিচ্যুতিগুলির সমষ্টি শূন্য হলেও বিচ্যুতিগুলির বর্গের সমষ্টি ধনাত্মক সংখ্যা হয়। অতএব যৌগিক গড় থেকে রাশিগুলির বিচ্যুতির বর্গগুলির যৌগিক গড়ের বর্গমূলক সমক বিচ্যুতি বলা হয়। কোন একটি চলকের n সংখ্যক মানগুলি x_1, x_2 ..... x_n-এর যৌগিক গড় যদি $\bar{x}$ হয় তাহলে সমক বিচ্যুতি, (σ বা SD) হল :

যদি প্রদত্ত রাশিতথ্যমালা x_1, x_2 ..... x_n-এর সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি হয় যথাক্রমে f_1, f_2, ... f_n তাহলে $\sigma = SD = \sqrt{\frac{1}{n} f_i \sum_{i=1}^{n} (x - \bar{x})^2}$

গণনার সুবিধার জন্য সমক বিচ্যুতির সূত্রটিকে নতুন একটি রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে :

এখন, $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 2\sum x_i . \bar{x} + n\bar{x}^2$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n\bar{x}^2$$

$\therefore$ S.D বা $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}$

অনুরূপভাবে পরিসংখ্যা বিভাজনের মাধ্যমে সন্নিবেশিত রাশিতথ্যমালার জন্য সম্যক বিচ্যুতির সূত্রটি হল—

S.D বা $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum f_i x_i\right)^2}$

$(S.D)^2$ বা σ^2 কে ভেদমান (Variance) বলা হয়।

$\therefore \sigma^2$ বা ভেদমান $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i x_i^2 - \left(\frac{1}{n}\sum f_i x_i\right)^2$

(হ) সমক বিচ্যুতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

(1) চলকের সকল মানগুলি যদি সমান হয় তাহলে ঐ মানগুলির সমক-বিচ্যুতি হবে শূন্য। এর বিপরীতও প্রযোজ্য হয়।

প্রমাণ : ধরি x চলকটির n সংখ্যক মান x_i (যেখানে $i = 1$ থেকে n) $= c$ প্রতিটি i-এর জন্য।

অতএব $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} c = c$

তাহলে

বিপরীতভাবে ধরি $\sigma = 0$

অথবা $\sigma^2 = 0$

অথবা $\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2 = 0$

অথবা , এটা সম্ভব হতে পারে

যদি $x_i - \bar{x} = 0$ হয়

বা হয় প্রতিটি i-এর জন্য

অতএব যদি সমক বিচ্যুতি শূন্য হয় তাহলে চলকটির সকল মান পরস্পর সমান হবে।

(ii) সমক বিচ্যুতি ভিত্তির বা কেন্দ্রের পরিবর্তন নিরপেক্ষ (independents of origin) হয় কিন্তু পরিমাপ মাত্রার পরিবর্তনের (Change of scale) উপর নির্ভর করে।

প্রমাণ : ধরি x ও y দুটি চলকের মধ্যে সমকটি হল $y = a + bx$, এবং চলক দুটির সমক বিচ্যুতি হল যথাক্রমে σ_x, σ_y সেখানে a হল মূল অবস্থান বা ভিত্তি এবং b হল পরিমাপ মাত্রা (Scale)

$$y = a + bx$$

অতএব $y_i = a + bx_i \quad i = 1, 2, \ldots\ldots n$

তাহলে

সুতরাং প্রতি i-এর জন্য

$\therefore$

অথবা $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2 = b^2 \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$

অথবা $\sigma y^2 = b^2 \sigma x^2$

অথবা

সুতরাং সমক বিচ্যুতি মূল বিন্দু (= a) নিরপেক্ষ কিন্তু পরিমাপ মাত্রার (= b) উপর নির্ভরশীল। যদি প্রতিটি মান কোন একটি ধ্রুবক দ্বারা গুণ কিম্বা ভাগ করা হয়, তাহলে সমক বিচ্যুতিও সেইভাবে প্রভাবিত হবে।

(iii) ধরা যাক একটি চলক x-এর দুটি গুচ্ছ বা শ্রেণীর মান দেওয়া আছে। যদি একটি শ্রেণীর n_1 সংখ্যক মানের যৌগিক গড় এবং সমক বিচ্যুতি হয় যথাক্রমে এবং এবং অপর শ্রেণীটির

n_2 সংখ্যক মানের যৌগিক গড় এবং সমক বিচ্যুতি যদি হয় যথাক্রমে এবং তাহলে সম্মিলিত রাশিতথ্যমালার সম্যক বিচ্যুতি নিম্নলিখিত সূত্র থেকে পাওয়া যাবে :

যেখানে

এই সূত্রটি আরও সাধারণভাবে প্রকাশ করা যায় (চলকের যে কোন সংখ্যক মান শ্রেণীর জন্য)

$$N\sigma^2 = \sum n_i \sigma i^2 + \sum n_i d_i^2$$

যেখানে এবং $\bar{x}$ হল শ্রেণীগুলির সংযুক্ত যৌগিক গড় বা

উদাহরণ : 90 জন ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের প্রদত্ত পরিসংখ্যা ছক থেকে সমক বিচ্যুতি নির্ণয় কর :

প্রাপ্ত নম্বর :	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-99
ছাত্র সংখ্যা :	5	12	15	20	18	10	6	4

[I.C.W.A. June '76]

সমক বিচ্যুতি নির্ণয়ের জন্য ছক

শ্রেণীঅন্তর	পরিসংখ্যা (f)	মধ্যক (x)		f_y	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20-29	5	24·5	–3	–15	45
30-39	12	34·5	–2	–24	48
40-49	15	44·5	–1	–15	15
50-59	20	54·5	0	0	0
60-69	18	64·5	1	18	18
70-79	10	74·5	2	20	40
80-89	6	84·5	3	18	54
90-99	4	94·5	4	16	64
Total	90	—	—	18	284

তাহলে $\sigma_x = b\sigma_y$, এক্ষেত্রে 4 নং স্তম্ভে $y = \dfrac{x - 54{\cdot}5}{10}$

অতএব $a = 54{\cdot}5$ এবং $b = 10$

$$\sigma_y = \sqrt{3{\cdot}116} = 1{\cdot}77$$

$$\therefore \quad \sigma_x = 10 \times 1{\cdot}77 = 17{\cdot}7$$

সমক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে হল বিস্তারাঙ্ক (Co-efficient of dispersion)। বিস্তারাঙ্ক অনেক সময় শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। শতকরা হিসাবে প্রকাশিত বিস্তারাঙ্ককে ভেদাঙ্ক বা ভেদসহগ (Co-efficientof variation) বলা হয়,

সুতরাং ভেদাঙ্ক = $\times$ 100

অনুশীলনী

1. একটি গুণগত লক্ষণ এবং একটি চলকের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। প্রতিটির উদাহরণ দাও।
2. বিচ্ছিন্ন চলক ও অবিচ্ছিন্ন চলকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। প্রতিটির উদাহরণ দাও।
3. ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর : শ্রেণী সীমা, শ্রেণী সীমান্ত, পরিসংখ্যা ঘনত্ব, শ্রেণী মধ্যক।
4. হিস্টগ্রামের সংজ্ঞা দাও এবং কিভাবে হিস্টগ্রাম অঙ্কন করা হয়?
5. অগিভ (Ogiv) কি? কিভাবে তুমি একটি অগিভ অঙ্কন করবে?
6. নিম্নের পরিসংখ্যা বিভাজনের জন্য হিস্টগ্রাম ও অগিভ অঙ্কন কর :

ছাত্রদের উচ্চতা (সেন্টিমিটারে) :	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ছাত্রদের সংখ্যা :	9	12	21	26	17	9	3	2	1

7. নিম্নলিখিত রাশিতথ্যসমূহ থেকে একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরী কর :

7, 4, 3, 5, 6   3, 3, 2, 4, 3   4, 3, 3, 4, 4

3, 2, 2, 4, 3   5, 4, 3, 4, 3   4, 3, 1, 2, 3

8. প্রতি মিনিট অন্তর গৃহীত টেলিফোন কলের সংখ্যা সম্পর্কিত নিম্নের পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে যৌগিক গড়, মধ্যমা ও সংখ্যাগুরু মান নির্ণয় কর:

টেলিফোনের কলের সংখ্যা :	0	1	2	3	4	5	6	7	8
পরিসংখ্যা :	1	22	31	43	51	40	35	15	3

[Ans. : 3·90, 4, 4]

9. নিম্নের পরিসংখ্যা বিভাজনের থেকে প্রাপ্ত যৌগিক গড় হল 67·45 ইঞ্চি। f_1-এর মান নির্ণয় কর :

উচ্চতা (ইঞ্চিতে) :	60-62	63-65	66-68	69-71	72-74
পরিসংখ্যা :	15	54	f_1	81	24

[Ans. : 126]

10. নিম্নলিখিত রাশিতথ্যসমূহ থেকে মধ্যমা নির্ণয় করো :

শ্রেণীমধ্যক :	115	125	135	145	155	165	175	185	195	মোট
পরিসংখ্যা :	6	25	48	72	116	60	38	22	3	390

[Ans. : 153·8]

11. নিম্নলিখিত রাশিতথ্যসমূহের জন্য মধ্যমা থেকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় কর :

শ্রেণীঅন্তর :	2-4	4-6	6-8	8-10
পরিসংখ্যা :	3	4	2	1

[Ans. : 1·4]

12. নিম্নলিখিত পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে যৌগিক গড় ও সমক বিচ্যুতি নির্ণয় কর :

স্কোর :	4-5	6-7	8-9	10-11	12-13	14-15	মোট
পরিসংখ্যা :	4	10	20	15	8	3	60

[Ans. : 9·23, 2·48]

২.৩ দ্বিচলক রাশিতথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Bivariate Data)

কোন এক গোষ্ঠীর জন্য দুটি চলকের যুগপৎ নথিভুক্ত রাশিতথ্যসমূহ দ্বিচলক রাশিতথ্য (Bivariate data) বলে অভিহিত হয়। দ্বিচলক রাশিতথ্যের উদাহরণ হল : একটি শ্রেণীর ছাত্রদের ওজন ও উচ্চতার যুগপৎ রাশিতথ্যসমূহ অথবা কোন একটি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও একর পিছু উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত রাশিতথ্যসমূহ, অথবা কিছু সংখ্যক পরিবারের আয় ও ব্যয়ের রাশিতথ্যসমূহ। একই সঙ্গে দুটি চলকের মান সমন্বিত রাশিতথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য নতুন পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। অবশ্য প্রতিটি চলকের মান নির্দেশিত রাশিগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে ধরে প্রতিটি চলকের বিভিন্ন পরিমাপ, যথা—গড় এবং সমক বিচ্যুতি ($\bar{x}, \sigma_x, \bar{y}, \sigma_y$ যেখানে x ও y হল একটি গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র চলকদ্বয়) পাওয়া যায়। দ্বিচলক রাশিতথ্যসমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি বিষয় বিচার করতে হয়। **প্রথমত:** দুটি চলকের মধ্যে যদি সমন্ধ বা যোগ (Association) থাকে তার মাত্রা ও প্রকৃতি বিচার করতে হয়, **দ্বিতীয়ত:** যদি চলক দুটির মধ্যে সম্বন্ধ বা যোগসূত্র রয়েছে দেখা যায় তাহলে চলক দুটির মধ্যে একটিকে (নির্ভরশীল চলকে) অন্যটির (নিরপেক্ষ চলকের) গাণিতিক অপেক্ষক হিসাবে প্রকাশ করে, নিরপেক্ষ চলকের প্রতিটি মানের জন্য পরাধীন চলকটির মান বিচার করা হয় বা পাওয়া যায়। প্রথম বিষয়ের পর্যালোচনা যা চলক দুটির যৌথ মান পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞাপক তা হল **সহগতি বিশ্লেষণ** (Correlation analysis) সহগতি বিশ্লেষণে চলক দুটির পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিমাপক রূপে যে গুণাঙ্কের ধারণাটির অবতারণা করা হয় তাকে **সহগতি গুণাঙ্ক** (Correlation coefficient) বলা হয়। দ্বিতীয় বিষয়টির পর্যালোচনায় যেখানে চলক দুটিকে একটি গাণিতিক অপেক্ষক প্রকাশ করার প্রয়োজন হয়। তা **নির্ভরণ বিশ্লেষণ** (Analysis of regression) বলে অভিহিত হয়। দ্বিচলক তথ্য সমন্বিত উল্লিখিত আলোচনা হল দ্বিচলক বিশ্লেষণ (Bivariate Analysis)।

(ক) দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন (Bivariate friquency distribution) : যখন দ্বিচলক রাশিতথ্যসমূহ সংখ্যায় খুব বেশি হয় তখন ওগুলি একটি দুইমুখী পরিসংখ্যা ছকের মাধ্যমে সারিকৃত করা হয়। এরূপ **দ্বিচলক রাশিতথ্যসমূহের দ্বিমুখী পরিসংখ্যা বিভাজনকে দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন বলা হয়।** এরূপ পরিসংখ্যা বিভাজন তৈরী করার ক্ষেত্রে প্রতিটি চলকের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শ্রেণী নেওয়া হয়। ধরা যাক, x ও y চলক দুটির n জোড়া মান দেওয়া আছে। এবার x-এর জন্য K সংখ্যক শ্রেণী এবং y-এর জন্য L সংখ্যক শ্রেণি নেওয়া হলে দ্বিচলক পরিসংখ্যা ছকটিতে $K \times L$ কোষ (Cell) থাকবে এবং সমূহ শ্রেণীর পরিসংখ্যাগুলি নিয়ে তৈরী হবে দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন।

দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন সাধারণ আকার নিম্নের ছকটিতে প্রকাশ করা হল :

ছক নং 3.1

একটি দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন যেখানে *x* ও *y* চলক দুটির *n* সংখ্যক মান সন্নিবেশিত হয়েছে :

y / x	$y_0 - y_1$	$y_1 - y_2$	.....	$y_{j-1} - y_j$	.....	l y_{i-1} y_L	মোট
x_0–x_1	f_{11}	f_{12}		f_{1j}		f_{1L}	f_{10}
x_1–x_2	f_{21}	f_{22}		f_{2j}		f_{2L}	f_{20}
. . . .							
. . . .							
x_{i-1}–x_i	f_{i1}	f_{i2}		f_{ij}		f_{iL}	f_{i0}
. . . .							
. . . .							
x_{k-1}–x_k	f_{K1}	f_{K2}		f_{Kj}		f_{KL}	f_{K0}
মোট	f_{01}	f_{02}	.....	f_{0j}		f_{0L}	n

এক্ষেত্রে $f_{i0} = \Sigma f_{ij}$ এবং $f_{oj} = \Sigma f_{ij}$

উপরোক্ত ছকটিতে পরিসংখ্যাগুলির সারি সমষ্টি (row-totals) হল বিভিন্ন y এর মানগুলির সংখ্যা না ধরে x-শ্রেণীর মানগুলির সংখ্যা। সুতরাং প্রথম স্তম্ভ ও শেষ স্তম্ভ দুটি হল x চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন। যা দ্বিচলক বিভাজন সম্পর্কিত x-এর প্রান্তিক বিভাজন (Marginal distribution of x)। অনুরূপভাবে প্রথম সারি ও শেষ সারি যেখানে y-এর বিভিন্ন শ্রেণী ও সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাগুলি প্রকাশিত তা হল y চলকের পরিসংখ্যা বিভাজন বা y-এর প্রান্তিক বিভাজন (Marginal distribution of y)। আবার পরিসংখ্যাগুলির যে কোন বিশেষ স্তম্ভ দ্বারা y-এর প্রদত্ত মান সমূহের জন্য x-এর বিভিন্ন শ্রেণীর মানগুলির সংখ্য প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে পরিসংখ্যাগুলির যে কোন বিশেষ সারি দ্বারা প্রদত্ত x-এর জন্য y-এর বিভাজনের বিন্যাস (arrange of distribution of y for given x) প্রকাশিত হয়।

(খ) বিক্ষেপণ চিত্র (Scatter diagram) : বিক্ষেপণ চিত্র হল দ্বিচলক রাশিতথ্যসমূহের চিত্রের আকারে প্রকাশ। ধরা যাক x ও y চলক দুটির n সংখ্যক মান যুগল (n Pairs of values) দেওয়া আছে। অনুভূমিক অক্ষে x-এবং উলম্ব অক্ষে y-এর মানগুলি নির্দেশিত একটি দু-অক্ষবিশিষ্ট সমতলে প্রদত্ত প্রতিটি মান যুগল একটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। এভাবে n সংখ্যক মান যুগলের জন্য সকল বিন্দুগুলি সহ যে চিত্র অঙ্কন করা হয় তাকে বিক্ষেপণ চিত্র বলে। নিম্নে কয়েকটি **বিপেক্ষণ চিত্র** দেওয়া হল।

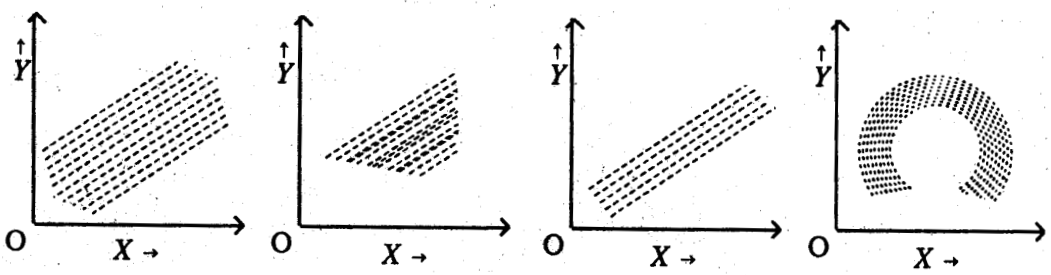

চিত্র 3.1 (a) চিত্র 3.1 (b) চিত্র 3.1 (c) চিত্র 3.1 (d)

বিক্ষেপণ চিত্র থেকে চলক দুটির মধ্যে যোগসূত্র বা সম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রগাঢ়তা (Nature and intensity) সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। 3.1(a) থেকে 3.1(d) চিত্রগুলি হল চার ধরনের দ্বিচলক রাশিতথ্যমালা। প্রথম তিনটি বিক্ষেপণ চিত্রে x ও y চলকের মধ্যে সরল সম্পর্ক (Linear association) প্রকাশ পেয়েছে ; কিন্তু 3.1(d) নং বিক্ষেপণ চিত্রে প্রদর্শিত চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক সরল নয় (Non-linear association)।

(গ) সহগতি (Correlation) : সহগতি বলতে দুটি চলকের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র বা নির্ভরশীলতা বোঝায়। চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক যদি এরূপ হয় যে একটির পরিমাণ বা মাত্রা (magnitude) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও পরিমাণ বা মাত্রার পরিবর্তন হয় তাহলে চলক দুটি সহগতিবদ্ধ (correlated) বলা হয়। সহগতি সরল হতে পারে অথবা সরল নাও হতে পারে। সুবিধার্থে সরল সহগতিমান নিয়ে আলোচনা করা হল।

চলক দুটি x ও y-গড়ে একই দিকে পরিবর্তিত হলে চলকদ্বয়ের মধ্যে ধনাত্মক বা সদৃশ সহগতি (Positive correlation) থাকে বলা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সহগতি সহগাঙ্ক ($= r_{xy}$) ধনাত্মক হয়। পক্ষান্তরে চলক দ্বয়ের মান বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হলে চলকদ্বয়ের মধ্যে ঋণাত্মক বা বিপরীত সহগতি (Negative correlation) রয়েছে বলে ধরা হয় এবং তখন সহগতি সহগাঙ্ক হয় ঋণাত্মক।

আবার চলকদ্বয়ের মধ্যে একটির মান পরিবর্তিত হলে অন্যটির মান যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ওদের মধ্যে সহগতি নেই বলে ধরা হয় এবং তখন সহগতি সহগাঙ্ক মান হয় শূন্য ($r_{xy} = 0$)।

(ঘ) গুণন পরিঘাত সহগতি সহগাঙ্ক অথবা কার্ল পিয়ারসন সহগতি সহগাঙ্ক (Product moment Correlation Coefficient of Karl Pearson's Coefficient of Correlation) : গুণন পরিঘাত সহগতি সহগাঙ্ক হল দুটি চলকের মধ্যে সরল সম্পর্কের একটি পরিমাপ (Measure) বিশেষ। x ও y চলক দুটির মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ক সাধারণত r_{xy} অথবা শুধু r দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত হয়।

$$, \quad \left[r_{xy} = \frac{\mathrm{Cov}(x, y)}{\sqrt{\mathrm{Var}\, x \;\; \mathrm{Var}\, y}} \right]$$

যদি (x_i, y_i) $(i = 1, 2 \ldots . n)$ হয় x ও y চলক দুটির n সংখ্যক মান যুগল তাহলে

Cov (x, y) = সমভেদমান (x, y) = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$

যেখানে $\bar{x}$ এবং হল যথাক্রমে x ও y-এর যৌগিক গড়

=

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\frac{1}{n}\sum_{i-1}^{n} x_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i\right)$$

$$= \frac{1}{n^2}\left[n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)\right]$$

Var (x) = ভেদমান (x) $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2$

=

$$= \frac{1}{n^2}\left[n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 \right]$$

অনুরূপভাবে,

Var (y) = ভেদমান (y) $= \frac{1}{n^2}\left[n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2 \right]$

$$\therefore \quad r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \overline{xy}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \bar{y}^2}}$$

$$= \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)}{\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}}$$

এই সূত্রটি শ্রেণীবদ্ধ নয় এমন রাশিতথ্যমালার সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হয়।

দুটি চালকের সহগতি সহগাঙ্ককে নিম্নলিখিতভাবেও প্রকাশ করা যায় :

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sigma_x \sigma_y}$$

যেখানে x ও y চলকদ্বয়ের যৌগিক গড় হল যথাক্রমে $\bar{x}, \bar{y}$ এবং সমক বিচ্যুতি হল যথাক্রমে

.

(ঙ) সহগতি সহগাঙ্ক-এর বৈশিষ্ট্য (Properties of Correlation Coefficient) :

(a) যেকোন দুটি চলকের সহগতি সহগাঙ্ক সম্পূর্ণরূপে একটি সংখ্যা (a pure number)—অর্থাৎ চলকগুলির পরিমাপ এককের নিরপেক্ষ (independent of units of measurement of the variables)। সহগতি সহগাঙ্কের এই বৈশিষ্ট্যটি এর সংজ্ঞা থেকে উল্লেখ করা যায়।

(b) x ও y চলক দুটির সহগতি সহগাঙ্ক r_{xy} কার্যত x ও y তে প্রতিসম (Symmetric) হয়—অর্থাৎ $r_{xy} = r_{yz}$

(c) সহগতি সহগাঙ্কের সংখ্যাগত মান চলকগুলির কেন্দ্র ও পরিমাপ মাত্রার পরিবর্তন নিরপেক্ষ হয় (independent of the change of origin and scales of the variables)

প্রমাণ : ধরি (x_i, y_i), $(i = 1, 2 \ldots n)$ হল x এবং y চলক দুটির বিভিন্ন মানযুগল, নতুন দুটি চলক u এবং v নেওয়া হল যেখানে $u =$ এবং $v =$ এবং a, b, c, d হল যেকোন ধ্রুবক এবং $c \neq 0$ এবং $d \neq 0$.

তাহলে $(x_i,\ y_i)$ মানযুগলগুলি সংশ্লিষ্ট $(u_i,\ v_i)$ মানযুগলসমূহ হবে

অতএব $x_i = a + cu,$

এবং $\bar{x} = a + c\bar{u}$

$\therefore$

অনুরূপভাবে,

অতএব ভেদমান

$$= \frac{c^2}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(u_i - \bar{u}\right)^2$$

$$= c^2 \text{ ভেদমান } (u)$$

ভেদমান [illegible]

$$= \frac{d^2}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(v_i - \bar{v}\right)^2 = d^2 \text{ ভেদমান } (v)$$

এবং সহভেদমান $(x,\ y) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)$

$$= \frac{cd}{n}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})$$

$$= cd \text{ সহভেদমান } (u,\ v)$$

অতএব, $r_{xy} = \frac{[illegible]\ (x,y)}{\sqrt{[illegible]\ (x)}\sqrt{[illegible]\ (y)}}$

$$= \frac{cd \text{ [illegible] } (u,v)}{\sqrt{c^2 \text{ [illegible] } (u)}\sqrt{d^2 \text{ [illegible] } (v)}}$$

$$=$$

যখন c এবং d একই চিহ্ন যুক্ত হয় (same sign)—অর্থাৎ উভয় ধ্রুবক হয় ধনাত্মক কিম্বা ঋণাত্মক তখন $r_{xy} > 0$ হয় এবং উৎস ধ্রুবক (c এবং d) যদি বিপরীত চিহ্নযুক্ত হয় তাহলে $r_{xy} > 0$ হয়।

(d) $-1 \leq r \leq 1$

ধরি (x_i, y_i) হল x ও y চলক দুটির n সংখ্যক মানযুগল যেখানে $i = 1, 2 \ldots n$.

অতএব $r = \dfrac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sigma_x \sigma_y}$

অথবা $r = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y_i - \bar{y}}{\sigma_y}\right)$ [illegible]

অথবা $r = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} p_i q_i$ যেখানে

$$\therefore \sum_{i=1}^{n} p_i q_i = nr$$

আবার

$$= \frac{n\sigma_x^2}{\sigma_x^2} = n$$

এবং অনুরূপভাবে,

$$\sum_{i=1}^{n} q_i^2 = n$$

এখন $\sum_{i=1}^{n} (p_i + q_i)^2 \geq 0$ (বাস্তব সংখ্যার বর্গগুলি সর্বদা ধনাত্মক নতুবা শূন্য হয়)

অথবা $\sum_{i=1}^{n} p_i^2 + \sum_{i=1}^{n} q_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n} p_i q_i \geq 0$

অথবা $n + n + 24r \geq 0$

অথবা $2n\ (1 + r) \geq 0$

অথবা $1 + r \geq 0$

$\therefore\ r \geq -1$ ..... (i)

আবার $\sum_{i=1}^{n} (p_i - q_i)^2 \geq 0$

অথবা $\sum p_i^2 + \sum q_i^2 - 2\sum_{i=1}^{n} p_i q_i \geq 0$

অথবা $n + n - 2rn \geq 0$

অথবা $2n\ (1 - r) \geq 0$

অথবা $1 - r \geq 0$

অথবা $r \leq 1$ ..... (ii)

(i) এবং (ii) থেকে প্রমাণিত হয় যে $-1 \leq r < 1$

(চ) শ্রেণীবদ্ধ রাশিতথ্যসমূহ থেকে সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র (Computation of Correlation Coefficient from Grouped Data) : ধরাযাক x ও y চলক দুটির n সংখ্যক মানযুগল একটি দ্বিচলক পরিসংখ্যা ছকে দেওয়া হয়েছে যেখানে x-এর জন্য K সংখ্যক শ্রেণী অন্তর এবং y-এর জন্য L সংখ্যক শ্রেণী অন্তর এবং সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে (3.1 নং ছক)। ধরা যাক f_{ij} হল (i, j) কোষের পরিসংখ্যা যেখানে $i = 1, 2 \ldots K$ এবং $j = 1, 2 \ldots L$. এবার যদি x_i এবং y_i যথাক্রমে x-এর i শ্রেণীর মধ্যক (Mid-value) এবং y-এর j শ্রেণীর মধ্যক হয় তাহলে

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{K}\sum_{j=1}^{L} f_{ij}\left(x_i - \bar{x}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{K} f_{io}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} f_{oj}\left(y_i - \bar{y}\right)^2}}$$

যেখানে $f_{io} = \sum_{j=1}^{L} f_{ij}$, $f_{oj} = \sum_{i=1}^{K} f_{ij}$, $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{K} f_{io} x_i$

এবং $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{L} f_{oj} y_j$

সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয়ের সুবিধার্থে x ও y-এর জন্য কেন্দ্র (origin) এবং পরিমাপের মাত্রা (scale) উভয়ই পরিবর্তন করা যায়।

ধরি $u = \frac{x - a}{c}$ এবং $v = \frac{y - b}{d}$ যেখানে a, b হল যথাক্রমে x ও y-এর প্রসারের মধ্যমান সন্নিকটস্থ শ্রেণীমধ্যক এবং c, d হল যথাক্রমে x ও y-এর শ্রেণী অন্তরের দৈর্ঘ্য c এবং d একই চিহ্নের (sign)।

$$r_{xy} = r_{uv} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i}^{K}\sum_{j}^{L} f_{ij}\left(u_i - \bar{u}\right)\left(v_j - \bar{v}\right)}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i}^{K} f_{io}\left(u_i - \bar{u}\right)^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j}^{L} f_{oj}\left(v_j - \bar{v}\right)^2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{n}\sum_{i}^{K}\sum_{j}^{L} f_{ij}u_i v_j - \bar{u}\bar{v}}{\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i}^{K} f_{io}u_i^2 - \bar{u}^2}\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{j}^{L} f_{oj}v_j^2 - \bar{v}^2}}$$

$$= \frac{\frac{1}{n}\sum_{i}^{K}\sum_{j}^{L} f_{ij} - \left(\sum_{i}^{K} f_{io}u_i\right)\left(\sum_{j}^{L} f_{oj}v_j\right)}{\sqrt{n\sum_{i}^{K} f_{io}u_j^2 - \left(\sum_{i}^{K} f_{io}u_i\right)^2}\sqrt{n\sum_{j}^{L} f_{oj}v_j^2 - \left(\sum_{j}^{L} f_{oj}v_j\right)^2}}$$

উদাহরণ 1 : প্রদত্ত তথ্য হতে স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সের সহগাঙ্ক নির্ণয় কর :

H	:	23	27	28	29	30	31	33	35	36	39	
W	:	18	22	23	24	25	26	28	29	30	32	[I.C.W.A]

সমাধান : ধরাযাক স্বামীর বয়স x এবং স্ত্রীর বয়স y

কেন্দ্রের পরিবর্তনে যেহেতু সহগাঙ্ক (r) অপরিবর্তিতথাকে x ও y-এর কেন্দ্র নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তন সাপেক্ষে সহগাঙ্ক নির্ণয় করা হল : $u_i = x_i - 31$, $v_i = y_i - 25$

সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য ছক

x	y	$u = x - 31$	$v = y - 25$	u^2	v^2	uv
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	18	–8	–7	64	49	56
27	22	–4	–3	16	9	12
28	23	–3	–2	9	4	6
29	24	–2	–1	4	1	2
30	25	–1	0	1	0	0
31	26	0	1	0	1	0
33	28	2	3	4	9	6
35	29	4	4	16	16	16
36	30	5	5	25	25	25
39	32	8	7	64	49	56
মোট 311	257	1	7	203	163	179

স্বামী ও স্ত্রী চলক দুটির সংখ্যা হল $n = 10$

$r_{xy} = r_{uv} =$

$$= \frac{1790 - 7}{\sqrt{2030 - 1}\sqrt{1630 - 49}} = \frac{1783}{\sqrt{2029}\sqrt{1581}} = \frac{1783}{\sqrt{3207849}}$$

$$= \frac{1783}{1791{\cdot}0469} = {\cdot}9955 = + {\cdot}996 \text{ (আসন্ন)}$$

উদাহরণ 2 : ছাত্রদের ইংরেজীতে (= x) এবং গণিতে (= y) প্রাপ্ত নম্বরের একটি দ্বিচলক পরিসংখ্যা

বিভাজনে নিম্নের ছকে প্রকাশ করা হল—এই দ্বিচলক পরিসংখ্যা বিভাজন থেকে ইংরেজী ও গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের সহগাঙ্ক নির্ণয় কর :

y / x	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	মোট
0–20	4	2				
20–40	6	5	3	1		
40–60		9	4	2	1	
60–80		7	4	1		
80–100			1			
মোট	10	23	12	4	1	50

ইংরেজী ও গণিতে প্রাপ্ত নম্বরের সহগাঙ্ক নির্ণয়ের গণনার জন্য ছক

শ্রেণীমধ্যক (x_i)		17·5	22·5	27·5	32·5	37·5					
শ্রেণী মধ্যক (y_i)	ui / v_j	–2	–1	0	1	2	f_{oi}	$f_{oj}v_j$	$f_{oj}v_j^2$	u_j	v_ju_j
10	–2	4	2				6	–12	24	–10	20
30	–1	6	5	3	1		15	–15	15	–16	16
50	0		9	4	2	1	16	0	0	–5	0
70	1		7	4	1		12	12	12	–6	–6
90	2			1			1	2	4	0	0
f_{io}		10	23	12	4	1	50	–13	55	–37	30
$f_{io}\ u_i$		–20	–23	0	4	2	–37				
$f_{io}u_i^2$		40	23	0	4	4	71				
v_i		–14	–2	3	0	0	–13				
$u_i\ v_i$		28	2	0	0	0	30				

মিলিয়ে নেওয়া (Cheek)

(i) ডেটা : প্রায় সমস্ত DBMS-এ যে ধরনের ডেটা রাখা যায় সেগুলি হল পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, অক্ষর বা টেক্সট, তারিখ এবং যুক্তিমূলক ডেটা (True বা False type) । কয়েকটি DBMS-এ ছবি এবং মাল্টিমিডিয়া ডেটাকেও রাখা যায়।

(ii) সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ : প্রায় সমস্ত DBMS-এ ডেটা বিশ্লেষণের সাধারণ পদ্ধতিগুলি থাকে, যেমন—Sort করা অর্থাৎ ছোটো থেকে বড় বা বড় থেকে ছোটো হিসাবে সাজানো, search করা বা নির্দিষ্ট ডেটা খুঁজে বের করা, সেগুলি filter করা অর্থাৎ খুঁজে একজায়গায় জড়ো করা ইত্যাদি। এগুলি সাধরণত কম্যান্ড হিসাবেই থাকে। এই কাজগুলি মনিটরে দেখতে পাওয়া যায় বলে ব্যবহারকারীর খুব সুবিধা হয়।

(iii) ডেটা কম্যানিগুলেশন লেঙ্গুয়েজ : ডেটাবেস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা, বিশ্লেষণ করা এবং উপস্থাপনা করার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয়, সেটি হল DML। এই DMLএক ধরনের query ল্যাঙ্গুয়েজ। আজকাল প্রায় সমস্ত DBMS-এ SQL (Structuered Query Language) ব্যবহার করা হয়।

(iv) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ : কয়েকটি DBMS-এ Query ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও, রেকর্ড স্তরে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরী করার জন্য অন্য আর একটি অবজেক্ট ওরিয়েন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে।

(v) ফাইল স্ট্রকচার : ডেটাবেস থেকে যাতে প্রয়োজনীয় ডেটা দ্রুত বের করা যায় তার জন্য সমস্ত ডেটাকে ফাইলের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে রাখতে হয়। প্রত্যেক DBMS-এর এরকম নিজস্ব পদ্ধতি আছে। তবে বেশীরভাগ BDMS সফটওয়্যার ওপেন ডেটাবেস কালেক্টিভিটি (ODBC) নামের একটি বিশেষ সংক্ষেপ ব্যবস্থার সাহায্যে অন্য ধরনের DBMS-এর সঙ্গে ডেটা আদান-প্রদান করতে পারে।

সম্পর্কযুক্ত ডেটাবেস বা রিলেশনাল ডেটাবেস : রিলেশনাল ডেটাবেস হল অনেকগুলি টেবিলের একটি সট। এই একাধিক টেবিলকে একসঙ্গে জুড়ে বা relate করে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করার এটি একটি পদ্ধতি। সাধারণত, ডেটাবেস তৈরী করার সময় ডেটাগুলিকে এমনভাবে বিভিন্ন টেবিলে ভাগ করে রাখা হয় যাতে একই ডেটা একাধিকবার এণ্ট্রি করতে না হয়। এই সমস্ত টেবিলে ছড়িয়ে থাকা ডেটা থেকে সম্পূর্ণ ডেটা পেতে হলে প্রয়োজনমত একাধিক টেবিলকে জুড়ে নিতে হয়। দুটি টেবিল জোড়ার জন্য দুটি টেবিলেই একটি common field থাকা দরকার, যাকে বলা হয় Key field। একটি টেবিল আর একটি টেবিলের সাথে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াই হল relationship বা সম্পর্ক স্থাপন। ডেটাবেসের বিভিন্ন টেবিলের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক বা relatonship থাকে বলেই এই ধরনের ডেটাবেসকে বলা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস।

রিলেশনার ডেটাবেস যে সফটওয়্যারের সাহায্যে তৈরী ও ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় রিলেশনাল ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (RDBMS)। এখানকার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য BDMS সফ্টওয়্যার আসলে RDBMS সফ্টওয়্যার, যেমন—Oracle, মাইক্রোসফট SQL Server, Informise, Microsoft Access ইত্যাদি।

(ii) ফিল্ড ও রেকর্ড : এক একটি টেবিলে অনেকগুলি রো (row) বা সারি ও কলাম (column) থাকে। এই প্রতিটি রো-কে বলা হয় **রেকর্ড** ও প্রতিটি কলামকে বলা হয় **ফিল্ড**। যে বিষয়ের জন্য টেবিলটি তৈরী, সেই সম্পর্কীত ডেটা এক একটি রেকর্ডে থাকে। অন্যদিকে ডেটা আইটেমগুলি টেবিলের কলামে রাখা হয়।

বস্তুত : ডেটবেস -এ সমস্ত ডেটাকে কেন্দ্রীয়ভাবে রাখা হয়। ফলে একটি ডেটাকে কেবলমাত্র একবার একজায়গায় এন্ট্রি করতে হয়। ডেটাগুলি পরস্পর সম্পর্কীত বলে ডেটাবেস থেকে সমস্ত জায়গায় ডেটা পাওয়া যায়। এছাড়াও একজায়গায় ডেটা পরিবর্তন করা হলে বাকি সমস্ত জায়গাতেই তার প্রতিফলন ঘটে। তবে কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা রাখা হলে কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরত্ব দিতে হয়। এগুলি হল ডেটার সুরক্ষা এবং গোপনীয়তা, ডেটার গুণমাণ ও ডেটার বিশুদ্ধতা।

● **ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** (Database Management System)

ডেটাবেস তৈরী ও ব্যবহার করার জন্য এক বিশেষ ধরনের প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়। এই প্রোগ্রামকে বলা হয় ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা সংক্ষেপে DBMS। DBMS-এর প্রধান কাজগুলি হল—

(i) প্রয়োজনীয় টেবিল তৈরী করা;

(ii) টেবিলে ডেটা এন্ট্রির ব্যবস্থা করা;

(iii) টেবিলে ডেটা এডিট করার ব্যবস্থা করা;

(iv) টেবিলগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করা;

(v) দ্রুত প্রয়োজনীয় তথ্য বের করা;

(vi) একসাথে একাধিক ব্যক্তি যাতে ডেটাবেস ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা করা,

(vii) ডেটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করা।

DBMS-এর প্রধান সুবিধা হল ব্যবহারকারী খুব সহজেই ডেটা ভরতে পারে, এডিট করতে পারে ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এজন্য তাকে কিভাবে ডেটাবেসটি তৈরী করা হয়েছে বা কিভাবে ডেটাগুলিকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে তা জনতে হয় না। বস্তুত DBMS নিজে কোনো ডেটাবেস নয় একটি সফটওয়্যার। একে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটাবেস তৈরী করতে হয়। যেমন, Excel-কে ব্যবহার করে কোনো স্প্রেডশিট তৈরী করা যায় বাMs-Word-কে ব্যবহার করে কোনো বিষয় লেখা যায়। সাধারণত দু'ধরনের DBMS সফ্টওয়্যার পাওয়া যায়—ডেস্কটপ DBMS এবং ক্লায়েন্ট/সার্ভার DBMS. মাইক্রোসফট্ Access হল একটি ডেস্কটপ DBMS এবং Oracle বা মাইক্রোসফট SQL Server হল ক্লায়েন্ট/সার্ভার DBMS । যেসব ক্ষেত্রে ডেটার পরিমাণ খুবই বেশী এবং ডেটা সুরক্ষার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেখানে ক্লায়েন্ট/সার্ভার DBMS ব্যবহার কার হয়। তবে সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণার ক্ষেত্রে ডেস্কটপ DBMS যথেষ্ট উপযোগী।

● **DBMS-এর বৈশিষ্ট :** DBMS-এর গুণগত বৈশিষ্ট্য যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি হল নিম্নরূপ :

তথ্যচিত্র তৈরি করা প্রয়োজন হয়। Excel -এ বিভিন্ন ধরনের চার্ট যেমন বার চার্ট, কলম চার্ট, লাইন চার্ট, পাই চার্ট, XY চার্ট, সারফেস চার্ট ইত্যাদি এছাড়া ত্রিমাত্রিক টার্টও Excel ব্যবহার করে তৈরি করা যায়। চার্ট তৈরি করার জন্য সাধারণত চার্ট উইজার্ড (Chart Wizard) এর সাহায্য নেওয়া হয়। মেনুবারে Insert–Chart-এ ক্লিক করে বা টুলবারের চার্ট উইর্জাড বার্টনে ক্লিক করে অগ্রসর হতে হয়। এর ফলে একটি চার্ট উইর্জাড উইন্ডো আসে যেখানে চারটি ধাপের সাহায্যে চার্ট তৈরী করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে সোশ্যাল ওয়ার্ক গবেষণায় বা সমীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য সহজে, নির্ভুলভাবে ও অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিশ্লেষণ করার জন্য গবেষকের MS-Excel সংক্রান্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকলে তার পক্ষে, গবেষণার কাজ চালানো অনেক সহজ হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি তৈরী করতেও বিশেষ সুবিধা হয় ও সময়ের সাশ্রয় ঘটে।

৩.৪ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট (Database Management)

গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত বা ডেটা সংগ্রহ করা হয়। এই ডেটাগুলি হল গবেষণার মূল ভিত্তি। কারণ সংগৃহীত ডেটাগুলি বিশ্লেষণ করে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিই গবেষণার ফলাফলকে চুড়ান্ত রূপ দেয়। আগে ডেটা সংগ্রহ থেকে বিশ্লেষণ প্রতিটি কাজই গবেষক বা সমীক্ষককে নিজের হাতে করতে হত। এতে শ্রম, সময় ও ব্যয় বেশী হত এবং ভুল থাকার সম্ভাবনাও অনেক বেশী ছিল। কম্পিউটার আসার পর এসব কাজ বর্তমানে কম্পিউটারই করে দেয় এবং অনেক নির্ভুলতা ও দ্রুততার সাথে এই কাজ করে দেয় বলে গবেষকের অনেক বেশী সুবিধা হয়। অবশ্য এজন্য গবেষকের কম্পিউটার অপারেটিং সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

ডেটাবেস হল যে কোনো ধরনের ডেটা কম্পিউটারে সঞ্চয় করে রাখার একটি সংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। ডেটা সঞ্চয় করে রাখার অন্য পদ্ধতির সাথে এর পার্থক্য হল যে ডেটাবেস থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য নির্ভুলভাবে বের করা যায়, গবেষণায় যেসব ডেটা সংগৃহীত হয়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কাজেই সেগুলি একসঙ্গে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এজন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ডেটা অ্যাকসেসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। ডেটাগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে না রাখা হলে সাধারণত দুটি প্রধান অসুবিধা হয়। এগুলি হল—কাজের বিভিন্ন স্তরে একই ডেটাকে অনেকবার এন্ট্রি করতে হয় এবং সমস্ত ডেটাকে একই সময়ে, একই জায়গায় একই সঙ্গে পাওয়া যায় না। ডেটাগুলি আলাদা আলাদা জায়গায় মজুত করে রাখলে অযথা সময় নষ্ট হয়, ডেটা মজুতের পরিমাণ বাড়ে ও ভুল হবার সম্ভবনা থাকে। ডেটাবেস তৈরি করার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা থাকা আবশ্যক। এগুলি হল :

(i) টেবিল : ডেটাবেসের মধ্যে এক বা একাধিক টেবিলে ডেটা রাখা থাকে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহের এক একটি বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কীত ডেটার জন্য এক একটি টেবিল থাকে। সমস্ত টেবিল মিলিয়ে ডেটাবেসটি তৈরী হয়।

আগে হিসাব করার জন্য এবং তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য স্প্রেডশিট ব্যবহার করা হত। কিন্তু কম্পিউটার আসার পর ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিট বা স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যারের প্রচলন শুরু হয়। কারণ সাধারণ স্প্রেডশিটের মূল অসুবিধা ছিল হাতে করে হিসাব করা। এতে সময় বেশী লাগত এবং হিসাবে অর্থাৎ যোগ-বিয়োগ ভুল হবার সম্ভাবনা থাকত। তাই হিসাব ঠিক হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে হত। তাছাড়া স্প্রেডশিটে যেসব তথ্য থাকত সেগুলি থেকে রিপোর্ট তৈরী করা অনেকসময়ই সম্ভব হত না।

গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের প্রাথমিক কাজ স্প্রেডশিট দ্বারা করা যায়। গবেষণায় সংগৃহীত বিভিন্ন ডেটা এবং স্প্রেডশিটে এন্ট্রি করে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায়। আর ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজটি কম্পিউটারই করে দেয়। কারণ বিভিন্ন পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতি এই সফ্‌টওয়্যারের মধ্যেই দেওয়া থাকে। ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিটে সাধারণ স্প্রেডশিটের অসুবিধাগুলি থাকে না। একটি জটিল গণনার ক্ষেত্রে কোনো একটি ডেটাকে পাল্টালে বাকী সমস্ত ডেটা নিমেষের মধ্যে আবার গণনা করে পাল্টে যায় এবং সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাপারটা একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আকর্ষণীয়ও বটে। এই সুবিধা সাধারণ স্প্রেডশিটে চিন্তা করাও যায় না। ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিটের মধ্যে (built in) হিসাব করার জন্য অজস্র ফর্মুলা থাকে, যেগুলি খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়, প্রথম দিকে পার্সোনাল কম্পিউটারের (P.C.) জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হল ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যার ও স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যারের ব্যবহার। বর্তমানে স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যার অনেক উন্নত হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত ফর্মুলাগুলি আর কেবল যোগ-বিয়োগ বা গুণ-ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। স্ট্যাটিসটিক্স, হায়ার ম্যাথমেটিক্স, ত্রিকোণমিতি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ফর্মুলা এতে যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও, চার্ট, রিপোর্ট, ডেটাবেস টেবিল এমনকি প্রোগ্রামিং সুবিধাও এতে যুক্ত করে বর্তমানে সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফিনান্স এবং অ্যাকাউন্টস সংক্রান্ত সমস্ত কাজের সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন এবং গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের কাজেও স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যারের ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছে।

Windows-এর Microsoft-Excel এরূপ একটি বহু-ব্যবহৃত সফ্‌টওয়্যার। এছাড়াও Lotus 1-2-3, Quattro Pro ইত্যাদি স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যার যেগুলি তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়। তবে এদেরও মধ্যে Excel সর্বাধিক জনপ্রিয়। MS-Office-এর যে চারটি ভাগ রয়েছে তার একটি হল Excel. অন্যগুলি হল Word, Access ও Power Point। Excel-এর আইকনটি সাদারণত প্রোগ্রাম মেনুর মধ্যে থাকে। এই আইকনে ক্লিক করলে মনিটরে স্প্রেডশিটটি ভেসে আসে। এই স্প্রেডশিটের প্রতিটি রো এবং কলাম নিয়ে যে এক-একটি ঘরের সৃষ্টি হয় তাদের বলে সেল (Cell)। এই প্রতিটি সেল-এর একটি ঠিকানা থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের গণনার ক্ষেত্রে যে ফর্মুলা ব্যবহার করা হয় তাতে এই Cell-এর ঠিকানা ব্যবহৃত হয়।

গবেষণার প্রতিবেদন তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকসময় চার্ট বা গ্রাফের প্রয়োজন হয়। কারণ ওয়ার্কশিটে যে সমস্ত ডেটা থাকে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি রেখা বা ছবির মাধ্যমে দেখতে পারলে অনেক বেশি সহজবোধ্য হয়। কারণ কেবলমাত্র সংখ্যা দেখে অনেকসময়ই তাদের ধরন বোঝা যায় না। সেজন্য পরিসংখ্যানমূলক

(vi) প্রয়োজনমাফিক যতখুশি লেখার প্রিন্ট পাওয়ার সুবিধা, এবং

(vii) লেখাকে মজুত (store) করে রাখার সুবিধা।

এর মধ্যে শেষের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ লেখা হল একধরনের তথ্য এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনের সময় সেটি দ্রুত ও নির্ভুলভাবে পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই কম্পিউটার হল এই কাজের আদর্শ মাধ্যম। কম্পিউটারে লেখা সংক্রান্ত এই কাজগুলি করাকে বলা হয় **ওয়ার্ড প্রসেসিং।** গবেষণার ক্ষেত্রে যেহেতু বিভিন্ন বিষয় লিখে রাখতে হয় তাই গবেষকের এ-ব্যাপারে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতপক্ষে ওয়ার্ড প্রসেসিং সিস্টেম এতটাই শক্তিশালী যে বর্তমানে এর সাহায্য ছাড়াই গবেষণা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। সংগৃহীত ডেটা কম্পিউটারে লিখে রাখা ও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার জন্য এই সিস্টেম খুবই কার্যকরী হয়।

ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রামের সাহায্যে লেখা কোনো বিষয় কম্পিউটারের ডিস্কে ফাইল হিসাবে রাখা থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী এক ফালি খোলা যায় ও পরিবর্তন করা যায়। এই প্রোগ্রামের সাহায্যে লেখার সময় পুরো বিষয়টি মনিটর-এ দেখা যায়। লেখার জন্য যে আকারের ও যে ধরনের অক্ষর ব্যবহার হয়, কি-বোর্ডে টাইপ করলেই ঠিক সেই অক্ষরগুলিই পাওয়া যায়। এছাড়া লাইন, অনুচ্ছেদ ও পাতার বিন্যাস যেভাবে করা হয়, মনিটরে ঠিক সেভাবেই দেখায়। ফলে পুরো বিষয়টি লিখতে সুবিধা হয়। ফাইলে লেখা ছাড়াও টেবিল, ছবি ইত্যাদিও রাখা যায়, এমনকি অন্য কোনো প্রোগ্রাম থেকে পাওয়া তথ্যও সরাসরি রাখা যায়। অক্ষর ও পাতার বিন্যাস ব্যবহারকারীর পছন্দের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ লেখায় যে কোনো বিন্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে বা একই বিন্যাস লেখায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

লেখার মধ্যে বানান বা ব্যাকরণ সংক্রান্ত কোনো ভুল থাকলে টাইপ করার সময়েই ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম সেটি দেখিয়ে দেয় এবং সেই অনুযায়ী কারেকশন করা যায়। পুরো লেখাটি বিষয় ও পছন্দ অনুযায়ী সাজানো হয়ে গেলে প্রিন্টারের সাহায্যে পুরো লেখাটির যত খুশি প্রিন্ট নেওয়া যায়। আবার প্রিন্ট করার আগে Print Preview থেকে সম্ভাব্য কপির প্রিন্টও দেখা যায় এবং প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায়। ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর জন্য সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যার হল MS-Word। তবে অন্যান্য ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যার যেমন Word-Perfect, Word Pro ইত্যাদির সাহায্যেও এই কাজ করা যায়।

৩.৩ ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিট (Electronic Spreadsheet)

সাধারণভাবে স্প্রেডশিট হল একধরনের হিসাবের খাতা যাতে অনেকগুলি রো (Row) এবং কলাম (Column) থাকে। এই রো এবং কলাম মিলিয়ে যে ঘরগুলি হয় তাতে বিভিন্ন হিসাব বা তথ্য লেখা হয়। স্প্রেডশিটে ইলম্ব লাইনগুলি কলাম ও সমান্তরাল লাইনগুলি রো-র সৃষ্টি করে। কম্পিউটার ব্যবহারের

সফ্‌টওয়্যারে। কম্পিউটার অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেই নির্দেশ পালন করে। সফ্‌টওয়্যার দু'ধরনের হয়। এগুলি হল—

(i) সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার : একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার হল অপারেটিং সিস্টেম (Operating system)। এটি না থাকলে কম্পিউটার চালানো যাবে না। এরূপ সফ্‌টওয়্যার-এর উদাহরণ হল Windows, Linux ইত্যাদি। এছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম সফ্‌টওয়্যারের হল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের (Programming language) কমপাইলার, যেমন—C^{++}, Fortran ইত্যাদি যার সাহায্যে সফ্‌টওয়্যার তৈরী করা যায়।

(ii) অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার : দৈনন্দিন কাজের জন্য যে সমস্ত সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাদের বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার। যেমন লেখার জন্য ওয়ার্ড প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যার MS-Word, Word Perfect ইত্যাদি, হিসাব করার জন্য স্প্রেডশিট সফ্‌টওয়্যার MS Excel, Lotus 1-2-3 ইত্যাদি, ছবি প্রসেসিং সফ্‌টওয়্যার Adobe Photoshop, Corel Photo Paint ইত্যাদি।

৩.২ ওয়ার্ড প্রসেসিং (Word Processing)

গবেষণার ক্ষেত্রে লেখার বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কারণ উপাত্ত ও তথ্য সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ই লেখার বিষয় হতে পারে। আগে কেবলমাত্র হাতে লেখাই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে টাইপরাইটারের উদ্ভব হলেও হাতে লেখার সমস্যাগুলি কিন্তু থেকেই গিয়েছিল। যেমন একই লেখার অনেক বেশি কপি পাওয়া সম্ভব হত না। লেখায় কোনো ভুল থাকলে পুরো লেখা আবার লিখতে হত। ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে যদিও এই অসুবিধাগুলি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছিল তবুও এর মেমরীর পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাছাড়া লেখার কোনো অংশ রঙিন করা, বড় করা, অক্ষরের ধরন সংক্রান্ত, টেবিল ও ছবি সংক্রান্ত সমস্যাগুলি থেকেই গিয়েছিল। এই সব সমস্যা কম্পিউটার উদ্ভাবনের সাথে সাথে নিরসন ঘটেছে। বর্তমানে কম্পিউটারের মাধ্যমে লেখার ক্ষেত্রে যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলি হল—

(i) ভালভাবে, নির্ভুলভাবে এবং সুবিধাজনকভাবে লিখতে পারা।

(ii) বিষয় অনুযায়ী অক্ষর, শব্দ, লাইন এবং পাতার সুষ্ঠু ও সুন্দর বিন্যাস করতে পারা,

(iii) প্রয়োজনবোধে অন্যান্য তথ্য, যেমন, ছবি, টেবিল, সমীকরণ ইত্যাদি যোগ করতে পারা ;

(iv) লেখার বানান ও ব্যাকরণ পরীক্ষা করার সুবিধা ;

(v) লেখা পরিবর্তন করার সুবিধা ;

কম্পিউটার সম্বন্ধে জানতে হলে দুটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা গড়ে তোলা দরকার। এগুলি হল— (1) কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যাদের এককথায় বলা হয় **হার্ডওয়্যার** (Hardware) এবং (2) যা দিয়ে কম্পিউটার চালানো হয় অর্থাৎ কম্পিউটারকে দিয়ে কাজ করানো হয়, যাকে এককথায় বলে **সফ্‌টওয়্যার** (Software)।

(1) কম্পিউটার হার্ডওয়্যার : কম্পিউটারের ভিতরে ও কম্পিউটারের সাথে যে যন্ত্রাংশগুলি লাগানো থাকে সেগুলিকে বলে হার্ডওয়্যার। অন্যভাবে বলা যায় কম্পিউটারের যেসব যন্ত্রাংশ আমরা দেখতে পাই, স্পর্শ করতে পারি এবং যাদের আকার ও আয়তন রয়েছে সেগুলিই হার্ডওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত। কম্পিউটারের মূল কাঠামোটিই হল হার্ডওয়্যার। এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হল :

(i) সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা CPU : এই যন্ত্রটি কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমস্ত ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে। সেজন্য একে প্রসেসর-ও (Processor) বলা হয়। এটিই হল কম্পিউটারের মূল অংশ। এই প্রসেসর যত শক্তিশালী হবে কম্পিউটারের তত বেশী ডেটা অল্প সময়ের মধ্যে প্রসেস করতে পারবে। বর্তমানে লার্জ স্কেল ইন্ট্রিগ্রেশন প্রযুক্তির সাহায্যে এর ক্ষমতা বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।

(ii) মূল মেমরী : প্রসেসরের শক্তি বাড়ালে অনেক বেশী ডেটা প্রসেস করা সম্ভব কিন্তু এই প্রসেসিং মূল মেমরীর পরিমাণের উপরও নির্ভরশীল। কারণ অনেক ডেটা প্রসেস করতে গেলে প্রসেসিং-এর সময় সেই ডেটা রাখার জন্য সমতুল মেমরীরও প্রয়োজন হয়। কারণ প্রসেসিং-এর সময় মেমরী থেকে প্রসেসরে ডেটা আদান-প্রদান হয়। সেকারণে বর্তমানে ডেটা মজুত করার জন্য ডিস্ক মেমরীর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

(iii) ইনপুট-আউটপুট ইউনিট : কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রির জন্য যেসব যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হয় তাদের এককথায় ইনপুট ডিভাইস (Input devise) বলা হয়। কম্পিউটারের সাথেই লাগানো কি বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার ইত্যাদি ইনপুট ডিভাইস-এর উদাহরণ। অন্যদিকে যেসব যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটার থেকে তথ্য বা ফলাফল পাওয়া যায় তাদের আউটপুট ডিভাইস (output devise) বলে। এরূপ যন্ত্রাংশের উদাহরণ হল মনিটর, প্রিন্টার, সাউন্ড বক্স ইত্যাদি।

(2) সফ্‌টওয়্যার : অসাধারণ দ্রুততায় গণনা করতে পারলেও কম্পিউটার আসলে একটি যন্ত্র মাত্র। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য এই যন্ত্রটিই যথেষ্ট নয় কারণ কম্পিউটার নিজে নিজে কাজ করতে পারে না। কম্পিউটারকে নির্দেশ (Command) দিলে তবেই সে কাজ করে। আর এই নির্দেশ দেওয়ার কাজটি সফ্‌টওয়্যার-এর মাধ্যমে পালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে সফ্‌টওয়্যার এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম। যে কাজটি করতে হবে সেটি কিভাবে করতে হবে তার নির্দেশ থাকে এই

গ বিভাগ ❐ সামাজিক কর্ম গবেষণায় কম্পিউটারের ব্যবহার (Use of Computer in Social Work Research)

একক : ৩

৩.১ কম্পিউটার কি?

৩.২ ওয়ার্ড প্রসেসিং

৩.৩ ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিট

৩.৪ ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট

৩.১ কম্পিউটার কি? (What is computer)

বর্তমান যুগকে কম্পিউটার যুগ বলা হয়। এটি হল একটি বহু উদ্দেশ্য সঠিক যন্ত্র। সেজন্য একে যন্ত্রগণক বা পরিগণকও বলা হয়। কম্পিউটার কথার অর্থ হল 'Common purpose users terminal' অর্থাৎ সাধারণ উদ্দেশ্যসাধক ব্যবহারকারীদের গন্তব্যস্থল। এই যন্ত্র মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে পারে এবং মানবিক কার্যকলাপের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এর উপস্থিতি ও ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মূলত তিনটি কাজ অত্যন্ত দ্রুত ও নির্ভুলভাবে করা যায়—(i) তথ্য সংগ্রহ (ii) তথ্য বিশ্লেষণ বা গণনা ও (iii) তথ্য মজুত। যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যবহার আজ সর্বজনস্বীকৃত এবং সোশ্যাল ওয়ার্ক রিসার্চের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে না।

বিগত চারদশকে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। তাই বর্তমানে analogue Computer-এর Digital Computer-এ উত্তরণ ঘটেছে। এছাড়াও ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী Desk Top Computer, Laptop Computer ও Super Computer-এর সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা কম্পিউটার-নির্ভর সভ্যতায় পরিণত হয়েছে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology)। আর এই প্রযুক্তির প্রধান স্তম্ভটি হল কম্পিউটার। কম্পিউটারের সাহায্যে সংগৃহীত **উপাত্তকে** (Data) **তথ্যে** (Information) পরিণত করা সম্ভব হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য মজুত করে রাখাও যায়।

Reference Books :

1. Spiegel M. R. : Theory and Problems of Probability and Statistics (Schaum's outline series) : Mc Graw Hill Book Co.
2. Goon A. M., Gupta M. K. & Das Gupta B. : An Outline of Statistical Theory, Vol. I & II (The World Press Pvt. Ltd.)
3. P. K. Giri & J. Banerjee : Statistical Tools and Techniques
4. Das N. G. : Statistical Methods Vol. I & II
5. Ghosh and Saha : Business Mathematics and Statistics
6. Nag N. K. : Business Mathematics

এক্ষেত্রে 6টি শ্রেণী আছে। $\therefore$ *d.f.* = 6 – 1 = 5

এবার যেহেতু χ-এর পর্যবেক্ষ লব্ধ মান 3·4 যা χ^2-এর প্রদত্ত মান অপেক্ষা কম ($\chi^2_{\cdot 01}$ = 15·09 *d.f.* 5-এর জন্য) যেহেতু H_0-কে 1% গুরুত্বের স্তরে বাতিল করা যায় না। মন্তব্য হল ছক্কা যে পক্ষপাত শূন্য এই অনুমানের সঙ্গে উপাত্তের পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। $\therefore$ ছক্কা পক্ষপাতশূন্য (unbiased)

অনুশীলনী

1. পরিসংখ্যানগত অনুমান (Hypothesis) বলতে কি বোঝ? অনুমানগুলি কয় প্রকার ও কি কি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

2. কয়েকটি ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও ঃ (i) স্ট্যাটিস্টিক, (ii) প্যারামিটার, (iii) গুরুত্বের স্তর, (iv) প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি।

3. অনুমানের পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ কর।

4. টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক ও χ^2 বিভাজন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

5. কোন সমগ্রক থেকে 10-এর একটি নমুনা নেওয়া হল। যৌগিক গড় থেকে প্রদত্ত নমুনার অন্তরগুলির বর্গের সমষ্টি হল 50। অনুমানটি যে সমগ্রকের ভেদমান গুরুত্বের 5 শতাংশ স্তরে হল 5।

[χ^2-এর টেবিল মান 5% স্তরে *d.f.* 9-এর জন্য হল 16,92] [Ans. (H_0 গৃহীত)]

6. মুদ্রাটি যথার্থ (perfect) কিনা পরীক্ষা করার জন্য তা 5 বার ছোঁড়া (toss) হল। মুদ্রার যথার্থতার (perfectness) নাল অনুমান বাতিল করা হয় যদি 4-এর অধিক বার হেড আসে। এক্ষেত্রে প্রথম ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা কি? যদি হেড আসার সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনা = 0·2 তাহলে দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা নির্ণয় কর। $\left[\text{Ans.}\ \frac{1}{32}, \frac{3124}{3125}\right]$

7. 5 জন শিশু রয়েছে এমন পরিবারের 320টির ক্ষেত্রে অনুসন্ধান লব্ধ রাশিতথ্যের বিভাজন নিম্নে দেওয়া হল :

বালকের সংখ্যা	:	5	4	3	2	1	0
বালিকার সংখ্যা	:	0	1	2	3	4	5
পরিবারের সংখ্যা	:	14	56	110	88	40	12

উপরোক্ত উপাত্তসমূহ কি এরূপ একটি অনুমানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ যে পুরুষ ও স্ত্রী জন্মের সম্ভাবনা সমান যেখানে ছকে উল্লিখিত χ^2-এর মান *d.f.* 5-এর জন্য গুরুত্বের 5% স্তরে হল 11·07 ?

[Ans. সম্ভাবনা সমান গৃহীত সিদ্ধান্ত]

যেহেতু χ^2 শূন্য নয় সেইহেতু উপাত্তগুলি নিরপেক্ষ নয় (data are not independent)। তবে χ^2-এর মান থেকে যোগসূত্রের অভিমুখ (direction of association) জানা যায় না। সিদ্ধান্তমূলক রাশিবিজ্ঞানে χ^2 ছক অথবা কমপিউটার প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় যোগসূত্রের মূল্যায়ন করার জন্য (for evalute the association)। x^2 ছকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে না গিয়ে এই ধরনের যোগসূত্র হঠাৎভাবে ঘটতে পারে এমনকি 1000 বারের মধ্যে 1-এর কমবার হতে পারে। 9টি কোষ (cell) সম্পন্ন ছকে $\chi^2 = 45{\cdot}7$ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় ·0001 স্তরে।

χ^2 বিভাজনে প্যারামিটার হল (degree of freedom) বা *d.f.*। *d.f.* কার্যত বর্গগুলির সমষ্টিতে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণগুলির সংখ্যা নির্দেশ করে। উপরোক্ত ক্ষেত্রে d.f. হল 1 যেহেতু একটি মাত্র সমক স্বাভাবিক চলকের বর্গ উল্লেখিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, ধরা যাক $z_1, z_2, \ldots z_k$ হল K সংখ্যক নিরপেক্ষ স্বাভাবিক চলকের একক—অর্থাৎ প্রতিটি z স্বাভাবিক সমসম্ভাবনামূলক চলক (Normal random variable) যার যৌগিক গড় হল শূন্য এবং ভেদমান = 1। এবার যদি প্রতিটি z-এর বর্গ নেওয়া হয় তাহলে দেখান যেতে পারে যে এই বর্গগুলির সমষ্টি একটি χ^2 বিভাজন প্রকাশ করবে যার *d.f.* হবে K

$$\sum z^2 = z_1^2 + z_2^2 + \cdots + z_k^2 \sim \chi^2(K)$$

উদাহরণ 1 ঃ একটি ছক্কা (die) 60 বার ছোঁড়ার ফলগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল। die বা ছক্কা পক্ষপাত-শূন্য (unbiased) এরূপ অনুমানের সঙ্গে প্রদত্ত উপাত্তসমূহ কি সংগতিপূর্ণ যেখানে $\chi^2_{\cdot 01} = 15{\cdot}09$ *d.f.* 5-এর জন্য—

তল (Face)	ঃ	1	2	3	4	5	6	Total
পরিসংখ্যা (f_0)	ঃ	6	10	8	13	11	12	60

H_0 হল যে ছক্কা পক্ষপাত শূন্য (unbiased) ঃ

$\therefore$ প্রতিটি তলের সম্ভাবনা $\frac{1}{6}$; যেহেতু পাশার তল হল 6টি।

এবং প্রত্যাশিত পরিসংখ্যা $(= f^c) = 60 \times \frac{1}{6} = 10$ প্রত্যেক ক্ষেত্রে

$\therefore$ f_0	:	6	10	8	13	11	12
f_1	:	10	10	10	10	10	10
$(f_0 - f_1)^2$	:	16	0	4	9	1	4

$$\therefore \quad \chi^2 = \frac{16}{10} + \frac{0}{10} + \frac{4}{10} + \frac{9}{10} + \frac{1}{10} + \frac{4}{10} = 3{\cdot}4$$

উপরোক্ত ছকের সংশ্লিষ্ট কোষে পর্যবেক্ষণলব্ধ মান = f_0 দেওয়া হয়েছে।
প্রত্যাশিত মান = [(স্তম্ভ সমষ্টি × সারি সমষ্টি) ÷ সামগ্রিক সমষ্টি] = f_e

ছাত্রদের উচ্চতা	গবেষণা প্রক্রিয়ার গ্রেড			
	C	B	A	(Total) মোট
সুউচ্চ (Tall)	17·5	15	17·5	50
মধ্যম উচ্চতা (Medium)	17·5	15	17·5	50
নিম্ন উচ্চতা (Short)	30	20	50	100
(Total) মোট	70	60	70	200

(উদাহরণ—সুউচ্চ পর্যায়ের ছাত্রদের C গ্রেডের প্রত্যাশিত মান = (70 × 50) ÷ 200 = 17·5)
উপরোক্ত ছকের সংশ্লিষ্ট কোষে (cell) প্রত্যাশিত মানগুলি উল্লিখিত হয়েছে (= f_1)
পর্যবেক্ষণলব্ধ মান ও প্রত্যাশিত মানের অন্তরের ছক (Difference Table)
অন্তর (Difference) = পর্যবেক্ষণলব্ধ মান (f_0) – প্রত্যাশিত মান (f_1)
(উদাহরণ—সুউচ্চ ছাত্রদের C গ্রেডের অন্তর সম্পর্কিত তথ্যরাশি = 30 – 17·5 = 12·5)

গবেষণা প্রক্রিয়ায় গ্রেড

ছাত্রদের উচ্চতা	গবেষণা প্রক্রিয়ার গ্রেড			
	C	B	A	(Total) মোট
সুউচ্চ (Tall)	12·5	–5	–7·5	0
মধ্যম উচ্চতা (Medium)	–7·5	15	–7·5	0
নিম্ন উচ্চতা (Short)	–5	–10	15	0
(Total) মোট	0	0	0	0

∴ χ^2 = (প্রতিটি অন্তরের বর্গের সমষ্টি) ÷ (সংশ্লিষ্ট কোষের প্রত্যাশিত মান)

$$= \sum \frac{f_0 - f_1}{f_1}$$

[উদাহরণ—সুউচ্চ ছাত্রদের C গ্রেডের ক্ষেত্রে $(12·5)^2 \div 17·5 = 156·25 \div 17·5 – 8·93$]

∴ χ^2 = প্রথম সারি (8·93 + 1·67 + 3·21) +
দ্বিতীয় সারি (3·21 + 15 + 3·21) +
তৃতীয় সারি (0·71 + 3·33 + 6·43) = 45·7

যেখানে K ধ্রুবক, n হল *d.f.*। যে চলকটি কাই-স্কয়ার বিভাজন অনুসরণ করে সেই চলকটিকে কাই-স্কয়ার চলক বলা হয়।

χ^2 বিভাজনের বৈশিষ্ট্য :

(1) যৌগিক গড় = n, সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{2n}$ যেখানে n হল χ^2 বিভাজনের *d.f.*

(2) χ^2 রেখা ধনাত্মক প্রতি বৈষম্যযুক্ত হয় এবং মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয়ে ডান দিকে অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(3) যদি x এবং y দুটি নিরপেক্ষ কাই-স্কয়ার চলকদ্বয় হয় যাদের d.f. হয় যথাক্রমে n_1 এবং n_2 তাহলে চলকদুটির সমষ্টি $(x + y)$ কার্যত χ^2 বিভাজন অনুসরণ করে যার *d.f.* হল $(n_1 + n_2)$

(4) যখন *d.f.* = n বৃহৎ হয় তখন $\sqrt{2\chi^2} - \sqrt{2n-1}$ আসন্নভাবে সমক স্বাভাবিক বিভাজন অনুসরণ করে।

χ^2 বিভাজন কার্যত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় ধরনের নমুনা পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। পর্যবেক্ষণলব্ধ মানগুলি কাল্পনিক বিভাজনের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আছে কিনা যাকে 'Goodness of fit' বলা হয় তা পরীক্ষা করার জন্য χ^2 বিভাজন ব্যবহৃত হয়। আবার গুণগুলির বা attributes-এর নিরপেক্ষতা পরীক্ষায় χ^2 বিভাজন ব্যবহার করা হয়। ক্ষুদ্র নমুনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখিত সমক বিচ্যুতি জন্যও পরীক্ষায় χ^2 বিভাজন ব্যবহার করা হয়। χ^2 বিভাজন প্রধানত ব্যবহৃত হয়।

(1) পর্যবেক্ষণভিত্তিক মান ও কাল্পনিক বিভাজনের মধ্যে সুসামঞ্জস্য আছে কিনা তার জন্য পরীক্ষা বা Goodness of fit Test

(2) গুণাবলীর মধ্যে নিরপেক্ষতা পরীক্ষা (Test for independence of attributes)

(3) বিশেষভাবে উল্লেখিত সমক বিচ্যুতির জন্য পরীক্ষা (Test for a specified standard deviation)

উদাহরণের সাহায্যে χ^2 পরীক্ষা (χ^2 – test) পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। নিম্নের উদাহরণে উচ্চতা এবং গ্রেডের মধ্যে যোগসূত্র ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল :

পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের ছক

ছাত্রদের উচ্চতা	গবেষণা প্রক্রিয়ার গ্রেড			
	C	B	A	(Total) মোট
সুউচ্চ (Tall)	30	10	10	50
মধ্যম উচ্চতা (Medium)	10	30	10	50
নিম্ন উচ্চতা (Short)	30	20	50	100
(Total) মোট	70	60	70	200

(Significant)। এর দরুন নাল অনুমান H_0-কে গুরুত্বের 5% স্তরে বাতিল করতে হয় এবং সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শহরের গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ ধূমপায়ী যা উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত।

(ঘ) কাই-স্কয়ার (χ^2) বিবাজন (Chi-Square (χ^2) Distribution) : কাই-স্কয়ার পরীক্ষা (χ^2 test) হল পরিসংখ্যানগত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া বহুল ব্যবহৃত এবং সরলতম পরীক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম। 1900 সালে কার্ল পিয়ারসন (Karl Pearson) সর্বপ্রথম এরূপ পরীক্ষা করেন। χ কার্যত তত্ত্বও পর্যবেক্ষণের মধ্যে তারতম্যের মাত্রা ব্যাখ্যা করে। নিম্নলিখিতভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় :

$$\text{কাই-স্কয়ার } = \chi^2 = \sum \frac{(f_0 - f_e)^2}{f_e}$$

যেখানে f_0 ও f_e হল যথাক্রমে পর্যবেক্ষণপ্রসূত পরিসংখ্যা এবং প্রত্যাশিত পরিসংখ্যা (Observed frequency and expected frequency)।

χ^2 দুভাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। বর্ণনামূলক রাশিবিজ্ঞানের শাখায় χ^2-এর দ্বারা দুটি চলকের মধ্যে যোগসূত্রের মাত্রা বোঝান হয়। পক্ষান্তরে রাশিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তমূলক শাখায় χ^2-এর মাধ্যমে কোন যোগসূত্র যা সম্ভাবনা নির্ভর তার সম্ভাবনা (Probability) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মাত্রাগত সংখ্যার দ্বারা প্রকাশযোগ্য চলকগুলির (attribute) ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

যখন যৌগিক গড় (μ_i) এবং ভেদমান σ_i^n সহ একটি স্বাভাবিকভাবে বিভাজিত সমসম্ভাবনা চলক X ধরা হয় (অর্থাৎ χ-এর বিভাজনটি একটি Normal distribution) অর্থাৎ $\chi \sim N(\mu, \sigma^2)$ তখন $z = \frac{(\chi - \mu)}{\sigma}$ হয় একটি সমক স্বাভাবিক চলক (Standard normal variable)—অর্থাৎ $z \sim N(0, 1)$। পরিসংখ্যানগত তত্ত্ব দেখায় যে একটি সমক সাধারণ চলক χ^2 বিভাজনের মত বিভাজিত হয় যার 'degree of freedom' (= d.f.) হল 1।

সাংকেতিকভাবে

χ^2 (1) = z^2 যেখানে (1) হল χ^2-এর d.f.

স্বাবাবিক বিভাজেনর যৌগিক গড় বা ভেদমান যেমন প্যারামিটার ঠিক তেমন χ^2 বিভাজনের প্যারামিটার হল d.f.

একটি সমসম্ভাবনা চলক χ কার্যত χ^2 বিভাজন অনুরূপ ধরা হবে যদি চলকটির সম্ভাবনা বিভাজন অপেক্ষকটি (*P.d.f.*) হয় :

$$f(x) = K.e^{-\frac{x}{2}}.\ x^{(n/2)-1};\ (0 < x < \infty)$$

করা মান ও সংকটপূর্ণ মান (Critical value) তুলনা করেই H_0 বাতিল করা বা অন্যভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(7) এবার উপসংহার সরলভাবে প্রকাশ করা হয়। যদি H_0 বাতিল করা হয় তাহলে ব্যাখ্যা হবে নিম্নরূপ ঃ অনুমান H_0 যে সত্য এর সঙ্গে উপাত্তগুলি (data) সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এই জন্য H_0 গ্রহণযোগ্য নয়। আবার H_0 যদি বাতিল করা না হয় তাহলে উল্লেখ করা হয় যে উপাত্তগুলি H_0-এর বিপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ দিতে পারে না এবং একারণে H_0 গ্রহণ করা যেতে পারে। উপসংহার কিন্তু সমস্যার বক্তব্য অনুসারে কথায় প্রকাশ করাই বিধেয়।

উদাহরণ ঃ একটি বড় শহরে 600 জন ব্যক্তির মধ্যে 325 জন ধূমপায়ী। এই তথ্য থেকে ধরা যেতে পারে কি শহরের গরিষ্ঠ সংখ্যক ব্যক্তি (Majority of the persons) ধূমপায়ী ?

সমাধান ঃ নাল অনুমান হয় যে সমগ্র শহরে ধূমপায়ীদের অনুপাত হল 50% অর্থাৎ $\frac{50}{100} = 0{\cdot}5$

$\therefore\ H_0\ (P = 0{\cdot}5)$

শহরে ধূমপায়ীদের অনুপাত 50%-এর অধিক কিনা বিচার কার আবশ্যক। অতএব বিকল্প অনুমানটি হল ঃ $H_1\ (P > 0{\cdot}5)$

নমুনায় ধূমপায়ীর অনুপাত হয় 600 = n-এর মধ্যে 325

নমুনা অনুপাত ব্যবহার করে,

পর্যবেক্ষণ লব্ধমান $(P) = \frac{325}{600} = 0{\cdot}542$

যদি H_0 সত্য হয় তাহলে,

প্রত্যাশিত মান $(P_0) = 0{\cdot}5$

এবং সমক ত্রুটি বা $S.E.(P) = \sqrt{\frac{0{\cdot}5(1-0{\cdot}5)}{600}} = 0{\cdot}0204$

টেস্ট স্ট্যাটিসটিক $z = \frac{\text{[illegible]} - \text{[illegible]}}{S.E.} = \frac{0{\cdot}542 - 0{\cdot}5}{0{\cdot}0204} = 2{\cdot}1$

যেহেতু বিকল্প অনুমান, $H_1\ (P > 0{\cdot}5)$ হয় একমুখী, সেইহেতু পরীক্ষার সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র (Critical region) হল একপ্রান্ত পর্যায়ী।

গুরুত্বের 5% স্তরে (at 5% level of significance) সংকটপূর্ণ ক্ষেত্র হয় $z \geq 1{\cdot}645$

উল্লেখ করা যেতে পারে যে z-এর জন্য সমক স্বাভাবিক রেখার প্রান্ত পর্যায়ের ক্ষেত্র হল 5% এবং তা $\geq 1{\cdot}645$।

টেস্ট স্ট্যাটিসটিক z-এর মান 2·1 যেহেতু Critical region-এর মধ্যে রয়েছে এবং তাই গুরুত্বপূর্ণ

(2) পরবর্তী পদক্ষেপ হল যথাক্রমে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক, T উল্লেখ কর। এবং নাল অনুমানটি সত্য এর পরিপ্রেক্ষিতে T-এর নমুনা বিভাজনটিও উল্লেখ কর। বৃহৎ নমুনা পরীক্ষায় (in large sample test) $z = \frac{(T-\theta_0)}{S.E(T)}$ যা আসন্নভাবে সমক স্বাভাবিক বিভাজন (Standard normal distribution) অনুসরণ করে প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু স্বল্প নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে, সমগ্রকটিকে স্বাভাবিক ধরা হয় এবং বিভিন্ন টেস্ট স্ট্যাটিসটিকগুলি ব্যবহার করা হয় যেগুলি প্রকৃতভাবে সম্যক স্বাভাবিক বিভাজন, কাই-স্কয়ার (chi-square), t বিভাজন অথবা F বিভাজন অনুসরণ করে।

(3) পরবর্তী পদক্ষেপ হল পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বের স্তর α নির্বাচন করা বা স্থির করা। যদি না তা সমস্যায় উল্লিখিত থাকে। এ হল প্রথম ধরনের ত্রুটি করার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা—অর্থাৎ একটি পরীক্ষা প্রক্রিয়া দ্বারা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যখন ঘটনাক্রমে নাল অনুমানটি প্রকৃতই সত্য। সাধারণত 5% অথবা 1% এর স্তর গুরুত্বের স্তর হিসাবে ধরা হয়। যখন এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ থাকে না তখন 5% এর স্তর ধরাই বিধেয়।

(4) পরবর্তী পদক্ষেপ হল গুরুত্বের পছন্দ করা স্তরে পরীক্ষার Critical region নির্ণয় করা এর দ্বারা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের একগুচ্ছ মানগুলি প্রকাশ করা হয় যেগুলি নাল অনুমান বাতিলের পক্ষে রায় দেয়। Critical region সর্বদা বিভাজনের একপ্রান্তের বা উভয় প্রান্তের পর্যায়ে দেখা দেয় যা বিকল্প অনুমান একমুখী না দুই-মুখী তার উপর নির্ভর করে। বিভাজনের দুই প্রান্ত পর্যায়ের ক্ষেত্র (area in the two tails) যা 'Critical region' বা সংকটজনক বলে অভিহিত হয় তা অতি অবশ্যই গুরুত্বের স্তর α-এর সমান হবে। এক প্রান্তিক পর্যায়ের পরীক্ষার জন্য α কার্যত বিভাজনের একপ্রান্ত পর্যায়ে প্রকাশ পায় এবং দু-প্রান্ত পর্যায়ের পরীক্ষায় $\alpha/2$ বিভাজনের প্রতি প্রান্ত পর্যায়ে প্রকাশ পায়। সংকটপূর্ণ এলাকা বা Critical region হল :

$T \geq T_{\alpha/2}$ অথবা যখন $H_1(\theta \neq \theta_0)$

$T \geq T_{\alpha}$ যখন

$T \leq T_{1-\alpha}$ যখন $H_1(\theta < \theta_0)$

যেখানে T_α হল T-এর এমন মান যে এর ডান দিকের ক্ষেত্রে হল α।

(5) পরবর্তী পদক্ষেপ হল নমুনা উপাত্তের ভিত্তিতে (on the basis of sample data) টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক T-এর মান নির্ণয় করা এবং H_0 গণনা করা। বৃহৎ নমুনা পরীক্ষায় যদি কিছু প্যারামিটার অজ্ঞাত হয় সেগুলি কার্যত নমুনা থেকে গণনা করা হয়।

(6) পরবর্তী পদক্ষেপ হল টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক, T-এর গণনা করা মান যদি সংকটপূর্ণ ক্ষেত্রে বা Critical region-এ থাকে তাহলে H_0-কে বাতিল করা ; নতুবা H_0-কে বাতিল না করা। T-এর গণনা

(8) গুরুত্বের স্তর (Level of Significance) : সর্বোচ্চ সম্ভাবনা যার ভিত্তিতে একটি সত্য নাল অনুমান (H_0) বাতিল করা হয় তাকে পরীক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বের স্তর বলে অভিহিত করা হয় এবং তা α দ্বারা নির্দেশিত হয়। সিদ্ধান্ত নিয়মগুলি রচনার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যাগত সিদ্ধান্তের গুরুত্ব অনুযায়ী গুরুত্বের স্তর (Level of significance) ইচ্ছামত (arbitrarily) স্থির করা হয়। প্রথাগতভাবে গুরুত্বের স্তর 5% অথবা 1% ধরা হয়। যদিও অন্যান্য স্তর যেমন 2% অথবা $\frac{1}{2}$% ও ব্যবহার করা হয়। প্রথম ধরনের ত্রুটি (Type 1 error) করার সম্ভাবনার উচ্চতর সীমা অর্থাৎ 'critical region'-এর আয়তন নির্দেশ করার জন্য গুরত্বের স্তর, α ব্যবহার করা হয়।

(9) প্রথম ধরনের ত্রুটি (Error of first type) : নাল অনুমানটি প্রকৃতই সত্য হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার দ্বারা তা বাতিল করা হলে যে ত্রুটি হল তাকে প্রথম ধরনের ত্রুটি বলে। 'Critical region'টি এমনভাবে নির্ধারিত যে প্রথম ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা কিন্তু পরীক্ষার গুরুত্বের স্তরকে ছাড়িয়ে যায় না।

(10) দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি (Error of second type) : অকার্যকর অনুমানটি প্রকৃতই মিথ্যা হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার ভিত্তিতে তা গৃহীত হলে যে ত্রুটি হয় তাকে দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটি বলে। দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা কার্যত বিকল্প অনুমান (H_1)-এর বিশেষভাবে উল্লেখিত মানের উপর নির্ভর করে এবং পরীক্ষার দক্ষতা মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।

(11) পরীক্ষার ক্ষমতা (Power of the test) : একটি মিথ্যা নাল অনুমান বাতিল করার সম্ভাবনাকে পরীক্ষাটির ক্ষমতা বলা হয়। সুতরাং 'ক্ষমতা' (power) হল পরীক্ষার দ্বারা সঠিক উপসংহার টানা যখন নাল অনুমানটি মিথ্যা। বিকল্প অনুমান (H_1)-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্যারামিটারে বিশেষভাবে স্থিরিকৃত একটি মানের জন্য ক্ষমতা = 1—দ্বিতীয় ধরনের ত্রুটির সম্ভাবনা। বিশেষভাবে স্থিরিকৃত সকল বিকল্পগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 'ক্ষমতা' (power) যদি লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাহলে যে রেখাটি পাওয়া যায় তাকে ক্ষমতা রেখা (power curve) বলে অভিহিত করা হয়।

(গ) অনুমানের বা গুরুত্বের পরীক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ (Steps in test of Hypothesis or Significance) :

(1) প্রথম পদক্ষেপ হল নাল অনুমান H_0 এবং বিকল্প অনুমান H_1 স্থির করা বা উপস্থাপিত করা। প্রদত্ত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে H_0 এবং H_1 স্থির করতে হয়। নাল অনুমান সাধারণত সমগ্রক সংশ্লিষ্ট কোন প্যারামিটারের মান সম্পর্কিত অনুমান হয়ে থাকে। H_0 ($\theta = \theta_0$), যেখানে θ হল একটি প্যারামিটার এবং θ_0 প্যারামিটারটির অনুমিত মান। এবার বিকল্প অনুমান, H_1 নিম্নের যে কোন একভাবে হতে পারে $H_1(\theta \neq \theta_0), H_1(\theta > \theta_0), H_1(\theta < \theta_0)$ বিকল্প অনুমানের ধরনটি কার্যত এক-প্রান্ত পরীক্ষা (One-tail Test) হবে না দুই-প্রান্ত পরীক্ষা (Two-tail test) হবে তা স্থির করে দেয়।

(3) অনুমান পরীক্ষা বা গুরুত্ব পরীক্ষা (Test of Hypothesis or Test of significance) : বিচার্য অনুমানটি গ্রহণ করা হবে কিম্বা বাতিল করা হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একগুচ্ছ নিয়মাধীন এক প্রক্রিয়া হল অনুমান পরীক্ষা (Test of Hypothesis) বা গুরুত্ব পরীক্ষা (Test of significance)।

(4) নাল বা অকার্যকর অনুমান (Null hypothesis) : এ হল পরিসংখ্যানগত এমন একটি অনুমান যে অনুমানের বলবৎযোগ্যতা কার্যত নমুনা পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে (on the basis of sample observations) সম্ভাব্য বাতিল করার পক্ষে পরীক্ষিত হয়। নাল অনুমান সাধারণত H_0 দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং বিকল্প অনুমানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা হয় অনুমান পরীক্ষা (Test of hypothesis) কার্যত শুধু নাল অনুমান গ্রহণ অথবা বাতিলকরণ সম্পর্কিত হয়।

(5) বিকল্প অনুমান (Alternative hypothesis) : একটি পরিসংখ্যানগত অনুমান বা নাল অনুমান থেকে পৃথক বা ভিন্নতাকে একটি বিকল্প অনুমান বলে এবং তা সাধারণত H_1 দ্বারা নির্দেশিত হয়। বিকল্প অনুমান পরীক্ষা করা হয় না কিন্তু এই অনুমান গ্রহণ করার (বা বাতিল করার) সিদ্ধান্তটি কার্যত নির্ভর করে নাল অনুমানটি বাতিল করার (বা গ্রহণ করার) উপর। নাল অনুমানের বিপরীত হয় বিকল্প অনুমান। যথাযথ সংকটপূর্ণ এলাকা (Critical region) নির্বাচন কার্যত বিকল্প অনুমানের ধরনের উপর নির্ভর করে।

(6) টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক (Test statistic) : নমুনা পর্যবেক্ষণসমূহের একটি পরিমাপক বা একটি স্ট্যাটিস্টিক যার গণনাকৃত মানের ভিত্তিতে H_0 গ্রহণ করা অথবা বাতিল করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয় তাকে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক বলা হয়। অতি সতর্কতার সহিত যথোপযুক্ত টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের নমুনা বিভাজন সম্পর্কে ধারণা থাকা আবশ্যক। টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকের মান যদি সঙ্কটপূর্ণ এলাকার (critical region) মধ্যে পড়ে তাহলে অকার্যকর অনুমান বাতিল করা হয়।

(7) সংকটপূর্ণ এলাকা (Critical region) : সংকটপূর্ণ এলাকা বা 'Critical region' বলতে স্টেট স্ট্যাটিস্টিকের একটি সেট বা দলকে বোঝায় যেগুলি নাল অনুমান বাতিল করার পথ প্রদর্শন করে। একটি সত্য নাল অনুমান পরীক্ষা সাপেক্ষে বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়শই critical region-এর আকার নির্দিষ্ট করে। জ্যামিতিকভাবে n আকার বিশিষ্ট $(x_1, x_2 \ldots x_n)$, একটি নমুনা একটি বিন্দুর (x) দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই বিন্দুকে নমুনা বিন্দু (Sample point) বলে এবং যে জায়গায় বা সমতলে সম্ভাব্য সকল নমুনা বিন্দুগুলি থাকে তাকে 'স্যাম্পল স্পেস' (Sample space) বলে (w)। অতএব 'Critical region'-কে (Sample space) w-এর সেই সকল নমুনা বিন্দুর একটি উপদল (Subset) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে সকল নমুনা বিন্দুগুলির জন্য নাল অনুমান বাতিল করতে হয়।

২.৬ পরিসংখ্যাগত অনুমানসমূহের পরীক্ষা (Test of Hypothesis)

বহু ব্যবহারিক সমস্যার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যায়কদের নমুনা পর্যবেক্ষণসমূহের ভিত্তিতে পরিসংখ্যাগত সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়। **উদাহরণস্বরূপ**, একটি সমসম্ভাবনা নমুনা দেওয়া থাকলে, যে সমগ্রক থেকে নমুনাচয়ন করা হয়েছে তা যৌগিক গড় = 40 এবং সম্যকবিচ্যুতি = 3 সহ একটি স্বাভাবিক বিভাজন (Normal distribution) কিনা সে বিষয়টি ঠিক করার প্রয়োজন হতে পারে, এরূপ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় সমগ্রকের বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে কিছু অনুমান ও আন্দাজ করা আবশ্যক হয় বিশেষত সম্ভাবনা বিভাজন অথবা প্যারামিটারের মান সম্পর্কে কিছু অনুমান করার প্রয়োজন পড়ে। এরূপ অনুমান অথবা সমগ্রক সম্পর্কে বক্তব্যকে পরিসংখ্যাগত অনুমান (Statistical hypothesis) বলা হয়। নমুনা বিশ্লেষণ করে অনুমানের বলবৎযোগ্যতা পরীক্ষা করা হয়। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন বিশেষ অনুমান সত্য কিম্বা সত্য নয় তা নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুমানের পরীক্ষা (Test of hypothesis) অথবা গুরুত্বের পরীক্ষা (Test of significance) বলা হয়।

(ক) পরিসংখ্যাগত অনুমিতি বা সিদ্ধান্ত (Statistical Inference) ঃ নমুনা বিশ্লেষণের মুখ্য উদ্দেশ্য হল নমুনা নামে সমগ্রকের একটি অংশ পরীক্ষা করে সমগ্রক সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তকে পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্ত (Statistical inference) বলা হয়। নমুনাগত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সমগ্রকের পরিসংখ্যাগত পরিমাপক (সমগ্রক যৌগিক গড়, সমগ্রক ভেদমান ইত্যাদি) বা প্যারামিটার গণনা করা এবং প্যারামিটারগুলি সম্পর্কে অনুমান পরীক্ষা করা—এই দুটি হল পরিসংখ্যানগত সিদ্ধান্তসমূহের দুটি প্রধান শাখা। সুতরাং সমগ্রকের প্রকৃতি বা গঠন সম্পর্কে অথবা প্যারামিটার সম্পর্কে অনুমানকে পরিসংখ্যাগত অনুমান বলা হয়। এরূপ অনুমান সরল অথবা যৌগিক (Simple বা Composite) হতে পারে।

(খ) কতকগুলি উপযোগী ধারণা (Some useful concepts) :

(1) সরল অনুমান (Simple hypothesis) : পরিসংখ্যাগত যে অনুমান সমগ্রককে সম্পূর্ণরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ করে (অর্থাৎ সম্ভাবনা বিভাজন, অপেক্ষকগত ধরন এবং সব প্যারামিটারগুলি জ্ঞাত) তাকে সরল অনুমান বলে।

(2) যৌগিক অনুমান (Composite hypothesis) : পরিসংখ্যাগত যে অনুমান সমগ্রককে সম্পূর্ণরূপে বিশেষভাবে উল্লেখ করে না। (অর্থাৎ সম্ভাবনা বিভাজনের ধরন অথবা কিছু প্যারামিটার অজ্ঞাত) তাকে যৌগিক অনুমান বলে।

universe) বলে। পক্ষান্তরে সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত এককের সংখ্যা অসীম হলে তাকে **অসীম সমগ্রক** (Infinite population or universe) বলে। **উদাহরণ স্বরূপ,** কোন এক অঞ্চলে অবস্থিত গৃহসমূহের সমগ্রক হচ্ছে সসীম সমগ্রক, পক্ষান্তরে গৃহের বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়াগত চাপের সমগ্রক (Population of atmospheric pressures) হল অসীম।

সমগ্রক আবার অস্তিত্ব সম্পন্ন (esistent) অথবা কাল্পনিক (hypothetical) হতে পারে। সমগ্রকের একগুলির বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে সেই সমগ্রককে অস্তিত্ব সম্পন্ন সমগ্রক বলে। পক্ষান্তরে সমগ্রক যদি কাল্পনিক একক নিয়ে গঠিত হয় তাকে কাল্পনিক সমগ্রক বলা হয়।

নমুনাচয়ন (Sampling) সাধারণভাবে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মানসিক (Subjective) এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বা বিষয়গত (Objective)। মানসিক নমুনাচয়নের ক্ষেত্রে এককগুলির নির্বাচন নমুনাচয়নকারীর বিচার বিবেচনা অথবা স্বেচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। বিষয়গত নমুনাচয়নের ক্ষেত্রে কিন্তু এক বিশেষ নিয়ম অনুসারে এককগুলি নির্বাচন করা হয়। সুতরাং বিষয়গত নমুনাচয়ন কার্যতঃ নমুনাচয়নকারীর বিচার বিবেচনা নিরপেক্ষ হয়।

নমুনাচয়ন আবার সম্ভাবনা নিরপেক্ষ, সম্ভাবনা ভিত্তিক ও মিশ্র এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এককগুলি চয়নের ক্ষেত্রে যখন কোনরূপ সম্ভাবনার বিষয়টি জড়িত থাকে না। কেবল বিশেষ নিয়ম অনুসারে নমুনাচয়ন করা হয় তা হল **সম্ভাবনা-নিরপেক্ষ নমুনাচয়ন** (Non-Prabalistic Sampling)। নমুনাচয়নের ক্ষেত্রে যখন সমগ্রকের প্রতিটি একক নির্বাচিত হওয়ার সমসম্ভাবনা থাকে তাকে **সমসম্ভাবনা নমুনাচয়ন** (Random sampling) বা **সম্ভাবনাভিত্তিক নমুনাচয়ন** (Probalistic sampling) বলা হয়। অংশত সম্ভাবনাভিত্তিক এবং অংশত সম্ভাবনা নিরপেক্ষ নমুনাচয়ন হল **মিশ্র নমুনাচয়ন** (Mixed sampling)।

২.৫ নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Sampling Methods)

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বা উপায়ে নমুনা চয়ন করা হয় নমুনাচয়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। নমুনাচয়নের এই পদ্ধতিগুলি হল ঃ (1) সরল সমসম্ভাবনাযুক্ত নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Simple Random Sampling Method), (2) উদ্দেশ্যমূলক নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Purposive Sampling Method), (3) স্তরবিন্যস্ত নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Stratified Sampling Method), (4) পদ্ধতি মাফিক নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Systematic Sampling Method), (5) বহুপর্যায় নমুনাচয়ন পদ্ধতি (Multi-stage Sampling Method)।

এই সমস্ত পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে প্রথম এককে। সেজন্য তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

অনুশীলনী

1. নমুনাচয়নের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি কি? সমগ্রক থেকে নমুনাচয়ন কিভাবে করা হয়?

২.৪ সমগ্রক থেকে নমুনাচয়ন (Determination of Sample from Population)

নমুনাচয়ন (Sampling) বলতে পরিসংখ্যানগত সমগ্র বিষয় থেকে একটি অংশ নির্বাচনকে বোঝায় যার সাহায্যে সমগ্র বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়। সকল একক বা ব্যষ্টির বিশেষ এক চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যানগত তথ্যাবলীর সমষ্টি বা সমগ্র পরিসংখ্যানগত তথ্যমালাকে **সমগ্রক** (Population or universe) বলে। এবং যে অংশ সমগ্রকের প্রকৃতি নিশ্চিত করার জন্য চয়ন করা হয় তাকে **নমুনা** (Sample) বলা হয়।

পরিসংখ্যানগত অনুসন্ধানের জন্য ব্যষ্টিসমূহের একটি গোষ্ঠীর কিছু প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়, এরূপ অনুসন্ধানাধীন সমগ্র গোষ্ঠী হল সমগ্রক। সমগ্রকের সদস্যরা বা এককগুলি হতে পারে যেমন কোন এক শিল্পের কর্মচারীগণ বা চুপড়ির আপেলগুলি, বা একটি এলাকায় আবাদযোগ্য জোতগুলি ইত্যাদি।

প্রায়শই অর্থ, সময় ও শ্রমশক্তির সীমাবদ্ধতার দরুণ সমূহ সমগ্রক বিচার-বিশ্লেষণ করা বাস্তবসম্মত হয় না অথবা সমগ্রকের এককসমূহ অসীম হলে সমূহ সমগ্রক (whole population) বিশ্লেষণ করা যায় না। সুতরাং সমগ্রকে একটি অংশ চয়ন করে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা সমগ্রকের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা যায়। সমগ্রকের একটি অংশ যার দ্বারা সমূহ সমগ্রক প্রদর্শিত হয় তা হল নমুনা (Sample)।

যথাযথ নমুনা নিয়ে তদন্ত করাকে নমুনা তদন্ত (Sample survey) বলা হয়। আবার পূর্ণ তদন্তের ক্ষেত্রে (in case of complete enumeration or complete census) সমূহ সমগ্রকের প্রতিটি একক নিয়ে তদন্ত করা হয়। সাধারণত নমুনা তদন্তই অধিকতর পছন্দ করা হয়। এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

(1) ব্যয় সংক্ষেপ হয় (Reduction of Cost)

(2) দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করা যায় (Greater speed)

(3) অধিকতর সঠিকতার মান বজায় করা যায় (Greater accuracy)

(4) এই পদ্ধতি হল সঠিকতার পরিমাপক (Measure of accuracy)

(5) এর অধিকতর প্রয়োগ যোগ্যতা (Greater applicability) রয়েছে।

সুতরাং পূর্ণতদন্ত অপেক্ষা আংশিক তদন্ত অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং বহুল প্রচলিত। যথাযথ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তদন্ত করা হয়। এবং তদন্তলব্ধ সিদ্ধান্তকে সমূহ সমগ্রকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে গণ্য করা হয়। সমূহ সমগ্রক সম্পর্কে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতিকে **আংশিক চয়ন পদ্ধতি** বা **নমুনা চয়ন পদ্ধতি** (Sampling method) বলা হয়।

সমগ্রকের অন্তর্ভুক্ত এককের সংখ্যা সীমিত হলে তাকে **সীমিত সমগ্রক** (finite population or

অনুশীলনী

1. নিম্নলিখিত তথ্য থেকে সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় কর :

X	:	6	2	10	4	8
Y	:	9	11	5	8	7

[Ans. +0·98]

2. X ও Y চলক দুটির মান নিম্নে দেওয়া হল :

X	:	–3	–1	+1	+3
Y	:	9	1	1	9

দেখাও যে সহগতি সহগাঙ্ক হচ্ছে শূন্য। চলক দুটি কি নিরপেক্ষক (independent) যদি তা না হয় তাহলে সহগতি সহগাঙ্ক শূন্য হওয়ার কারণ কি? [Hints : সম্পর্কটি সরল নয় (non-linear) : $y = x^2$ সহগতি সহগাঙ্ক কিন্তু সরল যোগসূত্রের পরিমাপক]

3. নিম্নে প্রদত্ত তথ্যগুলি থেকে (i) সহগতি সহগাঙ্ক, (ii) y-এর পরিপ্রেক্ষিতে x-এর নির্ভরণ সমীকরণ নির্ণয় কর।

$$\sum x = 56, \sum y = 40, \sum x^2 = 524, \sum y^2 = 256, \sum xy = 364, n = 8$$

[Ans. +0·98, $x = 1{\cdot}5y - 0{\cdot}5$]

4. সহগতি সহগাঙ্ক যে নির্ভরণ গুণাঙ্কদ্বয়ের গুণোত্তর গড় তা দেখাও।

5. একটি প্রতিযোগিতায় দুজন বিচারক 7 জন ছাত্রকে নিম্নলিখিতভাবে অনুক্রমিক মাত্রা প্রদান করল

ছাত্র	:	A	B	C	D	E	F	G
বিচারক I-এর মাত্রাগত তথ্য	:	2	1	4	5	3	7	6
বিচারক π-এর মাত্রাগত তথ্য	:	3	4	2	5	1	6	7

অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয় কর : [Ans. $r_R = 0{\cdot}64$]

6. x ও y চলক দুটির মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ক, r = 0·60, এবার যদি $\sigma_x = 1{\cdot}50$, $\sigma_y = 2{\cdot}00$, $\bar{x} = 10, \bar{y} = 20$ হয় তাহলে (1) x-এর সাপেক্ষে y-এর (ii) y-এর সাপেক্ষে x-এর নির্ভরণ সমীকরণ দুটি নির্ণয় কর। [Ans. $y = 0{\cdot}8x + 12$; $x = 0{\cdot}45y + 1$]

7. x ও y চলকদ্বয়ের নির্ভরণ সমীকরণ দুটি হল : $y = 5{\cdot}6 + 1{\cdot}2x$ এবং $x = 12{\cdot}5 + 0{\cdot}6y$.$x$ ও y-এর যৌগিক গড় ও উহাদের মধ্যে সহগতি সহগাঙ্ক নির্ণয় কর।

[Ans. 56·64, 73·57 + 0·85]

8. দুটি নির্ভরণ সমীকরণ হল $x + 2y = 5$ এবং $2x + 3y = 8$ এবং $\sigma_x^2 = 12\,\bar{x}, \bar{y}, \sigma,$ এবং r-এর মান নির্ণয় করো।

$x - \bar{x}\, b_{xy}(y - \bar{y})$ যেখানে

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{24}{4} = 6,\ \bar{y} = \frac{\sum y}{n} = \frac{44}{4} = 11$$

সহভেদমান $(x, y) = \frac{306}{4} - \frac{24}{4}.\frac{44}{4} = 10{\cdot}5$

ভেদমান $(y) = \sigma_y^2 = \frac{574}{4} - \left(\frac{44}{4}\right)^2 = 22{\cdot}5$

$$b_{xy} = \frac{10{\cdot}5}{22{\cdot}5} = 0{\cdot}467$$

$\therefore$ নির্ণেয় নির্ভরণ সমীকরণটি হল : $x - 6 = 0{\cdot}467\ (4 - 11)$

অথবা $x = 0{\cdot}467y + 0{\cdot}86$

$y = 6$ হলে $x = 0{\cdot}467 \times 6 + 0{\cdot}86 = 3{\cdot}7$

উদাহরণ 2 : যদি $4u = 2x + 7$ এবং $6v = 2y - 15$ এবং x-এর উপর y-এর নির্ভরণ গুণাঙ্ক 3 হয় তাহলে u-এর উপর v-এর নির্ভরণ গুণাঙ্ক নির্ণয় কর।

সমাধান : $u = \frac{1}{2}x + \frac{7}{4}$ এবং $v = \frac{1}{3}y - \frac{5}{2}$

$\therefore\ u - \bar{u} = \frac{1}{2}(x - \bar{x})$ এবং $v - \bar{v} = \frac{1}{3}(y - \bar{y})$

ভেদমান $(u) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$ ভেদমান $(x) = \frac{1}{4}$ ভেদমান (x)

এবং সহভেদমান $(u, v) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$ সহভেদমান (x, y)

$$\therefore\ b_{uv} = \frac{(u, v)}{(u)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}\ (x, y)}{\frac{1}{4}\ (x)} = \frac{2}{3} b_{yx} = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2$$

যখন $r = \pm 1$ তখন tan $\theta = 0$ অর্থাৎ $\theta = 0$ এবং দুটি নির্ভরণ রেখা তখন পরস্পরের উপর সমপাতিত হয় (Coincide), আবার যখন r = 0, cot $\theta = 0$ অর্থাৎ তখন নির্ভরণ রেখা দুটি পরস্পরকে লম্ব আকারে বিন্দুতে ছেদ করে।

(2) নির্ভরণ গুণাঙ্ক দুটি হল : নিম্নরূপ

$$b_{yx} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x} \text{ এবং } b_{xy} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$$

$$\therefore \quad b_{yx}.b_{xy} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}.r\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = r^2$$

$$\therefore \quad |r| = \sqrt{b_{yx}.b_{xy}}$$

সুতরাং সংখ্যাগতভাবে সহগতি সহগাঙ্ক হল নির্ভরণ গুণাঙ্ক দুটির গুণোত্তর গড় এবং r-এর চিহ্ন হবে গুণাঙ্ক দুটির সাধারণ চিহ্ন (sign)

(3) ধনাত্মক সংখ্যাগুলির যৌগিক গড় যেহেতু সংখ্যাগুলির গুণোত্তর গড় অপেক্ষা অধিক হয় অথবা উহার সমান হয় সেইহেতু,

$$\frac{|b_{yx}| + |b_{xy}|}{2} \geq \sqrt{|b_{yx}||b_{xy}|}$$

(যেহেতু b_{yx}, b_{xy} একই চিহ্ন যুক্ত হয়)

$$= \sqrt{r^2} = |r|$$

সহগাঙ্ক, r নির্ভরণ গুণাঙ্কের সংখ্যাগত মানগুলির যৌগিক গড় অপেক্ষা অধিক হতে পারে না।

উদাহরণ 1. নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থেকে y-এর উপর x-এর নির্ভরণ সমীকরণ নির্ণয় কর এবং $y = 6$ হলে x-এর মান নির্ধারণ কর।

$\sum x = 24$ $\quad \sum y = 44$ $\quad \sum xy = 306$

$\sum x^2 = 164$ $\quad \sum y^2 = 574$ $\quad$ n = 4

সমাধান ঃ y-এর উপর x-এর নির্ভরণ সমীকরণের সাধারণ রূপ হল :

যেহেতু ভেদমান $(e) \geq 0$ সেইহেতু অথবা,

অথবা,

অথবা, এই ফল পূর্বেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(3) সহভেদমান $(x,\ \mathrm{e})$ যেহেতু $\bar{e} = 0$

$$=$$

$$= \frac{1}{n}(0 - \bar{x}.0) = 0$$

সুতরাং $r_{xe} = 0$

সুতরাং, e-কে y এবং সেই অংশ হিসাবে দেখান যেতে পারে যে অংশটির সঙ্গে x-এর কোন সম্পর্ক থাকে না।

(ঠ) নির্ভরণ রেখা ও গুণাঙ্ক সম্পর্কিত কয়েকটি ফল (Some results relating to Regression Line & Coefficient) :

(1) দুটি নির্ভরণ রেখা হল :

$$Y = y + r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\left(x \ldots\right) \quad \ldots \quad \text{(i)}$$

[illegible]

এবং $X = \bar{x} + r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(y - \bar{y}) \quad \ldots \quad \text{(ii)}$

(i)-এর ঢাল (Gradiant) হল $r\frac{\sigma_y}{\sigma_x} = m_1$ (ধরি) এবং (ii)-এর ঢাল হল $r\frac{\sigma_x}{\sigma_y} = m_2$ ধরি, এবার যদি দুটি নির্ভরণ রেখার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম কোণ (acute angle) হয় **θ,** তাহলে

$$\theta = \tan^{-1}\left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right| = \tan^{-1}\left|\frac{\frac{\sigma_y}{r\sigma_x} - r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}}{1 + \frac{\sigma_y}{r\sigma_x}\cdot\frac{\sigma_y}{r\sigma_x}}\right|$$

$$= \tan^{-1}\left|\frac{1 - r^2}{r}\cdot\frac{\sigma_x \sigma_y}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}\right|$$

এবং অপর কোণটি হবে **π − θ**

$$\therefore r^2 = \frac{\text{[illegible]} \quad (Y)}{\text{[illegible]} \quad (y)} = \frac{\sigma_y^2}{\sigma_y^2}$$

অথবা, $|r| = \dfrac{\sigma_Y}{\sigma_y}$

সহগতি সহগাঙ্কের সংখ্যাগত মানকে x-এর উপর y-এর নির্ভরণ রেখার পরিপ্রেক্ষিতে y-এর সমক বিচ্যুতির অনুপাত (Proportion of the total variability of y) হিসাবে দেখান যায়। অনুরূপভাবে দেখান যায় যে x-এর নির্ভরণ রেখার জন্য $|r|\dfrac{\sigma_X}{\sigma_x}$, যেখানে $\boldsymbol{\sigma}_X$ হল x -এর নির্ধারিত মানগুলির সমক বিচ্যুতি (Standard deviation) এবং $\boldsymbol{\sigma}_x$ হল x-এর প্রদত্ত মানগুলির সমক বিচ্যুতি।

r^2-কে নির্ধারণ সহগাঙ্ক (Coefficient of determination) বলা হয় এবং নির্ধারণ সূত্র হিসাবে সরল নির্ভরণ সমীকরণগুলির ব্যবহারিক উপযোগের পরিমাপকও বলে গণ্য করা হয়।

(2) যখন $e = 0$ তখন X-এর উপর y-এর সরল নির্ভরণ থেকে ভেদমান (e) হয় $\sigma_y^2(1-r^2)$। এক্ষেত্রে e-এর সমক বিচ্যুতি (Standard deviation) হল এবং একে X-এর উপর Y-এর সরল নির্ভরণ থেকে y-এর গণনার সমক বিচ্যুতি (Standard error of estimation of y) বলা হয়।

$\sigma_y\sqrt{1-r^2}$

ভেদমান (e) $= \dfrac{1}{n}\sum_i e_i^2$, যেহেতু $e = 0$

$$= \frac{1}{n}\sum_i (y_i - Y)^2 = \frac{1}{n}\sum_i \left\{(y_i - \bar{Y}) - r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x_i - \bar{x})\right\}^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum_i (y_i - \bar{y})^2 - 2r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\frac{1}{n}\sum_i (y_i - \bar{x})(x_i - \bar{x}) + r^2\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}\frac{1}{n}\sum_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \sigma_y^2 - 2r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}r.\sigma_x\sigma_y + r^2\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2}.\sigma_y^2 = \sigma_x^2 - 2r^2\sigma_y^2 + r^2\sigma_y^2$$

$$= \sigma_y^2(1 - r^2)$$

$\therefore x - \bar{x} = c(u - \bar{u})$ এবং

অতএব ভেদমান (x) = c^2 ভেদমান (u) এবং ভেদমান (y) = d^2 ভেদমান (v)

এবং সহভেদমান $(x,\ y)$ = cd সহভেদমান $(u,\ v)$

অনুরূপভাবে, $b_{xy} = \frac{c}{d} b_{uv}$

(2) x-এর উপর y-এর নির্ভরণ রেখা থেকে দেখা যায় যে y-এর নির্ধারিত মান (predicted value) হল Y_i যখন $x = x_i$, 3.1(a) নং বিক্ষেপন চিত্রে x-এর উপর y-এর নির্ভরণ রেখার উপর নির্ধারিত বিন্দু $(x_i\ y_i)$ এবং প্রদত্ত বিন্দু $(x_i\ y_i)$ দেখান হয়েছে।

ধরা যাক, $Y_i = \bar{y} + r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x_i - \bar{x})$

$$\therefore \sum_i Y_i = n\bar{y} + r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}\sum_i (x_i - \bar{x}) \ \left[\because \sum (x_i - \bar{x}) = 0\right]$$

y-এর নির্ধারিত মানগুলির যৌগিক গড় উহাদের প্রদত্ত মানগুলির যৌগিক গড়ের সমান হয়েছে। এরূপ অনুমান সাপেক্ষে বিচ্যুতিসমূহের গড় হবে।

x চলকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

গড় বিচ্যুতি (Average error) শূন্য হলে $(\bar{e} = 0)$ আরও কয়েকটি ফল পাওয়া যায় :

(1) ভেদমান (Y) (যেহেতু $\bar{Y} = \bar{y}$)

হল y-এর উপর x-এর নির্ভরণ রেখা যা y-এর মান থেকে x-এর মান নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এই রেখা পাওয়ার জন্য নিম্নলিখিত সম্পর্কটি ধরা যেতে পারে।

$$x = c + dy \qquad \ldots\ldots \quad (v)$$

যেখানে $c + dy_i$ হল x-এর নির্ধারিত মান (Predicted value) যখন $y = y_i$. অতএব c ও d নির্ধারণের জন্য x-এর হিসাবের বিচ্যুতি বা ভ্রান্তিসমূহের বর্গের সমষ্টিকে নূন্যতম করতে হয়।

অর্থাৎ $\sum_i (x_i - c - dy_i)^2 = \sum_i e_i^2$-কে c ও d-এর পরিপ্রেক্ষিতে নূন্যতম করতে হয়।

পূর্বের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে y-এর উপর x-এর নির্ভরণ সমীকরণ নিম্নবর্ণিতরূপে পাওয়া যায়।

.... (vi)

যেখানে $b_{xy} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}$ হল y-এর উপর x-এর নির্ভরণ গুণাঙ্ক এবং তা হল y বৃদ্ধির জন্য x-এর বৃদ্ধি 3.1(b) নং চিত্রে (vi) নং সমীকরণের জ্যামিতিক প্রতিরূপ হিসাবে y-এর উপর x-এর নির্ভরণ রেখাটি দেখান হয়েছে।

মন্তব্য : (1) নির্ভরণ রেখা বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে যেহেতু দেখা যায় যে উভয় সমীকরণ (iv এবং vi) $x = \bar{x}$ এবং দ্বারা সিদ্ধ হয়।

(2) দুটি নির্ভরণ রেখা হল পৃথক দুটি রেখা যেহেতু রেখা দুটি ভিন্ন শর্তাধীনে উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য দুটি রেখা পরস্পরের উপর সমপাতিত হয় (coincide) যখন অর্থাৎ চলক দুটির মধ্যে সম্পর্ক যখন প্রকৃতই সরল (exactly linear) হয়।

(ট) কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফল (Some Important Results) :

(1) গণনার সুবিধার জন্য মূল বিন্দু বা কেন্দ্র এবং পরিমাপ মাত্রা উভয়ই পরিবর্তন করা যায়। x ও y চলক দুটির কেন্দ্র (a, b) বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয় এবং পরিমাপ যথাক্রমে c, d মাত্রায় পরিবর্তন করা হয় যখন এবং ,

তখন এবং $b_{xy} = \frac{c}{d} b_{uv}$ হবে

প্রমাণ : x = a + cu এবং y = b + dv

$$= \frac{\frac{1}{n}\sum_i x_i y_i - \overline{xy}}{\frac{1}{n}\sum_i x_i^2 - \bar{x}^2} = \frac{(x, y)}{(x)} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

সুতরাং, $b = r\dfrac{\sigma_y}{\sigma_x}$

সমীকরণ (ii) হতে পাই,

$$\bar{y} = a + b\bar{x}$$

অথবা,

a এবং b-এর নিরূপিত মানগুলিতে সমীকরণ (i)-এ বসাইয়া x-এর উপর y-এর (y on x) সরল নির্ভরণ সমীকরণটি পাওয়া যায় এবং এই সমীকরণটি হল নিম্নরূপ :

$$y = \bar{y} + r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x - \bar{x}) \quad \ldots \quad \text{(iv)}$$

সুতরাং, $b_{yx} = r\dfrac{\sigma_y}{\sigma_x}$ যেখানে b_{yx}-কে x-এর উপর y-এর নির্ভরণ গুণাঙ্ক (regression coefficient of y on x) বলা হয়। b_{yx} হল x-এর এক একক বৃদ্ধির জন্য y-এর বৃদ্ধি

চিত্র নং 3.1(a)

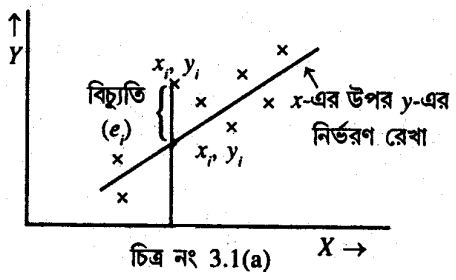

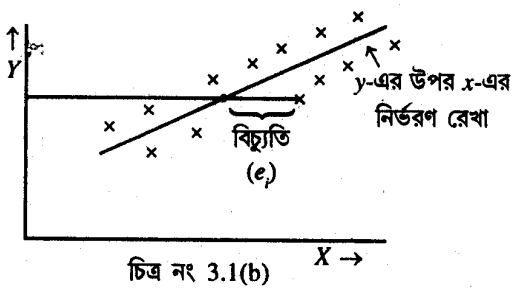

চিত্র নং 3.1(b)

3.1(a) নং বিক্ষেপণ চিত্রে x-এর উপর y-এর নির্ভরণ রেখাটি ও ভ্রান্তি (error) দেখান হয়েছে। অনুরূপভাবে লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি অনুসারে আর একটি নির্ভরণ রেখা পাওয়া যায়—অপর এই রেখাটি

সুতরাং y_i-এর জন্য $a + bx_i$ নেওয়ার ক্ষেত্রে একটি ভ্রান্তি (error) দেখা দেয় এই ভ্রান্তি, e হল :

$e_i = y_i - (a + bx_i)$ একে গণনার বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি (error of estimation) বলা হয়। লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতিতে a এবং b এমনভাবে নির্ধারিত হয়, যাতে a এবং b-এর পরিপ্রেক্ষিতে $\sum_i e_i^2 = \sum (y_i - a - bx_i)^2$ হয় ন্যূনতম। a এবং b নির্ধারণের জন্য সমীকরণগুলি হল নিম্নরূপ :

$$\frac{\partial}{\partial a}\left(\sum_i e_i^2\right) = 0 \text{ এবং } \frac{\partial}{\partial b}\left(\sum_i e_i^2\right) = 0$$

সমীকরণ দুটি থেকে পাওয়া যায় $\sum_i (y_i - a - bx_i) = 0$

অথবা, $\sum_i y_i = na + b\sum x_i$ ... (ii)

এবং

অথবা, $\sum_i x_i y_i = a\sum_i x_i + b\sum_i x_i^2$ ... (iii)

এই সমীকরণগুলিকে সুসম্বন্ধ সমীকরণ (Normal equations) বলে। সমীকরণ (iii)-এর সঙ্গে n গুণ করে এবং তা থেকে সমীকরণ (ii)-এর সঙ্গে -এর গুণফল বাদ দিলে

পাওয়া যায় :

$$n\sum_i x_i y_i - \left(\sum_i x_i\right)\left(\sum_i y_i\right) = b\left[n\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2\right]$$

$$\therefore b = \frac{n\sum_i x_i y_i - \left(\sum_i x_i\right)\left(\sum_i y_i\right)}{n\sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i\right)^2}$$

$$r_R = \frac{\frac{n^2-1}{12} - \frac{Tu+Tv}{2} - \frac{1}{2n}\sum_i d_i^2}{\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - Tu}\sqrt{\frac{n^2-1}{12} - Tv}}$$

$$= \frac{2 \cdot 88895}{\sqrt{40 \cdot 46346}} = 0 \cdot 45$$

(ঝ) সরল নির্ভরণ বিশ্লেষণ (Linear Regression Analysis) : একটি চলক (ধরি) y-এর অপর একটি চলক (ধরি) x উপর নির্ভরণ (Regression) বলতে x-এর উপর y-নির্ভরতা বোঝায়। দ্বিচলক সম্পর্কিত বিশ্লেষণে একটি সমস্যা হল স্বাধীন চলক x-এর মান জানা থাকলে ঐ চলকটির উপর নির্ভরশীল চলক y-এর মান নির্ধারণ করা। এই সমস্যা খুবই সহজ সমাধানযোগ্য হয় যদি y-কে x-এর একটি গাণিতিক অপেক্ষক রূপে প্রকাশ করা যায় ; ধরি $y = f(x)$; তখন এই সমীকরণটিকে x উপর y-এর নির্ভরণ সমীকরণ (Regression equation) বলা হয়। সহজতম ক্ষেত্রে y-এর সঙ্গে x প্রকৃত অথবা প্রায় সরলভাবে সম্পর্কযুক্ত (linearly related) হয় তখন তা নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয় :

$$y = a + bx$$

এই সম্পর্ক অনুসারে $a + bx_0$ হল y-এর নির্ধারিত মান যখন $x = x_0$ এই অংশে আলোচনা কেবল সরল নির্ভরণ এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হল।

(ঞ) সরল নির্ভরণ সমীকরণ নির্ণয় (Derivation of Linear Regression Equation) :

ধরা যাক সরল নির্ভরণ সমীকরণ হল : $y = a + bx$ .... (i)

যেহেতু এই সমীকরণের ভিত্তিতে x-এর মানের জন্য y-এর মান নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে সেইহেতু x ও y-এর প্রদত্ত মানসমূহের ভিত্তিতে a এবং b ধ্রুবক দুটি নির্ধারণ বা গণনা করতে হয়। ধরা যাক n সংখ্যক মান যুগল (x_i, y_i) দেওয়া আছে যেখানে $i = 1, 2, ..., n$. এবং a, b নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে **লঘিষ্ঠ বর্গ পদ্ধতি** (Least Square Method) ব্যবহার করা বিধেয় যেহেতু এই পদ্ধতির বহু কাম্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যখন $x = x_i$ তখন y-এর প্রদত্ত মান (observered value) হল y_i কিন্তু নির্ধারিত মান (Predicated value) হল $a + bx_i$

উদাহরণ 2. এক পরীক্ষায় 9 জন ছাত্র ইংরেজী ও গণিতে নিম্নবর্ণিত নম্বর পেয়েছে। এক্ষেত্রে স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয় করো :

ছাত্র (রোল নং)	:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ইংরেজীতে প্রাপ্ত নম্বর	:	45	60	32	45	32	32	58	56	47
গণিতে প্রাপ্ত নম্বর	:	51	51	38	54	54	38	62	58	38

সমাধান ঃ প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী ছাত্রদের অনুক্রমিক মানগুলি সংযোজন করা হল।

রোল নং	:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ইংরেজী (u_i)	:	$5\frac{1}{2}$	1	8		8	8	2	3	4
গণিত (v_i)	:			8			8	1	2	8

প্রথম শ্রেণীভুক্ত (ইংরেজী) অনুক্রমিক মানগুলিতে 2 এবং 3 দৈর্ঘ্যের দুটি বন্ধন (ties) রয়েছে।

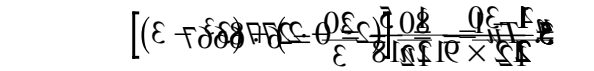

দ্বিতীয় শ্রেণীর (গণিত) অন্তর্গত অনুক্রমিক মানগুলিতে 2, 3 এবং 2 দৈর্ঘ্যের তিনটি বন্ধন (ties) রয়েছে।

$$\therefore TV = \frac{1}{12n}\left[\left(2^3-2\right)+\left(3^3-3\right)+\left(2^3-2\right)\right] = \frac{36}{12\times 9} = \frac{1}{3} = 0\cdot 3333$$

আবার,

$$\text{এবং } \frac{1}{2n}\sum d_i^2 = \frac{1}{2\times 9}\left[0+\frac{81}{4}+0+4+\frac{81}{4}+0+1+1+16\right]$$

$$= \frac{1}{18}\times\frac{250}{4} = \frac{125}{36} = 3\cdot 4722$$

অতএব স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক, r_R

অনুক্রমিক মানসমূহের দুটি শ্রেণীর মধ্যে যদি সম্পূর্ণরূপে অসমাঞ্জস্য থাকে তাহলে $v_i = n - u_i + 1$ এবং u এবং v চলক দুটির মধ্যে সম্পর্কটি প্রকৃতই এমন একটি সরলরেখার দ্বারা প্রকাশিত হবে যে সরলরেখার ঢাল হবে ঋণাত্মক অর্থাৎ $r_R = -1$

প্রসঙ্গক্রমে কেন্‌ডালস্ অনুক্রমিক সহগাঙ্গ ও (Kendall's Correlation coefficient) উল্লেখ করা যেতে পারে।

উদাহরণ 1. একটি প্রতিযোগিতায় 10 জন প্রতিযোগিকে দুটি বিচার অনুযায়ী যে ক্রমে সাজান হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল—দুটি বিচারের মধ্যে অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয় করো।

প্রতিযোগী :		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
বিচারের ক্রম :	প্রথম ঃ	6	11	9	3	7	10	5	2	8	4
	দ্বিতীয় ঃ	4	9	11	5	10	8	2	3	7	6

সমাধান ঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় বিচারের ক্রমসমূহ যথাক্রমে u_i, v_i ধরা হল যেখানে i = 1, 2... 10. বিচারের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য ছক

u_i	v_i	$d_i = u_i - v_i$	d^2
6	4	2	4
11	9	2	4
9	11	–2	4
3	5	–2	4
7	10	–3	9
10	8	2	4
5	2	3	9
2	3	–1	1
8	7	–1	1
4	6	–2	4
মোট			44

$$r_R = 1 - \frac{6\sum_{i}^{10} d_i^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6 \times 44}{10(10^2-1)} = \frac{264}{990} = 0.267$$

প্রতিযোগী সংখ্যা = n = 10

∴ নির্ণেয় অনুক্রমিক সহগাঙ্ক (আসন্ন)

যেহেতু অনুক্রমিক মানসমূহের বর্গ $\frac{1}{12}(m^3 - m)$ পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় সেইহেতু অনুক্রমিক মান শ্রেণীর যৌগিক গড় অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু ভেদমান $\frac{1}{12m}(m^3 - m)$ পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হবে।

ধরা যাক, u চলকের অনুক্রমিক মানগুলির ক্ষেত্র m_1, m_2, ... m_k দৈর্ঘ্যের K সংখ্যক বন্ধন রয়েছে এবং V চালকের অনুক্রমিক মানগুলির ক্ষেত্রে $m_1', m_2' \ldots m_L'$ দৈর্ঘ্যের L সংখ্যক বন্ধন রয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রতিটি বন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট ভেদমান হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং যেহেতু বন্ধন প্রক্রিয়া যোগ ধর্মাধীন (additive) সেইহেতু উভয় চলকের ক্ষেত্রে নতুন ভেদমান হবে ঃ

$$\text{এবং } \sigma_v^2 = \frac{n^2 - 1}{12} - Tv$$

যেখানে, $Tu = \frac{1}{12n}\sum_{i=1}^{K}(m_i^3 - m_i)$ এবং $Tv = \frac{1}{12n}\sum_{i=1}^{L}(m_i'^3 - m_i')$

আবার যেহেতু $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i^2 = \sigma_u^2 + \sigma_v^2 - 2$ ভেদমান $(u,\ v)$

বন্ধনযুক্ত অনুক্রমিক মানগুলির ক্ষেত্রে

ভেদমান $(u, v) = \frac{n^2 - 1}{12} - \frac{Tu + Tv}{2} - \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} d_i^2$

সুতরাং বন্ধন যুক্ত অনুক্রমিক মানগুলির ক্ষেত্রে স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক হল ঃ

$$r_R = \frac{\frac{n^2 - 1}{12} - \frac{Tu + Tv}{2} - \frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{\sqrt{\frac{n^2 - 1}{12} - Tu}\ \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12} - Tv}}$$

অনুক্রমিক মানসমূহের দুটি শ্রেণীর মধ্যে যদি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য (Perfect agreement) থাকে তাহলে প্রতি i-এর জন্য $u_i = v_i$ এবং $d_i = 0$, $T_u = T_v$ এবং $\boldsymbol{\sigma}_u = \boldsymbol{\sigma}_v$ হবে।

$\therefore\ r_R = 1$

এক্ষেত্রে u এবং v চলক দুটির মধ্যে সম্পর্কটি প্রকৃতই এমন একটি সরলরেখার সাহায্যে প্রকাশিত হবে যে রেখার ঢাল, $r_R = 1$ হবে—অর্থাৎ ধনাত্মক হবে।

অতএব, $r_{uv} = \dfrac{\text{Cov}(u,v)}{\sigma u\,\sigma v} = \dfrac{\dfrac{n^2-1}{12} - \dfrac{1}{2n}\sum_i d_i^2}{\dfrac{n^2-1}{12}}$

$$= \frac{6\sum_i d_i^2}{n(n^2-1)} = r_R$$

(b) সম অনুক্রমিক মানসম্পন্ন যখন কিছু ব্যষ্টি—এরূপ ক্ষেত্রে (When there are ties)

এখন ধরা যাক m সংখ্যক ব্যষ্টি একই অনুক্রমিক মান সম্পন্ন। তাহলে বলা যায় যে m দৈর্ঘ্যের একটি বন্ধন (a tie) রয়েছে। এরূপ একই অনুক্রমিক স্থাপনে একাধিক বন্ধন থাকতে পারে। বিশেষ কোন এক ক্ষেত্রে যদি m বন্ধন বিশিষ্ট ব্যষ্টিগুলির অব্যবহিত পূর্বেস্থিত ব্যষ্টির অনুক্রমিক মান r হয় তাহলে বন্ধনভুক্ত m সংখ্যক ব্যষ্টির প্রতিটির অনুক্রমিক মান হবে

$$\frac{(r+1)+(r+2)+\ldots+(r+m)}{m} = r + \frac{m+1}{2}$$

এবার এরূপ বন্ধন না থাকলে অনুক্রমিক মানগুলির বর্গের সমষ্টি, S_1 হত

$$= mr^2 + 2r(1+2+\ldots+m) + (1^2+2^2+\ldots m^2)$$

$$= mr^2 + m(m+1)r + \frac{1}{6}m(m+1)(2m+1)$$

এবার বন্ধন বিশিষ্ট অনুক্রমিক মানগুলির বর্গের সমষ্টি, S_2 হত

$$S_2 = m\left(r + \frac{m+1}{2}\right)^2$$

এখন, $S_1 - S_2 = m(m+1)\left(\dfrac{2m+1}{6} - \dfrac{m+1}{4}\right) = \dfrac{m(m+1)(m-1)}{12} = \dfrac{1}{12}(m^3 - m)$

যেখানে হল যথাক্রমে u_i ও v_i-এর মানগুলির যৌগিক গড় u-এর বিভিন্ন মানগুলির ভেদমান, এবং v-এর বিভিন্ন মানগুলির ভেদমান হল নিম্নরূপ ঃ

$$= \frac{1}{n}\sum u^2 - \bar{u}^2$$

$$= \frac{1}{n}\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

$$= \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}$$

অনুরূপভাবে,

$$\sigma_v^2 = \frac{n^2-1}{12}$$

আবার, [illegible]

$$= \frac{1}{n}\sum_i \left\{\left(u_i - \bar{u}\right) + \left(v_i - \bar{v}\right)\right\}^2,$$ (যেহেতু)

$$= \sigma_u^2 + \sigma_v^2 - 2$$ সহভেদমান $(u,\ v)$

$\therefore$ সহভেদমান $(u,\ v)$

$$r_R = 1 - \frac{6\sum_i d_i^2}{n(n^2-1)}$$

অনুক্রমিক মানগুলির দুটি শ্রেণীর মধ্যে যখন পূর্ণ সামঞ্জস্য (Perfect agreement) থাকে—অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যষ্টি সংশ্লিষ্ট দুটি ক্রমিক মান যখন সমান হয় তখন চলক দুটির মধ্যে যোগসূত্রটি (association) ধনাত্মকভাবে সম্পূর্ণ (Positively perfect) বলে গণ্য করা হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি i-এর জন্য $u_i = v_i$ এবং $\sum_i d_i^2 = 0$ সুতরাং $r_R = 1$ হয়।

আবার অনুক্রমিক মানগুলির দুটি শ্রেণীর মধ্যে যখন পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকে না (অর্থাৎ) তখন চলক দুটির মধ্যে যোগসূত্রটি ঋণাত্মকভাবে সম্পূর্ণ (negatively perfect) বলে গণ্য করা হয় এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি i-এর জন্য $v_i = n - u_i + 1$

এবং

$$= 4\sum_i u_i^2 - 4(n+1)\sum_i u_i + n(n+1)^2$$

$$= 4.\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 4(n+1)\frac{n(n+1)}{2} + (n+1)^2$$

$$= \frac{2}{3}n(n+1)(2n+1) - n(n+1)^2$$

$$= \frac{1}{3}n(n^2+1)$$

$$\therefore r_R = 1 - \frac{6n(n^2-1)}{3}.\frac{1}{n(n^2-1)} = 1 - 2 = -1$$

u_i এবং v_i-কে চলক দুটির বিভিন্ন মান ধরে সরল গুণন পরিঘাত সহগতি সহগাঙ্ক (Simple product moment correlation coefficient) থেকে স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক পাওয়া যায়।

যেহেতু অনুক্রমিক মানগুলি 1, 2, ... n ব্যতীত অন্য কোন মান গ্রহণ করে না

সেইহেতু, $\sum_i u_i = \sum v_i = 1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

$$= \frac{50 \times 30 - (-13) \times (-37)}{\sqrt{50 \times 71 - (-37)^2}\sqrt{50 \times 55 - (-13)^2}} = \frac{1019}{\sqrt{2181}\sqrt{2581}}$$

$$= \frac{1019}{46 \cdot 70 \times 50 \cdot 80} = 0 \cdot 43$$

(ছ) অনুক্রমিক সহগাঙ্গ (Rank Correlation Co-efficient) : যখন ব্যষ্টিসমূহের একটি গোষ্ঠী (a group of individuals) একটি বিশেষ চরিত্র বা গুণের মাত্রা অনুসারে সাজান হয় তখন তাদের অনুক্রমিক বিন্যাস (ranking) হয়েছে বলে ধরা হয়। এরূপ অনুক্রমিক বিন্যাসের অন্তর্গত কোন ব্যষ্টি যে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত সেই স্থান সংখ্যা হল মাত্রাগত সংখ্যা (ordinal number) এবং সেই স্থানসংখ্যা ঐ ব্যষ্টির অনুক্রমিক মান (rank) হিসাবে গণ্য হয়।

একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যষ্টিসমূহের জন্য যখন দুটি ভিন্ন চরিত্র বা গুণ সংশ্লিষ্ট দুটি অনুক্রমিক মান শ্রেণী পাওয়া যায় অথবা যখন দুজন বিচারক একই চরিত্র বা গুণের জন্য দুটি ক্রমিক মান শ্রেণী প্রদান করে তখন এই অনুক্রমিক মান শ্রেণী দুটির মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র আছে কিনা তা বিচার করার আগ্রহ দেখা দেয়। একই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যষ্টিসমূহের জন্য এরূপ দুটি অনুক্রমিক মান শ্রেণীর মধ্যে যোগসূত্র বা সম্পর্ককে **অনুক্রমিক সহগতি** (Rank correlation) বলা হয় এবং এরূপ সহগতি সংশ্লিষ্ট সহগাঙ্ক হল অনুক্রমিক সহগাঙ্ক।

(জ) স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক (Spearman's rank Correlation Co-efficient) :

(a) প্রত্যেক ব্যষ্টি পৃথক অনুক্রমিক মান বিশিষ্ট এরূপ ক্ষেত্রে (Case when there are no ties) ধরা যাক n সংখ্যক ব্যষ্টির অনুক্রমিক মানগুলির দুটি শ্রেণী হল $u_1, u_2, \ldots u_n$ এবং $v_1, v_2, \ldots v_n$.

যেহেতু অনুক্রমিক মানসমূহ (ranks) 1, 2, ... n ব্যতীত অন্য কোন মান গ্রহণ করে না এবং u এবং v চলক দুটি পৃথক অনুক্রমিক মান সম্পন্ন, সেইহেতু u_i এবং v_i হল প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার বিন্যাস (Permutation of n natural members)। আরও ধরা যাক, $d_i = u_i - v_i$ যেখানে $i = 1, 2, \ldots n$ তাহলে r_R দ্বারা চিহ্নিত স্পেয়ারম্যানের অনুক্রমিক সহগাঙ্ক নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় :